ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ
আল-গাযালি (র)-এর অমর রচনা

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন

১০

জিহ্বার বিপদাপদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও রাগ

ভাষান্তর

মুফতি মাহদী হাসান

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

জিহ্বার বিপদাপদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও রাগ

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১০

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ
ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮ - ১১১১ খ্রি.)

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

ভাষান্তর
মুফতি মাহদী হাসান
উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

দারুত তাকবীর

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন (খণ্ড-১০)—১

জিহ্বার বিপদাপদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও রাগ

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১০

ISBN No : 978-984-558-025-0

প্রকাশক
প্রকৌ. মেহেদী হাসান
দারুত তাকবীর
৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা)
ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

রচনা
ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে
মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

ভাষান্তর
মুফতি মাহদী হাসান
উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
জিলহজ ১৪৪১ হিজরি
শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

প্রচ্ছদ ডিজাইন
দারুত তাকবীর ডিজাইন সেকশন

স্বত্ব : সংরক্ষিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৬০.০০ (দুইশত ষাট টাকা মাত্র)

সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

JIHBAR BIPODAPOD, HINGSA-BIDDES O RAG (Ihyau Ulumiddeen Series, V. : 10), Written by Emam Gazali (R), Translated by Mufti Mahdi Hasan, Published by Eng. Mehedi Hasan. Darut Takbeer, Corporate Office : 30/A Sattara center (14th Floor), V.I.P Road, Naya Paltan, Dhaka-1000, Phone : +8809610666006, 01938-855992,01938-855979, 01991-181204, E-mail : info@daruttakbeer.com, Website : www.daruttakbeer.com, Publishing Date : August 2020, **Price : 260.00** Taka Only.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সর্বোত্তম রূপ এবং সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। মানবজাতির মাঝে যিনি আগমন করেছিলেন চিরমুক্তি ও সফলতার বার্তা নিয়ে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর আনীত সুমহান দীনকে সমুন্নত রাখতে প্রতি হিজরি শতকেই আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী ও সংস্কারক প্রেরণ করেন।

পঞ্চম শতকে আবির্ভূত এমনই একজন যুগশ্রেষ্ঠ ও ক্ষণজন্মা মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)। (জন্ম : ৪৫০ হি; মৃত্যু : ৫০৫ হি)। দার্শনিক হিসেবে তিনি শুধু যুগশ্রেষ্ঠ নন; বরং জগৎশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত হন। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুহাম্মদি দীন ও শরিয়ত শুধু নবজীবনই লাভ করেনি, পৃথিবীর তাবৎ মনীষী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। অজস্র মানুষকে বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত করেছে। বিশ্বাসীদের মাঝে আস্থার দ্যুতি ছড়িয়েছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর একটি অমর কীর্তি। বহু শতাব্দী ধরে এটি মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রাণস্পন্দন এবং প্রেরণার স্ফুরণ ঘটিয়ে আসছে।

মূল আরবি গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত। কিন্তু পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় অংশটি সংগ্রহ ও বহনের সুবিধার্থে আমরা বইটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করছি।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজের দশম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ আলেম মুফতি মাহদী হাসান। চলমান সিরিজের এই দশম খণ্ডটি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দিতে পেরে দারুত তাকবীর আনন্দিত ও গর্বিত। যদিও বাজারে এর একাধিক অনুবাদ রয়েছে। নতুন করে আমরা আবার কেন অনুবাদ করলাম, তা মনোযোগী পাঠক পড়েই বুঝবেন।

এর যা কিছু ভালো, সবই মহান আল্লাহর। যা কিছু ভুল তা আমাদের অক্ষমতা। আমরা আমাদের ভুলগুলো উত্তরোত্তর সংশোধন ও পরিমার্জনে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সুহৃদ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের দুআ-পরামর্শ এবং সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

গ্রন্থটি পড়ে কোনো পাঠক যদি নিজের প্রয়োজনীয় আত্মসংশোধনে ব্রতী হয় এবং দ্বিধাহীনচিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদত ও সাধনায় আত্মমগ্ন হয়, তাহলেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের এই শ্রমটুকু কবুল করে নিন এবং গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন!

প্রকাশক

১০.০৮.২০২০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর লক্ষ কোটি শোকর শুধু এজন্য, তিনি আমাকে ঈমান ও ইসলামের মহান দৌলত দান করেছেন। বান্দার ওপর তাঁর অসংখ্য অগণিত নিয়ামতের শোকর আদায়ে অক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا যার মর্ম— মানুষ দুর্বল প্রকৃতির সৃষ্টি। (সূরা নিসা : ২৮)

অন্য জায়গায় বলেছেন, وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তাহলে তার কোনো সীমা-পরিসীমা পাবে না। (সূরা নাহল : ১৮)

আল্লাহ যথার্থই বলেছেন। আমরা দুর্বল অক্ষম। আমাদের জীবন-মরণের মধ্যবর্তী সমস্ত ত্যাগ কুরবানি দিয়ে তাঁর কোনো একটি নিয়ামতেরও হক আদায় করে শোকর জ্ঞাপন করতে পারবো না।

এরপরও তাঁর আনুগত্যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরিবর্তে তাঁর অবাধ্যতায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করি। তিনি দয়ার প্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের থেকে প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নেন না। সুতরাং তাঁর প্রশংসা কেবল তাঁর মুখেই শোভা পায়। যেমন নবী কারীম (স) বলেছেন,

لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। আপনি তো তেমনি যেমন আপনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পথপ্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন অগণিত নবী-রাসূল। তাঁরা অপরাপর মানুষের মাঝে আল্লাহর দীন-শরিয়তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের পর দীনের তাবলিগ ও হিফাজতের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ। যেমন, নবী কারীম (স)-এর মুখে ঘোষিত হয়েছে,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَّلَا دِرْهَمًا، وَأَوْرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

আলেমরা হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণের মিরাছ দিনার-দিরহাম হয় না, তাদের মিরাছ হচ্ছে ইলম-প্রজ্ঞা। সুতরাং যে তা গ্রহণ করবে সে যেন তা দৃঢ়ভাবেই গ্রহণ করে। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৮৮)

সেই ওলামা মিছিলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বিস্ময়কর জ্ঞানী-মনীষা। হাদিস, ফিকহ, তাফসির, তাসাওউফ, ফালসাফা ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ ছিলো। জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি নিযামুল মুলক-এর বিচারক হিসেবে নিযুক্তি পান। পরে দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে নিভৃতবাস অবলম্বন করেন। ইলমচর্চায় নিমগ্ন হন। দীর্ঘ ভ্রমণ ও গভীর অধ্যবসায় তাঁকে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার ময়দানে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

শাফেয়ী মাযহাবে অন্যদের মধ্যে ইমাম গাযালির অবস্থান ও অবদান শীর্ষে। তাঁর লিখিত কিতাবাদি থেকে মাযহাব-মাসলাক নির্বিশেষে সবাই সমান উপকৃত হয়ে এসেছে। ইহয়াউ উলূমিদ্দীন তাঁর রচিত অনবদ্য গ্রন্থ। এ সুবিশাল গ্রন্থটি রচনাকাল থেকেই বিস্ময়করভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হয়ে এসেছে। এর রচনাকাল ধারণা করা হয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে।

ইসলাম ধর্মীয় বিধিবিধান, আদব-আখলাক, মুয়াশারাত-সামাজিকতা মুআমালাত-লেনদেন হদ-বিচারবিধান যাবতীয় শরিয়ত সম্পর্কিত বিষয়াদি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও গভীর পর্যালোচনাসহ নাতিদীর্ঘ বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে। বলতে গেলে তিনি ইহয়াউ উলূমিদ্দীন এই একটি নামের অধীনে ইসলামের তাবৎ সৌন্দর্য সুষমাকে একত্র করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মূল গ্রন্থটি আরব অঞ্চলে একাধিক প্রকাশনা থেকে চার পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর একাধিক অনুবাদ আছে। তারপরও আমাদের এর অনুবাদ কাজে হাত দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই দীনের প্রচার-প্রসার।

এছাড়া বাংলা ভাষায় এ যাবৎ অনূদিত গ্রন্থগুলো দেখে আমাদের বাসনা সুতীব্র হয়েছে এ মহতি আয়োজনের অংশী হওয়ার। এজন্য সর্বপ্রথম ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য দারুত তাকবীরের কার্যনির্বাহী শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ। তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আমার মতো অধমের পক্ষে এ অসাধ্য সাধন করিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব দারুত তাকবীরে কর্মরত সম্পাদক মণ্ডলীর। তাদের সম্মিলিত সুন্দর প্রয়াস ও নিবিড় পরিচর্যায় এ কাজটি এমন পরিশীলিত হয়ে উঠেছে। পরিশেষে আমি দারুত তাকবীরের কর্ণধার ব্যবস্থাপক, প্রকাশক মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইহ-পরকালে কল্যাণ ও সম্মানে সমৃদ্ধি দান করুন।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' যুগে যুগে চর্চিত ও বহুল পঠিত একটি গ্রন্থ। এটি একজন বিদগ্ধ গবেষকের জন্য যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন-হাদিসের তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ আকর গ্রন্থ, তেমনি দীনি বিষয়ে এর বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মনোযোগী পাঠকের প্রয়োজনীয় খোরাক ঋদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থও। এ বিবেচনায় দারুত তাকবীর এ প্রকল্পের সূচনাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রয়োজনে বহু খণ্ডে বিন্যাস করে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করা হবে। যাতে সর্বস্তরের পাঠক এটিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই লুফে নিতে পারে। হতে পারে সমধিক উপকৃত।

এর ভাষা-বিন্যাস, উপস্থাপন সহজ-প্রাঞ্জল ও সাবলীলভাবে যাতে হয়, মূল কিতাবের সাথে অধ্যায়-পরিচ্ছেদ মিল রেখে পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ তরজমা উপহার দিতে পারি এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিলো। যে কারণে দীর্ঘ আড়াই বছর লেগে গেছে এ কাজটি পূর্ণ করতে। আমার ওপর বর্তেছিল সিরিজের দশম খণ্ডের অনুবাদের ভার। আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার সাধ্যের চূড়ান্ত প্রয়াস চালিয়েছি। পূর্ণতা দানের মালিক আল্লাহ তাআলা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে

- প্রামাণ্য ও বিখ্যাত গ্রন্থাদি থেকে এর প্রতিটি কথার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।
- উদ্ধৃত গ্রন্থের শুধু নামই নয়; খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিস গ্রন্থের নাম এবং হাদিস নং উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
- পাঠককে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে এমন বক্তব্যগুলোর (পাদটীকায়) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে ।
- উর্দু থেকে অনুবাদ না করে সরাসরি আরবি মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটির অঙ্গ-সৌষ্ঠব অভিনব ও নান্দনিক করে তুলতে দারুত তাকবীর সম্পাদনা পরিষদ, ডিজাইন শাখা ও কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত সহকর্মীবৃন্দ সীমাহীন ক্লেশ স্বীকার করেছেন, তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দুআ। আল্লাহ তাআলা সবার জীবনকে সুন্দর নির্মল করে দিন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও অনেক জায়গায় অপূর্ণতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো শোধরানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ আমাদের সবাইকে জগৎশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাযালি (র)-এর অমর রচনা 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন!

মুফতি মাহদী হাসান
১০.০৮.২০২০ ইং

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ঈমানের মতো মহান দৌলত দান করেছেন এবং সত্য সহজ সুন্দর দীনের অনুসারী করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল এবং রাসূলের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের ওপর।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি কুরআন সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের বক্তব্যের আলোকে দীন ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে লেখা। চার খণ্ডে রচিত মূল গ্রন্থে শুধু ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আদব বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়নি, আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক বিষয়াদিও আলোচিত হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে। ইহ-পরকালীন জীবনের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো বিশ্লেষণের পাশাপাশি কল্যাণ এবং মুক্তির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী করে।

এতে শরিয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর সারনির্যাস যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি রচনার পর থেকে বিগত নয়শ বছর যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিমদের নিকট ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পবিত্র কালাম ও রাসূলের পবিত্র হাদিসের পর আর কোনো গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের নিকট ইমাম গাযালি (র)-এর এই গ্রন্থটির মতো সমাদৃত হয়নি। এ গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

দারুত তাকবীর এ মূল্যবান গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিরিজের দশম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মুফতি মাহদী হাসান।

এ খণ্ডের আলোচ্য বিষয় ছিল জিহ্বার বিপদাপদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও রাগ।

আলহামদুলিল্লাহ! গ্রন্থটি আমাদের আগাগোড়া সম্পাদনা এবং নিরীক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। এতে ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ চলে এসেছে। সেই সাথে প্রতিটি কথার উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে বইটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে মানবসুলভ ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা পাঠক সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশন দারুত তাকবীরকে স্বাগত জানাই প্রকাশনা জগতে যাত্রার সূচনাতেই এমন বৃহৎ একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উম্মতের সামনে বিশুদ্ধ ও নান্দনিকরূপে গ্রন্থটি পেশ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এর ওসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব করুন। আমিন!

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
১০.০৮.২০২০

মিফতাহুল উলূম মাসকান্দা ময়মনসিংহের শাইখুল হাদিস ও মুহতামিম
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন দা.বা.-এর

দুআ ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন দীর্ঘকাল মুসলিমবিশ্বে বহুল পঠিত একটি গ্রন্থ। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে এটি রচিত হয়। রচনার পর থেকে সাধারণ বিশেষ গবেষক সব ধরনের পাঠকের কাছেই কিতাবটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এতে দীনের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মুসলিমবিশ্বের গৌরব, জ্ঞান অভিজ্ঞানের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র) (মৃত্যু : ৫০৫ হি.) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ফকীহ, কুরআন-হাদিস বিশারদ সুফিসম্রাট। বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি পেয়েছে ইহয়াউ উলূমিদ্দীন। কেবল মুসলিম সমাজেই তিনি পরিচিত ছিলেন তাই নয়; বরং প্রাচ্য-প্রতীচ্যে দর্শনচিন্তার সকল মানুষের কাছে তিনি সমভাবে আলোচিত। চমৎকার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, গভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে এ সম্মানে ভূষিত করেছে।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের পাঠ-প্রয়োজন উপলব্ধি করে সহজ পাঠের সুবিধার্থে অনেক বিদগ্ধ আলেম এটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করেছেন। ইবনুল জাওযী (র)-এর মিনহাজুল কাসিদীন এমনই একটি কাজ। আবার মিনহাজুল কাসিদীনকে সংক্ষিপ্ত করে হাফেজ মাকদিসী (র) লিখেছেন মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন। আরও অনেক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

দারুত তাকবীর এ গ্রন্থটি সিরিজ আকারে বাজারে আনছে জেনে খুব খুশি হয়েছি। এ সিরিজের দশম খণ্ডটি অনুবাদ করেছে আমার স্নেহভাজন মুফতি মাহদী হাসান। আলহামদুলিল্লাহ এ অনুবাদ গ্রন্থটি আমার সম্পাদনা ও নিরীক্ষণের সুযোগ হয়েছে। প্রার্থনা করি সর্বাংশে গৃহীত ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে। দারুত তাকবীর যে লক্ষ্যমাত্রায় কাজ করেছে তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। নিঃসন্দেহে এটি একটি সাহসী উদ্যোগ। মহান আল্লাহ দারুত তাকবীরের কর্ণধার ও দায়িত্বশীল সবার জীবনে কল্যাণ ও বরকত দান করুন। আমিন!

(দেলাওয়ার হোসাইন)

তরুণ আলেমেদীন, মাদরাসা কাসেমিয়া জামতলা ময়মনসিংহের পরিচালক ও মুহাদ্দিস **মুফতি ইনআমুল হাসান দা.বা.-এর**

দুআ ও অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. أَمَّا بَعْدُ.

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ইসলামি বিশ্বে বহুল পরিচিত ও চর্চিত একটি নাম। খুব কম মুসলমান পাওয়া যাবে যারা দীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন অথচ ইমাম গাযালি ও ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-এর নাম শুনেনি। আল্লাহ তাআলা ইমাম গাযালি ও তাঁর রচনাকে কবুল করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে এই অনবদ্য গ্রন্থের কল্যাণের ধারাকে প্রবহমান রেখেছেন। ইনশাআল্লাহ! কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হলেও এ কালজয়ী গ্রন্থ তার আবেদন এ যুগেও সমানভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই এর প্রয়োজন এখনও সীমাহীন। বিশ্বের বহু ভাষায় এর অনুবাদের কাজ হয়েছে। বাংলাভাষায়ও এর একাধিক অনুবাদ চোখে পড়েছে। তবে দারুত তাকবীরের গৃহীত উদ্যোগ প্রশংসনীয় ও সাহসোদ্দীপক। তারা এ গ্রন্থটি সিরিজ আকারে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করছে। আমার প্রীতিভাজন মুফতি মাহদী হাসান সিরিজের দশম খণ্ডের অনুবাদ করেছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। মহান আল্লাহ তাকে জীবন সফলতার স্মারক করুন। এ গ্রন্থের মহান লেখককে দান করুন জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহ ও রাসূলের ঘনিষ্ঠ নৈকট্য।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজের এ দশম খণ্ডে স্থানে পেয়েছে জিহ্বার বিপদাপদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধের নিন্দা বিষয়ক আলোচনা।

মূল কিতাবটির মতো অনুবাদ গ্রন্থটিও সর্বাংশে গৃহীত ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দুআ করি, এ মহতি উদ্যোগ-আয়োজনের সাথে যারা জড়িত বিশেষ করে দারুত তাকবীরের কর্ণধার, প্রকাশক ও দায়িত্বশীল সবাইকে আল্লাহ দীনের জন্য কবুল করে নিন। আমিন।

(ইনআমুল হাসান)

সুচিপত্র

বিষয়..... পৃষ্ঠা

জিহ্বার বিপদাপদ

জিহ্বার বিপদ ও চুপ থাকার ফযিলত..... ১৯
কথা বলায় বিশ ধরনের বিপদ রয়েছে,
নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো..... ২৬
১. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা..... ২৬
২. বেশি কথা বলা..... ৩১
৩. অবৈধ বিষয়াদি বলা..... ৩৪
৪. কথার মাঝে কথা বলা এবং ঝগড়া করা..... ৩৬
৫. 'খুসুমত' তথা বিবাদ..... ৪১
৬. কথার প্রাঞ্জলতা লৌকিকতার উদ্দেশ্যে..... ৪৪
৭. অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ ও গালিগালাজ করা..... ৪৬
৮. লানত ও ভর্ৎসনা করা..... ৫০
৯. গান ও কবিতা আবৃত্তি..... ৫৬
১০. হাসিঠাট্টা..... ৫৯
১১. হারাম উপহাস ও কৌতুক..... ৬৭
১২. গোপন তথ্য ফাঁস করা..... ৬৯
১৩. মিথ্যা ওয়াদা..... ৭০
১৪. মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা শপথ..... ৭৩
সাহাবি ও মনীষীদের বাণী..... ৭৭
যেখানে মিথ্যা বলা হালাল..... ৭৯
ইঙ্গিতেও মিথ্যা বলা ঠিক নয়..... ৮৫
১৫. গীবত..... ৮৯
গীবত কাকে বলে..... ৯৪
গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয়..... ৯৬
গীবতের কারণ..... ৯৯

গীবত থেকে বাঁচার উপায় ১০৩
ঠাট্টা বিদ্রূপ ১০৬
অভ্যন্তরীণ গীবতও হারাম ১০৭
কুধারণা দূর করার উপায় ১১০
যে কারণে গীবত বৈধ ১১১
গীবতের কাফফারা ১১৫
১৬. চোগলখোরী ১১৮
চোগলখোরীর পরিচয় ও তা দূর করার পদ্ধতি ১২১
চোগলখোরীর কারণ ১২১
১৭. দ্বিমুখী কথা ১২৭
১৮. বেহুদা প্রশংসা ১৩০
প্রশংসাকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত চারটি বিপদ ১৩০
প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বিপদ ১৩২
প্রশংসিত ব্যক্তির করণীয় ১৩৫
১৯. কথাবার্তার মাঝে সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তি ১৩৫
২০. জনসাধারণের জিজ্ঞাসা ১৩৮

হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধের নিন্দা

ভূমিকা ১৪১
জেদ ও ক্রোধের পরিণতি ১৪৩
রাগের স্বরূপ ১৪৮
মুজাহাদার মাধ্যমে রাগ দূর করা যায় ১৫৪
রাগের রহস্য ও তা দমনের উপায় ১৬০
জোশের সময় ক্রোধের উপশম ১৬৩
রাগ হজম করার ফযিলত ১৬৯
সাহাবীদের উক্তি ১৭১
সবরের ফযিলত ১৭২
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ কথা বলা যাবে ১৮১
যে কথা মিথ্যা নয়, তা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বলা জায়েয ১৮৩

বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল ১৮৫
ক্ষমার উপকারিতা ১৮৭
নম্রতার উপকারিতা ১৯৬
সাহাবীদের উক্তি ১৯৮
হিংসার প্রতিবাদ ২০১
হিংসার ধরন, প্রকার ও হুকুম ২০৯
একটি সূক্ষ্ম আলোচনা ২১৬
হিংসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন হয় ২১৮
আপনজনের সাথে হিংসা বেশি হয় কেন? ২২৪
জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য ২২৫
হিংসার চিকিৎসা ২২৮
আখিরাতে উপকার লাভ ২২৯
দুনিয়াতে উপকার লাভ ২৩০
আমল দিয়ে হিংসার চিকিৎসা ২৩৪
যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব ২৩৫

[দশম খণ্ড সমাপ্ত]

জিহ্বার বিপদাপদ

জিহ্বা আল্লাহ তাআলার বড় বড় নিয়ামত এবং সূক্ষ্ম কারিগরিসমূহের অন্যতম। এটি একটি মাংসপিণ্ড হলেও এর গুনাহ যেমন সবচেয়ে বেশি, তেমনি এর আনুগত্যও সবার উপরে। কারণ, নিকৃষ্টতম ঔদ্ধত্য তথা কুফর এবং শ্রেষ্ঠতম আনুগত্য তথা ঈমান এ জিহ্বার সাক্ষ্য দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া যে জিনিসই হোক তা অনুপস্থিত কিংবা উপস্থিত, স্রষ্টা অথবা সৃষ্টি, জানা কিংবা অজানা, জাহেরি অথবা বাতেনি, সবই জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত হয়।

জ্ঞান যে সব জিনিসকে কেন্দ্র করে, জিহ্বাই তা বর্ণনা করে— সত্য হোক কিংবা মিথ্যা। জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। এটি এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা জিহ্বা ব্যতীত অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন চক্ষু রঙিন বস্তুর আকৃতি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পারে না। কান শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু শুনে না। অন্যান্য অঙ্গের অবস্থাও অনুরূপ। কিন্তু জিহ্বার কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সুতরাং যে লোক তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে না, শয়তান তাকে দিয়ে অনেক কিছু বলাতে এবং তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে ছুড়ে ফেলতে পারে। সহিহ হাদিসে আছে,

وَلَا يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلسِنَتِهِمْ.

মানুষকে জিহ্বার ফসল ছাড়া আর কোনো জিনিস জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

অবশ্য জিহ্বার ক্ষতি থেকে সে লোকই মুক্ত থাকবে, যে তাকে শরিয়তের বাগডোর পরাবে এবং মুখ দিয়ে সেই কথাই বের করবে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত থাকে। কোন কথা ভালো এবং কোনটি মন্দ, তা জানা খুবই সহজ। নিজেকে জিহ্বার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা এবং তার ক্ষতিকে ভয় করার ব্যাপারে মানুষ মোটেই তৎপরতা দেখায় না, অথচ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা শয়তানের একটি বড় অস্ত্র। বক্ষ্যমাণ রচনায় আমরা জিহ্বার যাবতীয় বিপদাপদ সম্পর্কে একটি একটি করে সংজ্ঞা, কারণ ও আত্মরক্ষার উপায় সবিস্তারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হোন।

জিহ্বার বিপদ ও চুপ থাকার ফযিলত

জিহ্বার কারণে বড় বড় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। আর এসব বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে চুপ থাকা। এজন্যই শরিয়তে চুপ থাকার প্রশংসা ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান লক্ষ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

مَنْ صَمَتَ نَجَا.

যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়। (জামে তিরমিযী : ২৫০১)

তিনি আরও বলেন,

اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيْلٌ فَاعِلُهُ.

চুপ থাকা বিজ্ঞতা, কম লোকই চুপ থাকে। (আল কামেল : ৫ : ১৬৯)

আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ানের পিতা বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরজ করলাম, ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন, যেন আপনার পরে কারও নিকট কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ — বলো, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; অতঃপর এর উপর অবিচল থাকো। আমি বললাম, আমি কোন জিনিস থেকে বেঁচে থাকব? তিনি জিহ্বার দিকে হাতে ইঙ্গিত করে বললেন, এ থেকে বেঁচে থাকো। (জামে তিরমিযী : ২৪১০)

ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরজ করলাম, মুক্তির পথ কী? তিনি বললেন,

اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

তোমার কর্তব্য হচ্ছে জিহ্বাকে সংযত রাখা, তোমার ঘরে থাকা এবং নিজ অপরাধের জন্য কান্নাকাটি করা। (জামে তিরমিযী : ৩৪০৬)

সাহল ইবনে সাদ (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ يَتَكَفَّلُ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ اَتَكَفَّلُ لَهٗ بِالْجَنَّةِ.

যে আমাকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে বেহেশতের নিশ্চয়তা দেব। (সহিহ বুখারী : ৬৪৭৪)

অন্য এক হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি উদর, লজ্জাস্থান ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করে, সে সকল অনিষ্ট থেকেই নিরাপদ থাকে। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ৫৯৭৮)

কারণ, অধিকাংশ মানুষ এ তিনটি কামনার ফলেই বিপন্ন হয়। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কারণে অধিকসংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রতার কারণে। আবার প্রশ্ন করা হলো, কোন কারণে অধিক লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন,

اَلْاَجْوَفَانِ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ.

দুটি বস্তুর কারণে— মুখ ও লজ্জাস্থান। (জামে তিরমিযী : ২০০৪)

এখানে মুখের অর্থ জিহ্বার বিপদাপদও হতে পারে। কারণ, মুখ জিহ্বার পাত্র, আবার মুখের অর্থ পেটও হতে পারে। কারণ, পেট ভরার পথ মুখই।

মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কথার কারণেও কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, ওহে মুআয, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে জিহ্বার ফসল ছাড়া আর কোনো জিনিস জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। (জামে তিরমিযী : ২৬১৬)

আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, আমাকে সারাজীবন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার মতো কিছু বলুন। তিনি বললেন, বলো, আল্লাহ আমার রব, আর এর ওপর অটল থাকো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমার কোন অঙ্গের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন? রাসূলুল্লাহ (স) জিহ্বায় হাত রেখে বললেন, এটা।

মুআয (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি নিজের জিহ্বা বের করে তাতে আঙ্গুল রাখলেন; অর্থাৎ, চুপ থাকা সর্বোৎকৃষ্ট আমল। (আল মুজামুল কাবীর : ২০ : ৬৪)

আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানুষের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ় হয় না যতক্ষণ না অন্তর স্থিরতা লাভ করে। আর অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিরতা লাভ করে না যতক্ষণ না জিহ্বা সংযত হয়, আর কোনো মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না তার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ হয়। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ১৯৮)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, যে নিরাপদ থাকতে চায় সে যেন চুপ থাকে।

সাঈদ ইবনে যুবায়েরের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন সকাল হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তুমি সোজা থাকলে আমরাও সোজা থাকব। আর তুমি বক্র হলে আমাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে। (জামে তিরমিযী : ২৪০৭)

একদিন ওমর (রা) আবু বকর (রা)-কে স্বীয় জিহ্বা ধরে টানতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে নায়েবে রাসূল (স)! আপনি এটা কী করছেন? তিনি বললেন, এটা আমাকে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দেহের মধ্যে এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যে আল্লাহর কাছে জিহ্বার ক্ষিপ্রতার অভিযোগ করে না।

ইবনে মাসঊদ (রা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বলতেন,

يَا لِسَانُ قُلْ خَيْرًا تَغْنَمُ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَنْدَمَ.

ওহে জিহ্বা! ভালো কথা বলো; গনিমত পাবে এবং মন্দ থেকে অনুতপ্ত হওয়ার আগে চুপ করো, আপদমুক্ত থাকবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এটা কি আপনার নিজের উক্তি? তিনি বললেন, না। আমি নবীজি (স)-কে বলতে শুনেছি— আদম সন্তানের অধিকাংশ গুনাহ তার জিহ্বার মধ্যে। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৪৫৮৪)

ওমর (রা) এ হাদিসটি বর্ণনা করেন,

مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ مَلَكَ غَضَبَهُ وَقَاهُ اللهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ.

যে ব্যক্তি জিহ্বা সংযত রাখে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন, যে রাগ দমন করে, আল্লাহ তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেন; যে আল্লাহর সামনে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন।

একবার মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো আর নিজেকে মৃতদের কাতারে গণ্য করবে। তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য

এই সব কিছু থেকে উপকারী কথাও বলতে পারি। একথা বলে তিনি জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন।

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে দেহের জন্য সবচেয়ে সহজ ইবাদতের কথা বলে দিবো না? জেনে রাখো, তা হলো চুপ থাকা এবং সচ্চরিত্রবান হওয়া।

আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ.

যে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা চুপ থাকে। (সহিহ বুখারী : ৬০১৮)

হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ اَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ.

আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর রহমত নাযিল করুন যে কথা বললে উপকারী কথা বলে অথবা চুপ থেকে নিরাপদ থাকে।

সুফিয়ান (র) বলেন, একবার ঈসা (আ)-কে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এমন আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। তিনি বললেন, কখনো কথা বলো না। লোকেরা বলল, এটা তো অসম্ভব। তিনি বললেন, তাহলে ভালো কথা ছাড়া মুখ থেকে কিছু বের করো না।

সুলায়মান (আ) বলেন, যদি কথা বলা রূপা হয়, তবে চুপ থাকা হবে স্বর্ণ।

বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াও, তৃষ্ণার্তকে পান করাও, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে বারণ করো। আর এসব না পারলে ভালো কথা ছাড়া অন্য কথায় জিহ্বাকে সংযত রাখো।

তিনি আরও বলেন, জিহ্বা দ্বারা কেবল ভালো কথাই বলো। তাহলে শয়তানের ওপর বিজয়ী হতে পারবে।

হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জিহ্বার কাছেই অবস্থান করেন। কাজেই কথা বলার সময় আল্লাহকে ভয় করা উচিত।

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন তোমরা নীরব ও গম্ভীর কোনো মুমিন ব্যক্তিকে দেখবে তখন তার নিকটবর্তী হও। কারণ তাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১০১)

তিনি আরও বলেন, মানুষ তিন ধরনের- সফল, নিরাপদ ও অকৃতকার্য। সফল ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলার যিকিরে মগ্ন থাকে। নিরাপদ ওই ব্যক্তি যে চুপ থাকে আর অকৃতকার্য ওই ব্যক্তি যে বাতিল কাজে আত্মনিয়োগ করে। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ৭৫)

এক হাদিসে আছে, মুমিনের জিহ্বা অন্তরের পেছনে থাকে। কথা বলার আগে অন্তর চিন্তা করে, এরপর কথা বলে। মুনাফিকের জিহ্বা অন্তরের সামনে থাকে। সে চিন্তা-ভাবনা না করেই মনে যা চায় বলে দেয়।

ঈসা (আ) বলেন, ইবাদতের দশটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে নয়টির সম্পর্ক চুপ থাকার সাথে। আর একটির সম্পর্ক মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার সাথে।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, যার কথা বেশি হয় তার ভুল বেশি হয়। যার ভুল বেশি হয় তার অপরাধ বেশি হয়। আর যার অপরাধ বেশি হয় জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত স্থান।

আবু বকর (রা) কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে মুখে কংকর পুরে রাখতেন। তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, এটা আমার অনেক ক্ষতি করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, ওই সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই! কোনো জিনিসই জিহ্বার চেয়ে অধিক সংযমের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়।

তাউস (র) বলেন, আমার জিহ্বা হিংস্র প্রাণীর মতো। ছেড়ে দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে। (তারিখে দিমাশক : ১২ : ২৯২)

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো, যুগ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা, জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং আপন অবস্থায় স্থির থাকা।

হাসান বসরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখে না সে দীনের কোনো জ্ঞান রাখে না।

আওযায়ী (র) বলেন, একবার ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) আমার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করলেন, তাতে লেখা ছিল— 'হামদ ও সালামের পর বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে সে দুনিয়াতে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। আর যে ব্যক্তি কথা বলাকে নিজের আমলের মধ্যে গণ্য করে সে অপ্রয়োজনীয় কথা কম বলে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, চুপ থাকার মাঝে দুটি উপকারিতা রয়েছে— ১. দীনের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও ২. সঙ্গীর কথা বুঝতে পারা।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র) মালেক ইবনে দীনারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ওহে আবু ইয়াহইয়া! দিরহাম-দীনার রক্ষা করার চেয়ে জিহ্বাকে সংযত রাখা কঠিন।

ইউনুস ইবনে ওবায়দ (র) বলেন, যে ব্যক্তি জিহ্বাকে সংযত রাখে তার প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন, আমির মোয়াবিয়া (রা)-এর দরবারে লোকজন কথা বলছিল; কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) চুপচাপ বসেছিলেন। মোয়াবিয়া (রা) তাকে বললেন, আপনি কিছুই বলছেন না কেন? তিনি বললেন, যদি মিথ্যা বলি, আল্লাহর ভয় লাগে, আর যদি সত্য বলি, তবে আপনাদের ভয় লাগে।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, একবার হিন্দুস্তান, চীন, পারস্য এবং রোমের বাদশাহগণ এক জায়গায় সমবেত হলো। একজন বললো, আমি কথা বললে লজ্জিত হই কিন্তু কথা না বললে লজ্জিত হই না। দ্বিতীয়জন বললো, আমার মুখ থেকে যখন কোনো কথা বেরিয়ে যায় তখন আমি তার অধীনে চলে যাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুখ থেকে বের না হয় ততক্ষণ সে আমার অধীনে থাকে। তৃতীয়জন বললো, আমি বক্তাদেরকে দেখে অবাক হই। তাদের কথা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলে তা তাদের ক্ষতি করে। আর ফিরিয়ে না দিলেও তা কোনো কাজে আসে না। চতুর্থজন বললো, আমি যা বলিনি তা দমন করতে পারি। কিন্তু একবার যা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা ফিরিয়ে নিতে পারি না।

বলা হয়, মানসূর ইবনুল মুতামির (র) চল্লিশ বছর যাবত এশার নামাযের পর থেকে ভোর হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা বলেননি।

বর্ণিত আছে, রবী ইবনে খুসাইম (র) বিশ বছর কোনো দুনিয়াবী কথা বলেননি, সকালে তিনি কাগজ কলম সাথে নিয়ে বের হতেন এবং সারা দিন যা কিছু বলতেন তা লিখে রাখতেন। অতঃপর সন্ধ্যায় সেগুলোর হিসাব-নিকাশ করতেন।

এগুলো হচ্ছে চুপ থাকার ফযীলত। আর তা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, কথা বলার মধ্যে হাজারো ক্ষতির আশংকা থাকে। ভুল, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, অহংকার, কপটতা, নির্লজ্জতা, কথা কাটাকাটি, আত্মপ্রশংসা, বাড়িয়ে বলা, হ্রাস করা, অপরকে কষ্ট দেওয়া, গোপন বিষয় ফাঁস করা ইত্যাদি যাবতীয় অপকর্ম জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। জিহ্বা সঞ্চালন কঠিন মনে হয় না; এর মাধ্যমে অন্তরে স্বাদ অনুভূত হয়। কথা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখবে, যেখানে বলা প্রয়োজন সেখানেই বলবে। কোন কথা বলার উপযোগী এবং কোনটি অনুপযোগী, তা জানা খুবই কঠিন। অতএব চুপ থাকাই নিরাপদ। এছাড়া চুপ থাকার আরও কিছু উপকারিতা আছে। তা হচ্ছে, এতে সাহস সংহত থাকে, ভয়ভীতি বজায় থাকে এবং যিকির ও ইবাদতের জন্য অবসর পাওয়া যায়। চুপ থাকলে কথা বলার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার মাধ্যমেই দুনিয়াতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং আখেরাতে হিসাব-নিকাশ থেকে নাজাত লাভ হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য সদা প্রস্তুত প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা ক্বাফ : ১৮)

নীরব থাকা যে উত্তম, এর প্রমাণ হচ্ছে— কথা মূলত চার প্রকার, ১. যাতে শুধুই ক্ষতি। ২. যার মধ্যে শুধুই উপকার। ৩. যাতে ক্ষতি ও উপকার দুটোই রয়েছে। ৪. যাতে ক্ষতিও নেই উপকারও নেই। প্রথম প্রকার তথা যাতে শুধুই ক্ষতি এমন ক্ষেত্রে চুপ থাকা আবশ্যক। তৃতীয় প্রকারে যদি উপকারের চেয়ে ক্ষতি অধিক হয়, তবে তাতেও চুপ থাকা দরকার। চতুর্থ প্রকার কথা বলা অযথা সময় নষ্ট করার নামান্তর। কাজেই যাতে শুধুই উপকার এমন কথাই বলার উপযুক্ত। শব্দান্তরে কথার এক চতুর্থাংশ বলাও বিপন্মুক্ত নয়। কেননা, বক্তার অজান্তেই এতে কিছু গোপন ক্ষতি যেমন

অহংকার, লৌকিকতা, আত্মপ্রীতি, পরনিন্দা, চোগলখোরী ইত্যাদি মিশে যায়। তাই কথা বলা বিপদ থেকে মুক্ত নয়। যে লোক কথার বিপদ সম্পর্কে সম্যক জেনে যাবে, সে নিশ্চিতরূপেই অনুধাবন করবে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর مَنْ صَمَتَ نَجَا 'যে নীরব থাকে, সে মুক্তি পায়' (জামে তিরমিযী : ২৫০১) উক্তিটি কতটা যৌক্তিক।

কথা বলায় বিশ ধরনের বিপদ রয়েছে, নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো

১. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা

যে কথা না বললে কোনো পাপ হয় না এবং জান-মালেরও কোনো ক্ষতি হয় না, সেটাই অপ্রয়োজনীয় কথা। মানুষের সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে, কথা বলার সময় সে খেয়াল রাখবে যেন তার প্রতিটি কথাই গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। সে মুখে শুধু এমন কথা উচ্চারণ করবে যা শরিয়ত অনুমোদিত এবং যাতে তার নিজের ও কোনো মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি না হয়। একথা ঠিক যে, কখনো ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনর্থক কথাবার্তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হয়। অন্য দিকে জিহ্বার হিসাব যিম্মায় আরোপিত হয় এবং নগণ্য জিনিসের বিনিময়ে ভালো জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ, কথা বলার সময় যদি কেউ পরিমিতি রক্ষা করে তাহলে অদৃশ্য জগৎ থেকে এমন বিষয়ও প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার উপকার বেশি। আর তাসবীহ অথবা অন্য কোনো যিকিরে মগ্ন হওয়া এসবের তুলনায় উত্তম। নিশ্চয় এমন অনেক কথা আছে, যেগুলোর জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হয়। সুতরাং যার ধনসম্পদ সঞ্চয় করার ক্ষমতা আছে, সে যদি এর বদলে ঢিলা সঞ্চয় করে, তবে একে ক্ষতি ছাড়া আর কী বলা যাবে? আল্লাহর যিকির, যা উৎকৃষ্ট ধনভাণ্ডার, তা ছেড়ে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করাও তেমনি ক্ষতির কাজ। যদিও তা উচ্চারণ করার ব্যাপারে ছাড় আছে। ঈমানদারের চুপ থাকা চিন্তাভাবনা, কথা বলা যিকির এবং দেখা শিক্ষা গ্রহণ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) এমনটিই বলেছেন। সময় হচ্ছে মানুষের পুঁজি। এই সময় অপ্রয়োজনীয় কথায় ব্যয় করলে এবং সওয়াব ও পরকালে পাথেয় অর্জন না করলে পুঁজি নষ্ট হতে বাধ্য। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে ত্যাগ করা। (জামে তিরমিযী : ২৩১৭)

আনাস (রা)-এর বর্ণনায় এ বিষয়টি আরও কঠোর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে জনৈক যুবক শহীদ হলে আমরা দেখলাম, ক্ষুধার কারণে তার পেটে পাথর বাঁধা রয়েছে। তাঁর মা মুখ থেকে মাটি মুছে দিয়ে বলল, হে প্রিয় আমার! জান্নাত মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কীভাবে জানা গেল, সে জান্নাতে যাবে? হতে পারে, সে অনর্থক কথাবার্তা বলত। (জামে তিরমিযী : ২৩১৬)

অন্য এক হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) কা'বকে কিছুদিন না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব কোথায়? লোকেরা বলল, অসুস্থ। তিনি তাঁকে দেখতে গেলেন। কাছে গিয়ে বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ হে কা'ব! কা'বের মা বললেন, তোমার জান্নাত মুবারক হোক। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর উপর আদেশ জারি করে কে এই মহিলা? কা'ব বললেন, আমার মা। তিনি বললেন, তুমি কীভাবে জানলে? তোমার ছেলে হয়তো কখনো অনর্থক কথাবার্তা বলেছে।

এ হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যার যিম্মায় কোনো হিসাব নেই সে-ই বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারে। যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে, তার যিম্মায় হিসাব থেকে যায়, যদিও সে কথা মুবাহ হয়।

মুহাম্মদ ইবনে কাব (রা)-এর বর্ণনায় একদিন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে জান্নাতী, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) প্রবেশ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা) তার কাছে সমবেত হয়ে তাকে এই সুসংবাদ দিয়ে বললেন, সেই আমল কোনটি যার দ্বারা আপনি জান্নাতে যাবেন বলে মনে করেন? তিনি বললেন, আমি একজন দুর্বল বান্দা, আমার কোনো মজবুত আমল নেই। তবে আমি আমার অন্তরকে হেফাজত করি এবং অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করি। আর এই আমলের কারণেই আমি জান্নাত পাবো বলে আশা রাখি।

আবু যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলবো না, যা দেহের জন্য খুবই

হালকা কিন্তু মিযানের পাল্লায় খুব ভারি? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, চুপ থাকা, সচ্চরিত্রবান হওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, পাঁচটি জিনিস আমার কাছে কালো ঘোড়ার চেয়েও অধিক প্রিয়।

১. অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা। কারণ তা অতিরিক্ত জিনিস, তাছাড়া তাতে গুনাহের আশঙ্কাও রয়েছে।

২. প্রয়োজনীয় কথা হলেও সেটাকে যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করা। কারণ, কথাকে যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করা না হলে তা উপকারী হওয়া সত্ত্বেও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. কোনো ধৈর্যশীল বা নির্বোধ ব্যক্তির সাথে বিতর্কে না জড়ানো। কারণ ধৈর্যশীল ব্যক্তির সাথে বিতর্কে জড়ানোর অর্থ হলো তাকে রাগানো আর নির্বোধের সাথে বিতর্কে জড়ালে তার থেকে উৎপীড়নের আশংকা রয়েছে।

৪. কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা নিজের জন্য পছন্দনীয়। তার সাথে এমন আচরণ করা, যে আচরণ নিজের জন্যও কাম্য।

৫. অন্তরে এই বিশ্বাস রেখে আমল করা যে, আমলটি ভালো হলে তার প্রতিদান পাওয়া যাবে আর মন্দ হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

একবার লোকমান হাকিমকে তার হেকমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যে জ্ঞান নিজে নিজেই রপ্ত করা যায় তার ব্যাপারে আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি না এবং আমি অপ্রয়োজনীয় কথাও বলি না।

মুওয়াররিক আল ইজলী (র) বলেন, বিশ বছর যাবৎ আমি এমন একটি জিনিসের খোঁজ করছি যা আমি কখনো না পেলেও খোঁজ করে যাবো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সেটা কোন জিনিস? তিনি বললেন, অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে চুপ থাকা।

ওমর (রা) বলেন, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত হয়ো না, শত্রুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখো, বিশ্বস্ত কাউকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করো। আর বিশ্বস্ত কেবল ওই ব্যক্তিই হতে পারে যার অন্তরে আল্লাহর ভয় বিরাজমান, কোনো পাপাচারীর সংশ্রবে যেয়ো না। তাহলে পাপকাজে জড়িয়ে পড়বে, তাকে তোমার কোনো গোপন কথা বলো না, আর তাদের কাছেই পরামর্শ চাও যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।

অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা হলো ওই কথা যা না বললে কোনো গুনাহ হয় না এবং বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনো ক্ষতিও হয় না। যেমন ধরা যাক, তুমি অনেক মানুষের সামনে তোমার সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে। বর্ণনা করার সময় তুমি সফরে যেসব পাহাড় পর্বত, নদীনালা প্রত্যক্ষ করেছো, নতুন নতুন খাবার ও পোশাক গ্রহণ করেছো এবং কোন কোন ওলামায়ে কেরামের সাক্ষাতে ধন্য হয়েছো সব বর্ণনা করলে। সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময় এগুলো উল্লেখ না করলে কোনো গুনাহ বা ক্ষতি হতো না। আর এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন তুমি কোনো ধরনের কমবেশি না করে তা ব্যক্ত করবে, কোনো ব্যক্তির গীবত করবে না এবং আল্লাহর কোনো মাখলুকের নিন্দা করবে না।

এরপরও বলা হবে, সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় এতকিছু ব্যক্ত করে তুমি তোমার সময় নষ্ট করেছো।

এমনিভাবে কাউকে অহেতুক প্রশ্ন করাও এই বিধানের আওতাধীন। কারণ এই প্রশ্ন করে তুমি যেমনিভাবে তোমার নিজের সময় নষ্ট করেছো তদ্রূপ যাকে প্রশ্ন করেছো তাকেও উত্তর প্রদান করে সময় নষ্ট করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছো। আর এটাও তখনই যখন এই প্রশ্ন কোনো বিপদ বয়ে আনে। এমন অনেক প্রশ্ন রয়েছে যা বিপদের কারণ হয়। যেমন তুমি কাউকে রোযা রেখেছে কি-না এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, এর উত্তরে সে যদি 'হ্যাঁ' বলে তাহলে সে প্রকাশ্যে ইবাদতকারী বলে বিবেচিত হবে। আর এতে তার মাঝে লৌকিকতা প্রবেশ করবে। আর যদি উত্তরে 'না' বলে তাহলে সে মিথ্যাবাদী হবে। আর যদি উত্তর না দিয়ে চুপ থাকে তাহলে এটা তোমার জন্য অপমান ও কষ্টের কারণ হবে। আর যদি সে তোমার প্রশ্নের উত্তর থেকে বাঁচার জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করে তাহলে সে অযথা মানসিক পেরেশানিতে পড়বে।

দেখার বিষয় হচ্ছে, তোমার একটি অহেতুক প্রশ্নের কারণে লৌকিকতা, মিথ্যা, অপমান ও মানসিক পেরেশানি এই চার বিপদের কোনো একটি আবশ্যক হবে। কাউকে ইবাদত সংক্রান্ত প্রশ্ন করলে এমনই হয়ে থাকে।

এমনিভাবে কাউকে অপরাধ ও গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেও এ ধরনের চার বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কাউকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করাও অনুচিত যার উত্তর প্রদানে সে লজ্জাবোধ করে, কাউকে এমন প্রশ্ন করা

ঠিক নয় যে, অমুক তোমাকে কী বলেছে বা অমুক সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী। কোনো মুসাফিরকে সে কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। কারণ অনেক সময় তার শহরের নাম বললে তা তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সে যদি সত্য বলে তাহলে সে বিপদের সম্মুখীন হয় আর মিথ্যা বললে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। আর প্রশ্নকারীর প্রশ্নই হয় তার মিথ্যা বলার কারণ।

কোনো আলেমকে এমন কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা উচিত নয় যা না জানলেও চলবে। কারণ অনেক সময় জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি 'জানি না' বলতে লজ্জাবোধ করে। ফলে সে না জেনে উত্তর দিয়ে নিজেও বিভ্রান্ত হয়, প্রশ্নকারীকেও বিভ্রান্তিতে ফেলে।

বর্ণিত আছে, একবার লোকমান হাকিম দাউদ (আ)-এর কাছে এলেন, তিনি তখন একটি বর্ম তৈরি করছিলেন। লোকমান হাকিম ইতঃপূর্বে কখনো বর্ম দেখেননি। তাই তিনি লোহার পোশাক দেখে অবাক হয়ে দাউদ (আ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তার হেকমত তাকে বাধা দিলো। তাই তিনি প্রশ্ন না করে চুপ রইলেন। দাউদ (আ) বর্ম প্রস্তুত শেষ হলে তা পরিধান করে বললেন, যুদ্ধের জন্য বর্ম কতই না উত্তম পোশাক! লোকমান হাকিম মনে মনে বললেন। চুপ থাকাই হেকমতের কাজ। যদিও খুব কম মানুষই এর ওপর আমল করে।

বলা হয়, লোকমান হাকিম কোনো ব্যাপারে সংশয়ে পড়লে এক বছর পর্যন্ত তা নিরসনের জন্য চেষ্টা করতেন। এরপরও কাউকে জিজ্ঞেস করতেন না।

মোটকথা, এ জাতীয় প্রশ্নে ক্ষতি, অপমান, লৌকিকতা, মিথ্যা ইত্যাদি ত্রুটি না থাকলে এগুলো অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক প্রশ্ন। এ থেকে বেঁচে থাকাই ইসলামের সৌন্দর্য।

বেশকিছু কারণে মানুষ অনর্থক কথাবার্তা বলে থাকে। যেমন অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয় জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কাউকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রবল ইচ্ছা, অথবা প্রিয় কোনো ব্যক্তির সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকার অভিলাষ ইত্যাদি।

এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো, মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করা যে, মৃত্যু অতি সন্নিকটে, মৃত্যুর পর প্রতিটি কথার জন্য জবাবদিহি করতে হবে,

শ্বাস-প্রশ্বাস হলো পুঁজিস্বরূপ আর জিহ্বা হলো জালস্বরূপ। জিহ্বাকে সংযত রাখার মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামত লাভ করা যায়। কাজেই অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে এই নিয়ামত হাতছাড়া করা বোকামি বৈ কি। এমনিভাবে একাকীত্ব গ্রহণ করবে, নিজেকে শুধু প্রয়োজনীয় কথা বলায় অভ্যস্ত করে নিবে। এভাবেই অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

২. বেশি কথা বলা

এতে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কথাও অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপেও যেখানে প্রয়োজনীয় কথা ব্যক্ত করা যায়, সেখানে এক বাক্যের জায়গায় দু'বাক্য বললে দ্বিতীয় বাক্য বেশি হবে। এই বেশি বাক্য ব্যবহারে পাপ কিংবা ক্ষতি না হলেও এটা খারাপ। আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) বলেন, পূর্ববর্তী আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ অতিরিক্ত কথা বলাকে দূষণীয় মনে করতেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ব্যতীত অন্য সব কথাকে অপ্রয়োজনীয় কথা মনে করতেন, এটা তো নিশ্চিত যে, প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রত্যেকের সাথে দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত আছে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ . يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ .

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ (ফেরেশতা); সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর। (সূরা ইনফিতার : ১০-১২)

মানুষের কি ভয় করে না, যখন কেয়ামত দিবসে আমলনামা পড়া হবে আর তাতে দীন ও দুনিয়া কোনোটির সাথেই সম্পৃক্ত নয়— এমন কথা পাওয়া যাবে তখন তার অবস্থা কতটা করুণ হবে!?

জনৈক সাহাবি বলেন, কেউ যখন আমাকে কোনো প্রশ্ন করে তখন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে ঠান্ডা পানি পান করালে সে যতটা স্বাদ পায়, ওই ব্যক্তির উত্তর প্রদানে আমি এর চেয়ে বেশি স্বাদ অনুভব করি। কিন্তু আমার থেকে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কথা বের হয়ে যাবে— এই আশঙ্কায় আমি চুপ থাকি।

মুতরিফ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলার প্রতাপের দিকে দৃষ্টি রাখ। কুকুর অথবা গাধা দেখে বলো না, আল্লাহ! একে তাড়িয়ে দাও।

অপ্রয়োজনীয় কথার কোনো সীমারেখা নেই। তবে কুরআনে কারীমে প্রয়োজনীয় কথার সীমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.

তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি নির্দেশ দেয় দানখয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। (সূরা নিসা : ১১৪)

হাদিসে বলা হয়েছে— সেই লোকের জন্য সুসংবাদ, যে অনর্থক কথা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখে এবং অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে দেয়। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মানুষ এ বিষয়টিকে পাল্টে দিয়েছে। তারা অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করে রাখে এবং জিহ্বাকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়।

মুতরিফের বাবা বর্ণনা করেন, তিনি আমের গোত্রের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় বলতে থাকে, আপনি আমাদের পিতা, নেতা, শ্রেষ্ঠতম এবং অনুগ্রহদাতা, আপনি এমন, আপনি এমন। আল্লাহর রাসূল (স) বললেন,

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

তোমরা তোমাদের কথা বলো, শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮০৬)

আলোচ্য হাদিস দ্বারা বোঝা গেল, যখন কারও সত্য প্রশংসাও করা হয় তখন শয়তান অতিরিক্ত কথা মুখ দিয়ে বের করে দিতে পারে।

ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত কথার ব্যাপারে সতর্ক করছি। কথা ততটুকুই বলা উচিত, যতটুকুতে প্রয়োজন মিটে যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষের সব কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। কেউ যদি শিশুর কান্না থামানোর জন্য কোনো কিছু দেওয়ার কথা বলে না দেয়, তাহলে মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নামও লেখা হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমাদের আমলনামা বিছিয়ে রাখা হয়েছে আর তোমাদের আমলগুলো লিখে রাখার জন্য দুজন

ফেরেশতাকে মোতায়েন করা হয়েছে। এখন তোমরা কমবেশি যা কিছু করো না কেন সব লিখে রাখা হবে।

বর্ণিত আছে, সুলায়মান (আ) জনৈক জিনকে কোনো এক স্থানে পাঠিয়ে কয়েকজন গোয়েন্দা জিনকে এই বলে তার পেছনে লাগিয়ে দিলেন, তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো আর সে যা বলে, তা এসে আমাকে জানাবে। তারা ফিরে এসে বলল, সে বাজারে গিয়ে তার মাথা আকাশের দিকে উঠায়। এরপর মানুষের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াতে থাকে। সুলায়মান (আ) সেই জিনকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন করছিলে কেন? জিন বলল, আকাশের ফেরেশতাদেরকে দেখে আমি হতবাক হয়েছিলাম। তারা মানুষের মাথার উপর বসে কত দ্রুত তাদের আমলগুলো লিখছে। আর মানুষকে দেখেও আশ্চর্যবোধ করছিলাম তারা কত দ্রুত বিপথগামী হচ্ছে।

ইবরাহিম তায়মী (র) বলেন, মুমিনের কথা বলা চিন্তা সহকারে হয়; কিছু উপকারিতা দেখলে বলে, অন্যথা নীরব থাকে। পক্ষান্তরে গুনাহগারের জিহ্বা দরজির কাঁচির মতো চলে। সে চিন্তাভাবনা না করেই অনর্গল বকতে থাকে।

হাসান (র) বলেন, যার কথা বেশি, সে বেশি মিথ্যুক। যার নিকট অর্থসম্পদ বেশি, তার গুনাহ বেশি আর চরিত্রহীন ব্যক্তি নিজের জন্য আযাব বয়ে আনে।

আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এক ব্যক্তি দীর্ঘক্ষণ কথা বললে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জিহ্বার ওপাশে কয়টি দরজা আছে, লোকটি বলল, দাঁত আর ঠোঁট আছে। তিনি বললেন, এদের একটিও কি তোমার কথায় নিষেধ করলো না?

এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) এই কথাটি ওই ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করেছিল। তিনি তাকে আরও বলেছিলেন, মানুষের জন্য সবচেয়ে মন্দ কাজ হলো, অতিরিক্ত কথা বলা।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, গর্ব ও অহংকারের ভয়ই আমাকে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত রাখে।

জনৈক পণ্ডিত বলেন, যদি কারও কোনো মজলিসে কথা বলতে ভালো লাগে সে যেন চুপ থাকে, আর যদি কারও চুপ থাকতে ভালো লাগে সে যেন কথা বলে।

ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, আলেমের জন্য কথা বলার চেয়ে কথা শোনাও এক ধরনের পরীক্ষা। তাই যতক্ষণ অপর ব্যক্তি কথা বলে, ততক্ষণ নীরব থাকা উচিত। কারণ, কথা শোনার মধ্যে নিরাপত্তা আছে। বলার মধ্যে নেই।

ইবনে ওমর (রা) বলেন, মানুষের যে অঙ্গটি সবচেয়ে বেশি পবিত্র রাখা প্রয়োজন তা হলো জিহ্বা।

আবুদ দারদা (রা) একবার এক বাচাল মহিলাকে দেখে বললেন, এই মহিলা বোবা হলেই তার জন্য ভালো হতো।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম (র) বলেন, মানুষ অতিরিক্ত সম্পদ ও অতিরিক্ত কথা বলার কারণে ধ্বংস হয়।

৩. অবৈধ বিষয়াদি বলা

অবৈধ বিষয়াদি বলাও অনর্থক কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমোক্ত দু'টি বিষয় ছিল মুবাহ। আর যে কথা শুধু প্রয়োজনের অতিরিক্তই নয় বরং হারামও বটে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। যেমন গুনাহের কথাবার্তা বলা, নারীর কথা বলা, শরাবের আসর ও মন্দ লোকের মজলিসের কথা বর্ণনা করা। এগুলো সব তৃতীয় প্রকারের মধ্যে শামিল এবং নিশ্চিতভাবে নাজায়েয ও হারাম। এই বিপদটির সূচনা এভাবে হয় যে, প্রথমে অনর্থক ও অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে। এরপর ধীরে ধীরে তা অবৈধ আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনেকে চিত্তবিনোদনের জন্য আসার জমায়, কিন্তু তাতে অন্য কারও মান-ইজ্জতের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়, কিংবা উপরিউক্ত বিষয়াদি নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। নিষিদ্ধ বিষয়ের অসংখ্য ও অগণিত প্রকার রয়েছে। এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো, দীন অথবা দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মাঝেই নিজের কথাকে সীমাবদ্ধ রাখা।

বিলাল ইবনে হারিস (র) বলেন, একদিন নবী করিম (স) বললেন, মানুষ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির একটি কথা বলে। সে জানে না, এতে কোনো বড় সন্তুষ্টি হাসিল হবে, কিন্তু এজন্য আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আপন সন্তুষ্টি লিখে নেন। কখনো মানুষের যবান দিয়ে অসন্তুষ্টির একটি কথা

বের হয়ে পড়ে। সে এটাকে খুব বড় অসন্তুষ্টির কারণ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আপন অসন্তুষ্টি লিখে নেন।

আলকামা (র) বলেন, বেলাল ইবনে হারিসের এ হাদিস আমাকে অধিক কথা বলতে বারণ করে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেউ যখন তার সঙ্গীদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলে, এর কারণে সে জাহান্নামে সুরাইয়া তারকার চেয়ে দূরে গিয়ে পতিত হয়। (সহিহ বুখারী : ৬৪৭৭)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অনেক সময় মানুষ নিজের অজান্তে এমন কথা বলে ফেলে যার কারণে সে জাহান্নামে যায়। আবার কখনো এমন কথা বলে বসে যার মাধ্যমে সে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্টিত হয়। (মুআত্তা ইবনে মালেক : ২ : ৯৮৫)

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَعْظَمُ النَّاسِ خَطَايًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ خَوْضًا فِى الْبَاطِلِ.

কেয়ামত দিবসে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বিপদে থাকবে যে সবচেয়ে বেশি অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে।

কুরআনুল কারীমের এই দুটি আয়াতও এদিকে ইঙ্গিত করে,

وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ.

এবং আমরা ভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সাথে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় লিপ্ত থাকতাম। (সূরা মুদ্দাস্‌সির : ৪৫)

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ.

যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না। অন্যথা তোমরাও তাদের মতো হবে। (সূরা নিসা : ১৪০)

সালমান ফারসি (রা) বলেন, কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির আমলমানায় সবচেয়ে বেশি গুনাহ লিপিবদ্ধ থাকবে, যে কথার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে।

ইবনে সিরীন (র) বলেন, জনৈক আনসারি সাহাবি যখন অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যেতেন তখন বলতেন, তোমরা অযু করে নাও। কারণ, তোমাদের কিছু কিছু কথা হদসের চেয়েও নিকৃষ্ট।

৪. কথার মাঝে কথা বলা এবং ঝগড়া করা

হাদিস শরিফে এসেছে, আপন ভাইয়ের কথার মধ্যে কথা বলো না এবং তার সাথে ঝগড়া করো না। তাকে এমন ওয়াদা দিয়ো না, যা পালন করবে না। (জামে তিরমিযী : ১৯৯৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা কারও কথার মাঝে কথা বলো না, কারণ, এর মাঝে কোনো হেকমত নেই; বরং এর কারণে ফেতনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি সত্যের ওপরে থাকা সত্ত্বেও কথার মাঝে কথা বলা বর্জন করে, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি মিথ্যার ওপর থেকে কথার মাঝে কথা বলা বর্জন করে তার জন্য জান্নাতের মাঝামাঝি স্থানে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। (জামে তিরমিযী : ১৯৯৩)

উম্মে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মূর্তিপূজা ও মদপানের নিষেধাজ্ঞার পর আল্লাহ তাআলা যে কাজটি না করার ব্যাপারে আমার থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা হলো, মানুষের সাথে ঝগড়া না করা। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৮০৮২)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হেদায়াতপ্রাপ্তির পর যারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা ঝগড়া-বিবাদের কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। (জামে তিরমিযী : ৩২৫৩)

এক হাদিসে বলা হয়েছে,

لَا يَتَكَمَّلُ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتّٰى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا.

'কথার মাঝে কথা বলা বর্জন না করা পর্যন্ত কোনো বান্দা ঈমানের হাকীকত পূর্ণ করে না, যদিও তা সত্য হয়।'

আরও বলা হয়েছে, যার মধ্যে ছয়টি অভ্যাস থাকে, সে ঈমানের হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়— (১) গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা, (২) খোদাদ্রোহীদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করা, (৩) মেঘলা দিনে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া; (৪) বিপদে ধৈর্যধারণ করা; (৫) তীব্র শীতেও পূর্ণরূপে অযু করা এবং (৬) সত্যের পথে থাকা সত্ত্বেও বিতর্কে না জড়ানো।

যুবায়ের (রা) তাঁর পুত্রকে বলেন, কুরআন নিয়ে কারও সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার দীনকে বিবাদের লক্ষ্যবস্তু বানায় সে কোনো ব্যাপারে অটল ও অবিচল থাকতে পারে না।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, কারও কথার মাঝে কথা বলা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ এটা আলেমের জন্য মূর্খতার পরিচায়ক। আর শয়তানও এই অবস্থায় পথভ্রষ্ট করার সুযোগ পায়। বলা হয়, আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের পর একমাত্র ঝগড়া বিবাদই মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

মালেক ইবনে আনাস (র) বলেন, ঝগড়া-বিবাদ দীনের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। তিনি আরও বলেন, বিবাদে জড়ালে অন্তর শক্ত হয়ে যায় এবং তাতে হিংসা-বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয়।

লোকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, আলেমদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তারা তোমাকে অপছন্দ করবে।

বেলাল ইবনে সাদ (র) বলেন, যখন তুমি জেদী, ঝগড়াটে ও একগুঁয়ে কোনো ব্যক্তিকে দেখবে, মনে করবে পরকালে তার ক্ষতি অবধারিত হয়ে গেছে।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও তোমরা মতভিন্নতা পরিহার করো। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি একটি আনারের ব্যাপারে বলি, সেটা টক আর আমার ভাই বলে, সেটা মিষ্টি তাহলে এই সামান্য বিতর্কও বাদশার দরবার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, তোমার যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারো। কিন্তু সামান্য ঝগড়া এই সম্পর্কের ইতি টানতে পারে এবং তোমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে।

ইবনে আবী লায়লা (র) বলেন, আমি আমার কোনো বন্ধুর সাথে বিতর্কে জড়াই না। কারণ এতে হয়তো সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে অথবা রাগান্বিত হবে।

আবুদ দারদা (রা) বলেন, সর্বদা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকাই গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রত্যেক ঝগড়াটে ব্যক্তির কাফফারা হলো দুই রাকাত নামায।

ওমর (রা) বলেন, তিনটি উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করো না আর তিন কারণে তা বর্জন করো না। ঝগড়া, অহংকার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করো না। আর লজ্জা, যুহদ এবং মূর্খতার ওপর সন্তুষ্টি— এই তিন কারণে জ্ঞান অর্জন করা ছেড়ে দিয়ো না।

ঈসা (আ) বলেন, যে অধিক পরিমাণে মিথ্যা কথা বলে তার চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়, যে মানুষের সাথে অযৌক্তিক বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তার গাম্ভীর্যতা কমে যায়। যে বেশি চিন্তাভাবনা করে সে অসুস্থ হয়ে যায় আর যার স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় সে নিজেই নিজেকে শাস্তি দেয়।

একবার মায়মুন ইবনে মেহরান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ ঘৃণাবশত আপনার থেকে দূরে সরে যায় না কেন? তিনি বললেন, আমি কারও সাথে বেশি ঘনিষ্টও হই না, কারও সাথে ঝগড়াও করি না।

কথার মাঝে কথা বলার অর্থ হলো, কারও কথার মধ্যে ভুল বের করে তা উত্থাপন করা, এই ভুল তার বলা শব্দের মাঝে হতে পারে, অর্থের মাঝে হতে পারে, আবার বক্তার ইচ্ছার মাঝেও হতে পারে। এজন্য উচিত হলো, কেউ সত্য কথা বললে তার সত্যায়ন করা। আর মিথ্যা বললে এবং তা দীনের সাথে সম্পৃক্ত না হলে চুপ থাকা।

কথার মাঝে এই ভুল ধরা কখনো শাব্দিক দিক থেকে হতে পারে। যেমন নাহু, সরফের দিক থেকে ভুল, ভাষাগত ভুল, কবিতার ছন্দের মাঝে ভুল। আর এসব ভুল অনেক সময় বক্তার জ্ঞান স্বল্পতার কারণে হয় আবার অনেক সময় মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। যেভাবেই হোক তার ভুল ধরা উচিত নয়। কখনো এই ভুল ধরা অর্থগত দিক থেকেও হতেপারে। যেমন বক্তাকে বলা যে, আপনি ভুল বলেছেন, অথবা আপনার এই মতটি সঠিক নয়।

আবার ভুল ধরা কখনো কখনো ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেও হতে পারে। যেমন বক্তাকে এই কথা বলা যে, আপনার কথা সত্য। কিন্তু উদ্দেশ্য ভালো নয়।

মোটকথা, এসকল স্থানে চুপ থাকাটাই শ্রেয়, তবে যদি জ্ঞানার্জনের জন্য এসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং বক্তার ভুল ধরার কোনো সুপ্ত বাসনা না থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর বিতর্কে ও বিবাদে জড়ানোর অর্থ হলো, প্রতিপক্ষকে লাজওয়াব করে দেওয়া, তার অজ্ঞতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও অপারগতার ঘোষণা করা যেন মানুষ তাকে নিয়ে উপহাস করে।

কথার মাঝে কথা বলা এবং বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো, চুপ থাকলে গুনাহ হয় না— এমন প্রতিটি বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা।

বস্তুত মানুষের মাঝে এই দোষ দুটি তখনই পরিলক্ষিত হয় যখন তার মাঝে প্রতিপক্ষকে হেয় করা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার বাসনা জেগে ওঠে। আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা ও অন্যকে হেয় করার বাসনাই মানুষকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কারণ, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা অহংকারের নামান্তর। আর অহংকার করা একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য।

আর অপরকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা তো হিংস্র প্রাণীর স্বভাব। কারণ হিংস্র প্রাণীও মানুষকে আঘাত ও কষ্ট দিয়ে থাকে।

বাক-বিতণ্ডা ও অযৌক্তিক তর্কের মাধ্যমে অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে দুই বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয় এবং পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়। বিতর্কে লিপ্ত উভয় পক্ষই অপর পক্ষকে চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করতে উদ্যত হয় যেন সে কিছুতেই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। একে অপরের যুক্তি এমনভাবে খণ্ডন করতে চায় যেন মানুষ তার ইলমের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়।

বস্তুত এটি একটি ব্যাধি। এর চিকিৎসা হলো, অহংকার এবং অন্যকে হেয় করার হীন মানসিকতার মূলোৎপাটন করা। কারণ কোনো ব্যাধির চিকিৎসা তার প্রকৃত কারণ দূর করার মাধ্যমেই করা হয়। আর কথার মাঝে কথা বলা ও বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ অহংকার ও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার হীন মানসিকতা। কাজেই এই দুটির মূলোৎপাটন করলেই এই ব্যাধির নিরাময় সম্ভব।

বর্ণিত আছে, একবার ইমাম আবু হানিফা (র) দাউদ তাঈ (র)-এর নিকট তার একাকীত্ব অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি বিবাদ ও বিতর্ক ত্যাগ করে সাধনার উদ্দেশ্যে একাকীত্ব গ্রহণ করেছি। আবু হানিফা (র) বললেন, আপনি বিভিন্ন মজলিসে গিয়ে মানুষের কথা শুনে চুপ থাকুন। এটাই হবে বড় সাধনা। দাউদ তাঈ (র) বলেন, আমি তার কথামতো কাজ করে বুঝলাম, এটাই সবচেয়ে বড় সাধনা।

দাউদ তাঈ (র) যথার্থই বলেছেন, কারণ কারও ভুল শুনে তার ওপর নীরবতা অবলম্বন খুবই কঠিন কাজ। বিশেষ করে যখন সে ওই ভুল শুধরে দিতে সক্ষম হয়।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি সত্যের ওপরে থাকা সত্ত্বেও কথার মাঝে কথা বলা বর্জন করে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন।

আর এই অবস্থা অধিকাংশ সময় মাযহাব ও আকিদা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় । কারণ মাযহাব ও আকিদাগত বিষয়ে কেউ ভুল বললে তা শুনে ধৈর্যধারণ করা কঠিন কাজ। তথাপি এখানে ধৈর্যধারণ করা উচিত। কাউকে প্রকাশ্য বিদআতে লিপ্ত হতে দেখলে চুপে চুপে নম্রভাবে তার ভুল ধরিয়ে দিবে। তার সাথে বিতর্কে জড়াবে না। বিতর্কে জড়ালে সে মনে করবে, প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে তাদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করে সেও তা-ই করছে। এই ধারণা তার অন্তরে বিদআতকে আরও সুদৃঢ় করবে।

আর যদি মনে করে যে, উপদেশ ও ভালো পরামর্শ তার কোনো কাজে আসবে না। তাহলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

رَحِمَ اللهُ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِأَحْسَنَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির প্রতি করুণা করেন, যে আহলে কিবলার (মুসলমান) সাথে ভালো কথা ছাড়া অন্য কথা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে।

হিশাম ইবনে ওরওয়াহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এই কথাটি সাতবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং মানুষও যার প্রশংসা করে তার অন্তরে অহংকার দানা বাঁধে। এক পর্যায়ে এ থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুষ্কর হয়ে পড়ে।

৫. 'খুসুমত' তথা বিবাদ

এর মধ্যে এবং পূর্ববর্তী مراء-এর মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে, অপরকে হেয় ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কারও কথার মধ্যে দোষত্রুটি খুঁজে বের করাকে বলা হয় مراء আর উদ্দিষ্ট ধনসম্পদ পাওয়ার লক্ষ্যে যে বিবাদ করা হয়, তাকে বলে 'খুসুমত'। এটা কখনো আপত্তি ছাড়াই এবং কখনো আপত্তি সহকারে হয়, কিন্তু مراء আপত্তি ছাড়া হয় না। এ ধরনের খুসুমতও শরিয়ত অপছন্দ করে।

আয়েশা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللهِ اَلْخَصْمُ.

অধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক ঘৃণিত। (সহিহ বুখারী : ২৪৫৭)

আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া কোনো বিবাদে লিপ্ত হয় সে বিবাদ ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার রোষানলে থাকে।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, তোমরা ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করো। কারণ তা দীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

বলা হয়, মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তি কখনো ঝগড়া করে না।

ইবনে কুতায়বা (র) বলেন, একদিন আমি বসে আছি, এমন সময় বশীর ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বসে আছো কেন? আমি বললাম, আমার ও আমার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমার উপর তোমার পিতার অনুগ্রহ আছে। আমি তোমাকে এর প্রতিদান দিতে চাই। শোনো, বিবাদের চেয়ে খারাপ কোনো কিছু নেই। এতে দীন ধর্ম সব ধ্বংস হয়, ভদ্রতা বিনষ্ট হয় এবং জীবনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যায়। মন সবসময় এদিকেই পড়ে থাকে। একথা শুনে আমি ঘরে ফেরার জন্য উঠলাম। আমার প্রতিপক্ষ বলল, কোথায় যাও? আমি বললাম, না, আর ঝগড়া নয়। সে বলল, সম্ভবত জানতে পেরেছ যে, আমিই সত্যপথে আছি। বললাম, না। তা নয়; বরং আমি ঝগড়া দূরে

ঠেলে দিয়ে নিজে মহৎ হতে চাই। সে বলল, যদি তাই হয় তবে আমিও আর কোনো দাবি রাখছি না। সে জিনিসটি এখন তুমিই নিয়ে নাও।

প্রশ্ন হয়, যখন কারও হক কোনো জালিম ব্যক্তি আত্মসাত করে, তখন তা উদ্ধার করার জন্য মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজন হয়। সুতরাং এটা নিন্দনীয় হবে কেন?

জবাব হচ্ছে, মামলা-মোকদ্দমা সব সময় এক রকম হয় না। কখনো মিথ্যা হয় আবার কখনো না জেনে না শুনেও হয়; যেমন, উকিল সত্য কোন পক্ষ তা না জেনেও যুক্তি প্রমাণ পেশ করে। আবার কখনো হকের পরিমাণের চেয়ে অধিক হকের জন্যও মামলা-মোকদ্দমা করা হয়। মাঝে মধ্যে কেবল প্রতিপক্ষকে হেয় ও নির্যাতিত করার উদ্দেশ্যে মোকদ্দমা করা হয়। এছাড়া শত্রুতার কারণে সামান্য বিষয়ের জন্যও এটা করা হয়। এ ধরনের মামলা-মোকদ্দমা খুবই ঘৃণার কাজ।

যদি নিপীড়িত ব্যক্তি নিজের হক পাওয়ার জন্য শরিয়ত অনুযায়ী মামলা করে; তীব্র বিবাদ, অপব্যয় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাঙ্গামা না করে এবং শত্রুতা ও নির্যাতনের ইচ্ছা না থাকে, তবে এরকম মামলা-মোকদ্দমা অবৈধ নয়, কিন্তু যে পর্যন্ত মোকদ্দমা ছাড়াই উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় সেই পর্যন্ত তা না করাই উত্তম। কেননা, মামলা-মোকদ্দমা ও কলহের মধ্যে জিহ্বাকে সংযত রাখা খুবই কঠিন। ঝগড়ার কারণে বুকের মধ্যে ক্রোধের অনল জ্বলে ওঠে। এ কারণে সত্য-মিথ্যার পরওয়া করা হয় না। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে কেবল হিংসা-বিদ্বেষই অবশিষ্ট থেকে যায়। এমনকি, এক পক্ষের কষ্টে অপর পক্ষ খুশি হয়। যে লোক প্রথমে বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা করে, সে উপরিউক্ত অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে পড়ে, কমপক্ষে তার মনে উদ্বেগ প্রবল থাকে। এমনকি, কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, নামাযের মধ্যেও এ চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে।

অতএব, ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক হলো যাবতীয় মন্দ কাজের উৎস, কাজেই প্রয়োজন ছাড়া এসবে জড়ানো উচিত নয়।

প্রয়োজনের সময়ও জিহ্বা ও অন্তরকে ঝগড়া-বিবাদের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে। যদিও এই বিষয়টি বড়ই জটিল। সুতরাং যে ব্যক্তি শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে বিতর্কে লিপ্ত হয় সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকলেও উত্তম বিষয় বর্জনকারী বিবেচিত হয়।

বিবাদ ও বিতর্কে জড়ানোর সর্বনিম্ন ক্ষতি হলো, পরস্পরের মাঝে ভালোভাবে কথা বলার রেওয়াজ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এটা সওয়াবপ্রাপ্তির কারণ। ভালোভাবে কথা বলার সর্বনিম্ন স্তর হলো, প্রতিপক্ষের কথায় সংহতি জানানো। অথচ বিতর্কে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। তাকে মূর্খ ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। ফলে ভালোভাবে কথা বলার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, উৎকৃষ্ট কথা এবং অভুক্তকে খাবার খাওয়ানোই জান্নাতে তোমাদের জায়গা করে দিবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে। (সূরা বাকারা : ৮৩)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে সে সূর্যের উপাসক হলেও তার সালামের উত্তর দিবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا.

তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা : ৮৬)

ইবনে আব্বাস (রা) আরও বলেন, ফেরাউনও যদি আমাকে কোনো ভালো কথা বলে আমিও তার ভালো উত্তর দিবো।

আনাস (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, জান্নাতে এমন কিছু ঘর রয়েছে যার ভেতরে থেকে বাইরের দৃশ্য এবং বাইরে থেকে ভেতরের দৃশ্য অবলোকন করা যায়। যারা ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায় এবং নম্রভাবে কথা বলে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা এগুলো প্রস্তুত করেছেন। (জামে তিরমিযী : ১৯৮৪)

বর্ণিত আছে যে, একবার ঈসা (আ)-এর পাশ দিয়ে একটি শূকর যাচ্ছিল। তিনি সেটাকে লক্ষ্য করে বললেন, নিরাপদে চলে যা। লোকেরা অবাক

হয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা তো নাপাক প্রাণী? তিনি বললেন, আমি চাই না যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো খারাপ কথা বের হোক।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

ভালো শব্দ উচ্চারণ করাও সদকাস্বরূপ। (সহিহ মুসলিম : ১০০৯)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

তোমরা খেজুরের দানা দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো। যদি তাও না পাও তাহলে উত্তম কথা বলো। (সহিহ বুখারী : ৬০২৩)

ওমর (রা) বলেন, সততা খুবই সহজ জিনিস। তা হলো, সহাস্যবদন ও বিনম্র কথন।

জনৈক পণ্ডিত বলেন, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথা বলার দ্বারা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ধুয়ে যায়।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার কথায় ততক্ষণ পর্যন্ত রাগান্বিত হন না যতক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশের লোকেরা সেই কথায় সন্তুষ্ট থাকে। কাজেই ভালোভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে কৃপণতা না করা উচিত। হয়ত আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে সৎলোকদের সওয়াব দান করবেন।

৬. কথার প্রাঞ্জলতা লৌকিকতার উদ্দেশ্যে

অধিকাংশ বক্তার অভ্যাস হচ্ছে, তারা মূল বিষয়বস্তু বর্ণনার পূর্বে ভূমিকা সাজায়। এ ধরনের লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা নিন্দনীয়।

হাদিসে বলা হয়েছে,

اَنَا وَ اَتْقِيَاءُ اُمَّتِيْ بَرَاءٌ مِّنَ التَّكَلُّفِ.

আমি ও আমার উম্মতের মুত্তাকীরা লৌকিকতা থেকে মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং কেয়ামত দিবসে যারা আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা হলো ওই সকল ব্যক্তি যারা অনর্থক বকবক করে, উপহাস করে এবং অহংকার করে। (জামে তিরমিযী : ২০১৮)

ফাতেমা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

شِرَارُ أُمَّتِيْ الَّذِيْ غَذُوْا بِالنَّعِيْمِ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ يَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ.

আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা ধনসম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, নানাবিধ খাবার খায়, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে এবং কথা বলার সময় লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, জেনে রাখো! দীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছে। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

ওমর (রা) বলেন, বক্তব্যকে অযথা দীর্ঘায়িত করা শয়তানের কাজ।

একদিন ওমর ইবনে সা'দ তাঁর বাবার কাছে নিজের কিছু অভাব অনটনের কথা বলতে এসে দীর্ঘ ভূমিকা পেশ করলেন। সা'দ (রা) বললেন, অভাবের কথা বলতে এসে আজ তুমি যে দীর্ঘ ভূমিকা বর্ণনা করলে, তা কখনো করো না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ কথা চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে। যেমন, গাভী ঘাস চিবায়। এ থেকে বোঝা গেল, সা'দ (রা) অভাব ব্যক্ত করার পূর্বে পুত্রের ভূমিকা বর্ণনাকে দূষণীয় মনে করেছেন। তিনি একে নিছক লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা আখ্যা দিয়েছেন। কথার মধ্যে অভ্যাস বহির্ভূত ছন্দের মিলও এর মধ্যে শামিল। এমনিভাবে সাধারণ কথাবার্তার মাঝে ছন্দমিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার শাস্তিস্বরূপ অপরাধীদেরকে গোলাম আযাদ করতে বললে একজন অপরাধী বলে উঠল,

كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ.

আমরা এমন শিশুর রক্তপণ কেন দিবো, যে কোনো কিছু পান করেনি, খায়নি এমনকি একবারও চিৎকার করেনি। এমন শিশুর রক্তপণ ক্ষমা করা হোক। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, বেদুইনদের মতো ছন্দমিল রেখে কথা বলছো!?

রাসূলুল্লাহ (স) তার ছন্দমিল রেখে কথা বলাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ তার কথার মাঝে সুস্পষ্ট কৃত্রিমতা ছিল।

অতএব, কথাকে উদ্দেশ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, উদ্দেশ্যের বাইরে যা কিছু থাকবে তা কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত নয়। তবে খুৎবা ও ওয়াজে উৎকৃষ্ট শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট প্রভাবক হয়ে থাকে। তাই এতে উৎকৃষ্ট শব্দ থাকা ভালো। কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তার মাঝে এসব শব্দের ব্যবহার নিন্দনীয়। কারণ তা নিছক লৌকিকতা বৈ কিছুই নয়।

৭. অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ ও গালিগালাজ করা

এটা ঘৃণ্য ও হারাম কাজ। অভ্যন্তরীণ হটকারিতা ও প্রতিহিংসা থেকেই এর জন্ম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْفَحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَالتَّفَحِّشَ.

তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা ও অহেতুক বকাবকি পছন্দ করেন না।

যে সকল মুশরিক বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকেও গালি দিতে বারণ করে বলেছিলেন, তাদেরকে গালি দিয়ো না। কারণ তোমরা যা বলো তাতে তাদের তো কিছুই হয় না; বরং জীবিতদেরই কষ্ট হয়ে থাকে। আর সাবধান! মন্দ বলা ছোটলোকসুলভ কাজ।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অপরের দোষ বর্ণনাকারী, লানতকারী, অশ্লীল ও নোংরা শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি কখনো মুমিন হতে পারে না। (জামে তিরমিযী : ১৯৭৭)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অশ্লীল ও নোংরা ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম।

আরেক হাদিসে তিনি বলেন, চার ধরনের ব্যক্তি জাহান্নামীদেরকে তাদের কষ্টের ওপর আরও কষ্ট দিবে। তন্মধ্যে একজন ওই ব্যক্তি যার মুখে বমি ও রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। জাহান্নামীরা বলবে, এই হতভাগা কে, যে আমাদের কষ্টের ওপর আরও কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। সে বলবে, এ হলো সেই দুর্ভাগা, যে অশ্লীল ও নোংরা শব্দ ব্যবহারে এমন আনন্দ পেত যা স্ত্রী সহবাসে লাভ করা যায়।

একবার রাসূলুল্লাহ (স) আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আয়েশা! অশ্লীলতা যদি কোনো মানুষের আকৃতিতে হতো তাহলে সে হতো একজন নিকৃষ্ট মানুষ।

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

اَلْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ.

অশ্লীলতা এবং বকওয়াজ তথা বাচালতা কপটতার দুটি অংশ। (জামে তিরমিযী : ২০২৭)

আলোচ্য হাদিসে 'বয়ান' বলতে ওই সকল বিষয়ে কথাবার্তা বলা উদ্দেশ্য যেগুলো প্রকাশ করা বৈধ নয়। আবার এমন অতিরিক্ত কথাবার্তাও উদ্দেশ্য হতে পারে যা কৃত্রিমতার স্তরে পৌঁছে যায়। আবার দীনি বিষয় বা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি বর্ণনায় অতিরঞ্জনও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সাধারণ মানুষের কাছে এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করাই উত্তম।

অনেক সময় অতিরিক্ত বয়ান তাদের অন্তরে অযথা সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্রেক করে। সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলে তাদের অন্তর সেগুলো গ্রহণে আগ্রহী হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الصَّيَّاحَ فِي الْاَسْوَاقِ.

আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা, অযথা আলাপ ও বাজারে চিৎকার-চেচামেচি করাকে পছন্দ করেন না।

জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বসা ছিলাম। আমার পিতাও আমার সামনে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, অশ্লীলতা এবং অনর্থক কথাবার্তা ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। সর্বোৎকৃষ্ট মুসলমান তো তারাই যাদের চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৮৯)

ইবরাহিম ইবনে মাইসারা (র) বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, যারা অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা বলে কেয়ামত দিবসে তারা কুকুরের আকৃতিতে অথবা কুকুরের পেটে থেকে সকলের সামনে দাঁড়াবে।

আহনাফ ইবনে কায়স (র) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাধির কথা বলবো? তা হলো, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণকারী জিহ্বা এবং নিকৃষ্ট স্বভাব।

অশ্লীলতার সংজ্ঞা হচ্ছে, লজ্জাজনক বিষয়গুলোকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা— যেমন লজ্জাস্থানের নাম মুখে উচ্চারণ করা। অধিকাংশ ভাঁড় সব সময় এমন শব্দ উচ্চারণ করে থাকে, কিন্তু সৎ সাধু মানুষরা এসব শব্দ মুখে আনতে লজ্জা পায় এবং খুব প্রয়োজনে ইশারায় প্রকাশ করে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা লজ্জাশীল। যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং ইঙ্গিতে বর্ণনা করেন। দেখো, তিনি সহবাসকে "লামস" তথা স্পর্শ শব্দ দ্বারা ইশারায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এর জন্য এমন কিছু শব্দ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, যা না বলাই ভালো এবং তা অনেক সময় গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর কোনো কোনো শব্দের মধ্যে অশ্লীলতা অধিক এবং কোনো কোনো শব্দের মধ্যে তা কম থাকে। দেশ ও জাতিভেদে এগুলোর মধ্যেও বিভিন্নতা আছে।

কেবল স্ত্রী-সহবাস বোঝায় এমন শব্দের মধ্যেই অশ্লীলতা সীমিত নয়; বরং প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয়কেও এমন মনে করা উচিত। যেমন— মল-মূত্রত্যাগের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করা যেটা অন্যান্য শব্দের তুলনায় ভালো।

মোটকথা, যেসব শব্দ সাধারণত পছন্দনীয় নয় সেগুলো স্পষ্ট উল্লেখ করা অনুচিত। করলে অশ্লীলতার মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। একইভাবে নারীদের কথাও ইশারায় হওয়া উচিত। যেমন — 'আমার স্ত্রী একথা বলেছে' না বলে 'ঘরে একথা বলা হয়েছে', 'পর্দার আড়াল থেকে বলা হয়েছে', কিংবা 'বাচ্চাদের মা একথা বলেছে', বলা উচিত।

এমনিভাবে কারও ধবলকুষ্ট, কুষ্ঠ, অর্শ ইত্যাদি ঘৃণা উদ্রেককারী ব্যাধি থাকলে এগুলো উল্লেখ করা ঠিক নয়; বরং 'দুরারোগ্য ব্যাধি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করবে।

আলা ইবনে হারূন বলেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের একবার বগলে ফোঁড়া ওঠে। তিনি জিহ্বার খুব হিফাযত করতেন। আমরা তাঁকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ফোঁড়া কোথায় হয়েছে? তিনি বললেন, বাহুর ভিতরের দিকে।

অশ্লীলতার কারণে অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে কিংবা মন্দ লোকের সংসর্গে এ বদস্বভাব গড়ে উঠে।

একবার এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বলল, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো। তোমার মধ্যে কোনো বিষয় দেখে কেউ যদি তোমাকে লজ্জা দেয়, তবে তুমিও তার বিষয় দেখে তাকে লজ্জা দিয়ো না। অর্থাৎ, কেউ মন্দ বললে জবাবে তুমি অনুরূপ মন্দ বলো না। এতে সে শাস্তি ভোগ করবে এবং তুমি সওয়াব পাবে। কিছুতেই গালি দেবে না। গ্রাম্য লোকটি বলে, এরপর থেকে আমি আর কখনো গালি দেইনি। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৬৩)

আয়ায ইবনে হিমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, এক ব্যক্তি আমাকে গালি দেয়। মর্যাদায় সে আমার চেয়ে নিচু। আমিও তার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নিলে ক্ষতি কী? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, গালিগালাজকারী উভয়েই শয়তান হয়ে থাকে। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং অপবাদ দেয়। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৬২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَلْمُتَسَابَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا حَتّٰى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُوْمُ.

গালাগালিতে রত দুজন ব্যক্তি যেসব কুবাক্য উচ্চারণ করে সেসব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর ওপর বর্তায়, যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে। (সহিহ মুসলিম : ২৫২৭)

এক হাদিসে আছে,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

মুমিনকে গালি দেওয়া পাপাচার এবং লড়াই করা কুফর। (সহিহ বুখারী : ৪৮)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ওই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার বাবা-মাকে গালি দেয়। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ২১৭)

অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হচ্ছে বাবা-মাকে গালি দেওয়া। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, মানুষ বাবা-মাকে কীভাবে গালি দেবে? তিনি বললেন, কেউ অন্যের বাবা-মাকে গালি দেয় এবং জবাবে সে তার বাবা-মাকে গালি দেয়। এভাবে নিজ বাবা-মাকে গালি দেওয়ার কারণ সে নিজেই হয়। (সহিহ বুখারী : ৫৯৭৩)

৮. লানত ও ভর্ৎসনা করা

এটা জন্তু-জানোয়ার, মানুষ ও জড় পদার্থ সবার জন্য সমান। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانٍ.

মুমিন কখনো লানতকারী হতে পারে না। (জামে তিরমিযী : ২০১৯)

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلَا بِغَضَبِهٖ وَلَا بِجَهَنَّمَ.

তোমরা একে অপরকে আল্লাহর লানত, আল্লাহর গযব বা জাহান্নাম দ্বারা অভিসম্পাত করো না। (জামে তিরমিযী : ১৯৭৬)

হুযায়ফা (রা) বলেন, যারা একে অপরকে অভিসম্পাত করে তারা আল্লাহ তাআলার শাস্তির উপযুক্ত হয়।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) কোনো এক সফরে ছিলেন। এক আনসারী মহিলাও তার উটনীতে চড়ে সফর করছিল। পথিমধ্যে সে কোনো কারণে উটনীটির ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে অভিসম্পাত করলো। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, উটনীর বোঝাগুলো নামিয়ে তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে অভিশপ্ত। (সহিহ মুসলিম : ২৫৯৫)

আবুদ দারদা (রা) বলেন, কেউ যখন জমিনকে অভিসম্পাত করে তখন জমিন বলে, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করুন যে সবচেয়ে অবাধ্য!

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকরকে তার এক গোলামের প্রতি লানত করতে শুনলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! সিদ্দীকও লানত দেয়? কাবার রবের শপথ! এ বাক্যটি তিনি কয়েকবার বললেন। আবু বকর (রা) সেদিনই গোলামটিকে মুক্ত করে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, এখন থেকে আমি কখনো এমন ভুল করবো না।

এক হাদিসে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّاعِنِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"কিয়ামতের দিন অভিশাপ কারীরা সুপারিশকারীও হবে না, সাক্ষ্যদাতাও হবে না।" (সহিহ মুসলিম : ২৫৯৮)

আনাস (রা) বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে উটে চড়ে সফর করছিল। একপর্যায়ে সে কোনো কারণে উটটিকে অভিসম্পাত করলো। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! এই অভিশপ্ত উটের পিঠে চড়ে আমাদের সাথে সফর করো না।

লানত তথা অভিসম্পাতের অর্থ, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়া। আর তা কেবল ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার মাঝে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিশেষণ পাওয়া যায়। এমন বিশেষণ হচ্ছে কুফর ও জুলুম। সুতরাং কাফিরের উপর অথবা জালেমের উপর অভিসম্পাত হোক, একথা বলা জায়েয।

মোটকথা, শরিয়তে যেসব শব্দ বর্ণিত আছে, সেসব শব্দ দ্বারা অভিশাপ দেওয়া উচিত। কারণ, এতে বিপদও আছে। কেননা, এটা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি যে, অভিশপ্তকে আল্লাহ তাআলা তার রমহত থেকে দূর করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলে দিলে তিনি জ্ঞাত হন।

তিনটি বিশেষণ লানতের দাবি রাখে : কুফর, বিদআত ও পাপাচার। এসব বিশেষণে লানত করার উপায় তিনটি। প্রথমত, ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করা; যেমন 'কাফির, বিদআতি ও ফাসিকদের উপর আল্লাহর লানত হোক' বলা; অথবা 'ইহুদি, খ্রিস্টান, ব্যভিচারী, জালিম ও সুদখোরের উপর লানত হোক' বলা। এ উভয়বিধ পন্থায় লানত করা জায়েয। তবে বিদআতিদের উপর লানত করতে সর্বসাধারণকে বারণ করা উচিত। কেননা, কোনটি বিদআত, তা চেনা দুষ্কর। হাদিসে এর জন্য কোনো শব্দ বর্ণিত নেই। তৃতীয়ত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করা। যেমন, যায়েদ কাফির, ফাসেক কিংবা বিদআতী হলেও 'যায়েদের উপর গযব পড়ুক' বলা যাবে না। কিন্তু শরিয়তে যার উপর লানত প্রমাণিত আছে, তার উপর লানত হোক বলায় ক্ষতি নেই। যেমন 'ফেরাউন ও আবু জাহেলের উপর লানত হোক' বলা, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জীবিত ব্যক্তি কট্টর কাফের হলেও তার উপর লানত করা ঠিক নয়। সে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করে মুমিনও হতে পারে।

প্রশ্ন হয়, কোনো মুসলমানকে তার বর্তমান অবস্থার বিবেচনা করে যদি 'আল্লাহ তার ওপর রহম করুন' বলা যায়, অথচ মৃত্যুর পূর্বে তার কাফের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে একজন কাফেরকে তার বর্তমান অবস্থার বিবেচনা করে কেন অভিসম্পাত করা যাবে না?

এর উত্তর হলো, 'আল্লাহ তার ওপর রহম করুন' এর অর্থ হলো, খোদায়ী রহমত প্রাপ্তির মাধ্যম তথা ইসলাম ও আনুগত্যের ওপর আল্লাহ তাআলা তাকে অটল রাখুন। কিন্তু কাফেরকে অভিসম্পাত করার বেলায় এই কথাটি প্রযোজ্য নয়। যদি তার ক্ষেত্রেও একথাটি প্রযোজ্য হয় তাহলে তা হবে তার কুফরির ওপর অবিচল থাকার কামনা করা। আর তা তো একটি স্বতন্ত্র কুফরি।

কাফেরের ব্যাপারে এতটুকু বলা যাবে 'যদি সে কাফের অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার ওপর আল্লাহ তাআলার লানত, আর যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে লানত নয়।' তবে সে কাফের অবস্থায় নাকি মুসলমান অবস্থায় মারা যাবে একটি সন্দিগ্ধ বিষয় হওয়ায় এটাও বিপন্মুক্ত নয়।

ভেবে দেখুন, কাফেরকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারেই যখন শরিয়ত এতো কঠোরতা আরোপ করেছে তখন ফাসেক ও বিদআতিকে অভিসম্পাত করা কীরূপে বৈধ হবে?

অতএব, কোনো ফাসেক বা বিদআতির নাম নির্দিষ্ট করে তাকে অভিসম্পাত করা যাবে না। কারণ একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া আর কারও পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয় যে, তার মৃত্যু কোন অবস্থায় হবে, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স)-ই ওহির মাধ্যমে তা জানতে পারেন, এ কারণেই তো তিনি তাঁর দুআর মধ্যে বলেছিলেন,

اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ.

হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহল ইবনে হিশাম ও উতবা ইবনে রবীআর ওপর লানত নাযিল করুন।

তিনি তার দুআর মধ্যে এমন কিছু লোকের নাম উল্লেখ করেছিলেন যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। (সহিহ বুখারী : ২৪০)

এমনকি রাসূলুল্লাহ (স)-ও পরিণাম সম্পর্কে না জেনে কাউকে অভিসম্পাত করলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে সতর্ক করা হতো।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন 'বীরে মাউনা'-এর অধিবাসীদের হত্যাকারীদেরকে অভিসম্পাত করলেন তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন,

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

(হে নবী!) আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন— এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা তো অত্যাচারী। (সূরা আলে ইমরান : ১২৮)

অর্থাৎ, হত্যাকারীরা তো তাওবাও করতে পারে। অতএব, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হলেন কীভাবে? (সহিহ বুখারী : ৪০৭০)

যদি কারও কাফের অবস্থায় মারা যাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে জানা যায় তাহলে তাকে অভিসম্পাত করা জায়েয। লক্ষ রাখতে হবে, এতে কোনো মুসলমানের যেন কষ্ট না হয়।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তায়েফ গমনকালে একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু বকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এই কবরটি কার? আবু বকর (রা) বললেন, এটা সাইদ ইবনুল আস নামক এক ব্যক্তির কবর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ছিল। একথা শুনে সাঈদ ইবনুল আস-এর পুত্র ওমর ইবনে সাঈদ রেগে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা ওই ব্যক্তির কবর যে আবু বকরের পিতা আবু কুহাফার চেয়ে বড় বাহাদুর ও দানশীল ব্যক্তি ছিল। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন, সে কীভাবে কথা বলছে। রাসূলুল্লাহ (স) ওমর ইবনে সাঈদকে থামতে বললেন, সে চলে গেলে তিনি আবু বকর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, যখন কোনো কাফেরকে অভিসম্পাত করবে তখন ব্যাপকভাবে তাদেরকে অভিশম্পাত করো। কারণ কারও নাম উল্লেখ করে অভিসম্পাত করলে তাদের সন্তানরা রেগে যাবে।

নুআইমান (রা) মদপানে আসক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এজন্য তাকে কয়েকবার শাস্তিও প্রদান করা হয়েছিলো। একবার এক সাহাবী বলে ফেললেন, 'তার ওপর আল্লাহর লানত'। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার এই ভাইকে অভিসম্পাত করে তুমি শয়তানের সহযোগী হয়ো না। অন্য এক রেওয়ায়াতে এভাবে আছে যে, এমনটি বলো না। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। (সহিহ বুখারী : ২৩১৬)

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ফাসেকের নাম নির্দিষ্ট করে তাকে অভিসম্পাত করা না জায়েয।

মোটকথা, কাউকে লানত বা অভিসম্পাত করা বিপদ থেকে মুক্ত নয়। কাজেই উত্তম হলো, কাউকে গুনাহে লিপ্ত দেখলে তাকে অভিসম্পাত না করে শয়তানকে অভিসম্পাত করা। কারণ শয়তানই তাকে গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইয়াজিদ ইমাম হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেছিল কিংবা হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। তাকে লানত দেওয়া জায়েয কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হত্যা ও হত্যার নির্দেশ কোনোটিই যথার্থ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়। হত্যা ও হত্যার অনুমতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঘাতক বলা যায় না। কেননা, হত্যা কবীরা গুনাহ। প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে হত্যাকারী বলা যায় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেউ যদি কাউকে কাফের কিংবা ফাসিক বলে, বাস্তবে সে এ ধরনের না হলে যে বলে তার প্রতিই তা ফিরে আসে। (সহিহ বুখারী : ৬০৪৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেউ যখন কারও কাফের হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তখন কুফর তাদের মধ্যে যেকোনো একজনের ওপর আপতিত হয়। যদি তার কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে তো তার কথা অনুযায়ী ওই ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাস্তবে সে কাফের না হয় তাহলে অন্যকে অযথা কাফের সাব্যস্ত করার কারণে সাক্ষ্যদাতা নিজেই কাফের বলে বিবেচিত হবে।

এই বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সে ওই ব্যক্তিকে মুসলমান জেনে কাফের সাব্যস্ত করবে। কিন্তু যদি সে কাউকে বিদআতে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের বলে তাহলে সে গুনাহগার হবে, কাফের নয়।

মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন, আমি কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ও ন্যায়পরায়ণ বাদশার অবাধ্য হওয়া থেকে তোমাকে নিষেধ করছি।

মৃত ব্যক্তিকে অভিসম্পাতের বিষয়টি আরও গুরুতর। মাসরুক (র) বলেন, একবার আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তির কী অবস্থা, আল্লাহ তার ওপর লানত করুন! আমি বললাম, সে

তো মৃত্যুবরণ করেছে। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন! আমি বললাম আপনি তো কিছুক্ষণ পূর্বে তাকে অভিসম্পাত করলেন, অথচ এখন তার জন্য রহমতের দুআ করছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا.

তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ো না। কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের সাথে মিলিত হয়েছে। (সহিহ বুখারী : ৬৫১৬)

তিনি আরও বলেন,

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ.

তোমরা মৃতদেরকে গালাগাল করে জীবিতদেরকে কষ্ট দিয়ো না। (জামে তিরমিযী : ১৯৮২)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আমার সাহাবি, আমার ভাই ও আমার জামাতাদেরকে কটু কথা বলা থেকে নিজেদের জিহ্বাকে সংযত রাখো। হে লোকসকল! তোমাদের কেউ মারা গেলে তোমরা তার ভালো কাজগুলোই স্মরণ করো।

কেউ যদি বলে, "ইমাম হুসাইনের হত্যাকারীর উপর লানত হোক"— তবে এটা জায়েয কি না? জবাব হলো, এর সাথে একথাও বলা উত্তম, যদি সে তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে থাকে, তবে তার উপর লানত হোক। কারণ, কাফের অবস্থায় ওয়াহশী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতৃব্য হামযা (রা)-কে শহীদ করেছিলেন। এরপর মুসলমান হয়ে কুফর ও হত্যা সবকিছু থেকে তাওবা করেছিলেন। এখন কি কেউ তার উপর লানত করতে পারবে? পারবে না।

এখানে ইয়াজিদকে লানত করার বিষয়টি উত্থাপন করার কারণ, আজকাল মানুষ লানত করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিন কখনো লানতকারী হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে লানত করা উচিত নয়। যদি একান্তই মনে চায়, তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে ব্যাপক বিশেষণ সহকারে লানত করবে। লানত করার চেয়ে আল্লাহর যিকির করা উত্তম। অন্যথা চুপ থাকাই নিরাপদ।

মাক্কী ইবনে ইবরাহিম (র) বলেন, একবার আমরা ইবনে আওন (র)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। সেখানে বেলাল ইবনে আবু বুরদার আলোচনা এলে লোকেরা তাকে অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা করতে লাগলো। কিন্তু ইবনে আওন (র) চুপ থাকলেন। লোকেরা বলল, সে আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বলেই আমরা তাকে অভিসম্পাত করছি। ইবনে আওন (র) বললেন, কেয়ামত দিবসে আমার আমলনামায় দুটি বাক্য লেখা থাকবে। ১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ২. 'সে অমুককে অভিসম্পাত করেছে।' আর আমার আমলনামায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থাকাটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, কখনো কাউকে অভিশাপ দেবে না। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৭০)

ইবনে ওমর (রা) বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই ব্যক্তি, যে বেশি বেশি অভিসম্পাত করে।

জনৈক বুযুর্গ অভিসম্পাত করাকে মুমিন হত্যার সমতুল্য বলেছেন।

আবু কাতাদা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন বান্দাকে অভিসম্পাত করে সে যেন তাকে হত্যা করল। কারও জন্য বদদুআ করাও অভিসম্পাত করার মতোই। কোনো জালেমের ব্যাপারেও এই দুআ করা যাবে না যে, 'সে যেন অসুস্থ হয়ে যায়' অথবা 'সে যেন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করতে না পারে।'

হাদিসে এসেছে, মাজলুম জালেমের জন্য বদদুআ করে দুনিয়াতে তার বদলা নিয়ে নেয়। অতঃপর কেয়ামত দিবসে জালেমের জন্য কিছু অতিরিক্তই থেকে যায়।

৯. গান ও কবিতা আবৃত্তি

গানের মধ্যে কোনটি শোনা হারাম ও কোনটি হালাল সেমা পর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তাই এখানে পুনরায় আলোচনা করছি না। কবিতা ভালোও আছে মন্দও আছে, অবশ্য কবিতার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া নিন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কারও পেট পুঁজ দিয়ে ভরাট হয়ে যাওয়া যা তার পেটকে পঁচিয়ে বিনষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চেয়ে উত্তম। (সহিহ বুখারী : ৬১৫৫)

বর্ণিত আছে, একবার মাসরুক (র)-কে কেউ একটি কবিতার পংক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। প্রশ্নকারী তার অসন্তুষ্টির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি চাই না যে, কেয়ামতের দিন আমার আমলনামায় কোনো কবিতা থাকুক।

এক বুযুর্গকে একবার কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কবিতা ছেড়ে আল্লাহ তাআলার যিকির করো। কারণ কবিতার চেয়ে আল্লাহ তাআলার যিকির উত্তম।

অযথা কতাবার্তা না হলে কবিতা আবৃত্তি করা ও রচনা করা হারাম নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً কোনো কোনো কবিতা হেকমতপূর্ণ হয়ে থাকে। (সহিহ বুখারী : ৬১৪৫)

তবে কথা হচ্ছে, কবিতার মধ্যে প্রশংসা, দুর্নাম রটনা অথবা নারীদের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এতে মিথ্যারও অবকাশ রয়েছে। স্বয়ং রাসূলে কারীম (স) হাসসান ইবনে সাবিত আনসারী (রা)-কে কবিতায় কাফেরদের দুর্নাম রটনা করার আদেশ করেছিলেন। কারও প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করলে যদিও কিছুটা মিথ্যা হয়, তবে হারাম হয় না। যেমন এক কবির কবিতা,

وَلَوْلَمْ يَكُنْ فِيْ كَفِّهِ غَيْرُ رُوْحِهِ * لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُهْ.

অর্থাৎ, যদি তার কাছে তার প্রাণ ছাড়া অন্য কিছু না থাকতো তাহলে সে প্রাণও বিলিয়ে দিত। অতএব, যাঞ্চকারীর উচিত, আল্লাহকে ভয় করা।

আলোচ্য পংক্তিটি কারও বদান্যতা প্রকাশের জন্য রচনা করা হয়েছে, এমতাবস্থায় প্রশংসিত ব্যক্তি যদি বাস্তবে দানশীল না হয়ে থাকে তাহলে এটি মিথ্যা, আর যদি দানশীল হয়ে থাকে তাহলে এটা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বলা হয়েছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আর তা বৈধ।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনেও এমন কবিতা পাঠ করা হয়েছে, যাতে অতিশয়োক্তির বিষয়বস্তু তালাশ করলে পাওয়া যাবে, কিন্তু তিনি কখনও নিষেধ করেননি।

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি সূতা কাটছিলাম আর রাসূলুল্লাহ (স) জুতা সেলাই করছিলেন। আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, তাঁর ললাট ঘেমে গেছে এবং ঘর্মবিন্দু আলোর মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের অপরূপ সৌন্দর্য বিরাজ করছে। আমি দেখামাত্রই এ অলৌকিক সৌন্দর্যে অভিভূত

হয়ে পড়লাম। তিনি আমার হতবুদ্ধিতা আঁচ করে জিজ্ঞেস করলেন, এমন বিস্ময়াবিষ্ট হচ্ছ কেন? আমি বললাম, আপনার ললাটের ঘর্মবিন্দু থেকে সৌন্দর্যের যে তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, তাতেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। যদি আবু বকর হুযলী আপনাকে এ মুহূর্তে দেখত, তবে অবশ্যই জেনে নিত, তার কবিতার মূর্ত প্রতীক আপনিই। তিনি বললেন, তার কবিতা কী? আমি বললাম, এ দু'টি পংক্তি—

وَمُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غُبَرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيِلِ.

وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ.

সে ঋতুস্রাবের মলিনতা থেকে, দুধমাতার ভ্রষ্টতা থেকে এবং শয়তানের ব্যায়াম থেকে মুক্ত। তুমি যখন তার মুখমণ্ডলের পানে তাকাবে, তখন মনে হবে যেন তা বিদ্যুৎ উজ্জ্বল মেঘমালার ন্যায় ঝলমল করছে।

আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (স) আপন কাজ ছেড়ে আমার ললাটে চুম্বন এঁকে দিলেন। তিনি বললেন,

جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا يَا عَائِشَةُ، مَا سُرِرْتِ مِنِّيْ كَسُرُوْرِيْ مِنْكِ.

'হে আয়েশা! আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তুমি আমার প্রতি সম্ভবত এতটুকু খুশি হওনি, যতটুকু আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। (আস সুনানুল কুবরা : ৭ : ৪২২)

হুনায়ন যুদ্ধের পর রাসূলে আকরাম (স) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করলেন এবং আব্বাস ইবনে মিরদাসকে চারটি উট দান করলেন। সে উট নিয়ে চলে গেল এবং তার পাওনা আরও অধিক বলে অভিযোগ করে একটি কবিতা রচনা করল। যার শেষে ছিল,

وَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ * بَسُوْدَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ.

وَمَا كُنْتُ دُوْنَ امْرِىءٍ مِنْهُمَا * وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ.

অর্থাৎ, উয়াইনা ও আক্বরা কেউই সমাজ ও সমাবেশে মিরদাসের চেয়ে অগ্রসর হতে বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না।

আর প্রতিযোগিতায় আমি তাদের দুজনের চেয়ে পিছিয়ে নই। আর যে অনগ্রসর ও হীন বলে গণ্য হবে সে আর ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করলেন, তার অভিযোগ মিটিয়ে দাও। এরপর আবু বকর (রা) তাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন এবং এত বেশি দিলেন যে, সে ওযর পেশ করতে লাগল এবং বলল, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। কবিতা যখন আমার জিহ্বায় পিঁপড়ার মত কামড়াতে থাকে, তখন কিছু না বলে উপায় থাকে না। রাসূলুল্লাহ (স) হেসে বললেন, যতদিন উট উচ্চকণ্ঠে চেঁচাবে, ততদিন আরবরা কবিতা বলা বর্জন করবে না। (সহিহ মুসলিম : ১০৬০)

১০. হাসিঠাট্টা

মূলত এটাও খারাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু অল্প হলে দোষ নেই। হাদিসে আছে,

لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ.

'আপন ভাইয়ের কথার মাঝে কথা বলো না এবং তার সাথে ঠাট্টা করো না।' (জামে তিরমিযী : ১৯৯৫)

কথার মাঝে কথা বললে অপরের মনে কষ্ট হয়; তাকে মিথ্যুক ও মূর্খ গণ্য করা হয়। হাসিঠাট্টার মধ্যে এটা নেই। তবুও হাসিঠাট্টা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে অতিরঞ্জিত করা। এতে মন সর্বক্ষণ খেলাধুলা ও কৌতুকে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। খেলাধুলা যদিও মুবাহ, কিন্তু সর্বক্ষণ এতে ডুবে থাকা নিষিদ্ধ। অধিক হাসাহাসির কারণে অট্টহাসির পথ খুলে যায়, তাতে অন্তর মরে যায় এবং অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। হাসি এসব দোষ থেকে মুক্ত হলে নিন্দনীয় নয়।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَأُمَازِحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

আমি হাসিঠাট্টা করি, কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না। (জামে তিরমিযী : ১৯৯০) এটা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। অন্যদের উদ্দেশ্য তো থাকে যেভাবেই হোক কেবল অপরকে হাসানো।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বান্দা মজলিসের লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলে। এর মাধ্যমে সে জাহান্নামে সুরাইয়া তারকার চেয়েও দূরে গিয়ে পতিত হয়। (জামে তিরমিযী : ১৯৯০)

ওমর (রা) বলেন, যে অধিক হাসে, তার ব্যক্তিত্বের ছাপ কমে যায়। যে আনন্দ গীত গায়, সে মানুষের দৃষ্টিতে হালকা হয়ে যায়। যে এ কাজ বেশি করে, সে এ নামেই খ্যাত হয়ে যায়। যে অধিক কথা বলে, সে অধিক ভুল করে। যে অধিক ভুল করে তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কম, তার তাকওয়াও কম। যার তাকওয়া কম, তার অন্তর মরে যায়।

তাছাড়া হাসির কারণে মানুষ আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا.

যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে বেশি করে কাঁদতে এবং কম হাসতে। (সহিহ বুখারী : ১০৪৪)

জনৈক বুযুর্গ তার ভাইকে বললেন, ভাই আমার! তুমি কি জানো যে জাহান্নামে যেতে হবে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে সেখান থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে তা জানো? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে কী নিয়ে এত হাসাহাসি করছো? বর্ণিত আছে, এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেউ তার ভাইকে হাসতে দেখেনি।

ইউসুফ ইবনে আসবাত (র) বলেন, হাসান বসরী (র) ত্রিশ বছরে একবারও হাসেননি।

বলা হয়, আতা আস-সালিমী (র) চল্লিশ বছরেও একবার হাসেননি।

ওহায়ব ইবনে ওয়ারদ (র) কয়েকজন লোককে ঈদুল ফিতরের দিন আনন্দ ফূর্তি করতে দেখে বললেন, যদি এদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে, তাহলে এটা কৃতজ্ঞদের কাজ নয়। আর গুনাহ ক্ষমা না হয়ে থাকলে এটা ভীতদেরও কাজ নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আবি ইয়ালা (র) বলতেন, মানুষ হাসাহাসি করে, অথচ হতে পারে, ধোপার কাছ থেকে তার কাফনের কাপড় চলে এসেছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে লোক গুনাহ করে হাসে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে যাবে।

একবার মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি জান্নাতে কাউকে কাঁদতে দেখো তবে কি অবাক হবে না? উত্তরে বলা

হলো, অবশ্যই, তিনি বললেন, এর চেয়েও অবাক করা বিষয় হলো, বান্দা তার পরিণতি সম্পর্কে না জেনেই দুনিয়ায় হাসি-তামাশা করে।

যে হাসি আওয়াজ করে হয় তাই খারাপ। অর্থাৎ, যা মুচকি হাসির চেয়ে বেশি তা নিষেধ। নীরব হাসি, যাকে আরবি ভাষায় 'তাবাস্‌সুম' বলা হয়, তা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (স)-ও মুচকি হাসতেন।

মুআবিয়া (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কাসেম বর্ণনা করেন যে, একবার এক গ্রাম্য লোক একটি লাল উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম দিল। যখনই সে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যেতে চাচ্ছিল তখনই উট তাকে বাঁধা দিচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরাম হাসছিলেন, এক পর্যায়ে লোকটি উটটিকে কাবু করতে না পেরে তার পিঠ থেকে পড়ে মারা গেল।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, গ্রাম্য লোকটি উট থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে তো মরে গেছে কিন্তু তোমাদের মুখ তার রক্তে ভরে গেছে।

যে হাসি-তামাশার দ্বারা গাম্ভীর্যতা হ্রাস পায় সেটাও নিষিদ্ধ।

ওমর (রা) বলেন, যে বেশি হাসি-তামাশা করে সে মানুষের কাছে হালকা হয়ে যায়।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) বলেন, আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, বাচ্চাদের সাথে হাসাহাসি করো না, অন্যথা তারা তোমাকে সম্মান করবে না।

সাঈদ ইবনুল আস (রা) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, হে বৎস! কোনো ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের সাথে হাসি-তামাশা করবে না। অন্যথা সে তোমাকে ঘৃণা করবে আবার কোনো নিচু ও নিকৃষ্ট লোকের সাথেও হাসি-তামাশা করবে না। অন্যথা সে তোমার ওপর স্পর্ধা দেখাবে।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, আল্লাহকে ভয় করো, ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে বেঁচে থাকো, কারণ তা অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বেশি বেশি কুরআনের আলোচনা করো এবং কুরআনের মজলিস কায়েম করো। যদি এটা কঠিন মনে হয় তাহলে ভালো ভালো কথা বলো এবং ভালো মানুষদের কথা আলোচনা করো।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তোমরা কি জানো ঠাট্টা-বিদ্রূপকে কেন مزاح (মুযাহ) বলে নামকরণ করা হয়েছে? লোকেরা বললো, না। তিনি বললেন, শব্দটি ازاح (আযাহ) থেকে নির্গত। যার অর্থ দূর করে দেওয়া। যেহেতু ঠাট্টা-বিদ্রূপ মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাই একে مزاح বলে নামকরণ করা হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, প্রতিটি জিনিসেরই ফলাফল বা পরিণাম রয়েছে। আর ঠাট্টা-বিদ্রূপের ফলাফল হলো শত্রুতা।

আরও বলা হয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-ও রসিকতা ও হাসি-তামাশা করেছেন। কিন্তু তাদের সাথে সাধারণ মানুষের হাসি-তামাশাকে অনুমান করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রসিকতা এমন ছিল যে, তাতে মিথ্যার কোনো মিশ্রণ থাকতো না, এমন কোনো কথা থাকতো না, যার কারণে অন্য কেউ কষ্ট পায়। তাতে কোনো বাড়াবাড়ি থাকতো না। যদি কেউ এসকল শর্তের অনুসরণ করে রসিকতা করে তাহলে অসুবিধা নেই।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজকাল মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা সব সময় একাজেই লিপ্ত থাকে। আর এসব কাজে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই কাজকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ বলে মনে করে। তার উপমা তো হলো ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে দিনভর হাবশীদের খেলাধুলায় মত্ত থাকে। আর বলে, এটা ভালো কাজ। সে দলিল হিসেবে পেশ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ঈদের দিন আয়েশা (রা)-কে হাবশীদের খেলা দেখার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এটা স্পষ্ট ভুল। কারণ, বারবার সগীরা গুনাহ করতে থাকলে একপর্যায়ে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। আবার মুবাহ কাজও বারবার করতে থাকলে একপর্যায়ে তা সগীরা গুনাহে পরিণত হয়। কাজেই এ ব্যাপারে উদাসীন হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রসিকতার নমুনা আবু হুরায়রা (রা)-এর এই রেওয়ায়াতের মাঝে প্রতিভাত হয়— তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও আমাদের সাথে রসিকতা করেন! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ... তবে তাতেও আমি কেবল সত্য কথাই বলি। (জামে তিরমিযী : ১৯৯০)

আতা (র) বলেন, একবার এক লোক ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ (স) কি রসিকতা করতেন? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ...। লোকটি জানতে চাইলো, রাসূলুল্লাহ (স)-এর রসিকতা কেমন ছিল? তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের কোনো একজনকে একটি প্রশস্ত কাপড় উপহার দিয়ে বললেন, এটা পরো, আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করো এবং নববধূদের মতো মাথায় আঁচল দাও।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের সাথে রসিকতা করতেন।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। (জামে তিরমিযী : ৩৬৪১)

কেমন ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাসি ঠাট্টা— এ ব্যাপারে হাসান (রা) বর্ণনা করেন, এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বললেন, কোনো বৃদ্ধা বেহেশতে যাবে না। এ কথা শুনে বুড়ী কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, আরে, কাঁদ কেন? তুমি যখন বেহেশতে যাবে, তখন বুড়ী থাকবে না, যুবতী হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا .

নিশ্চয় আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে বানিয়েছি কুমারী। (সূরা ওয়াকিয়া : ৩৫-৩৬)

যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বর্ণনা করেন, উম্মে আয়মান রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বলল, আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে। তিনি বললেন, তোমার স্বামী কি সেই লোক নয়, যার চোখ সাদা? মহিলা বলল, তার চোখ তো ভালো। তাতে তো সাদা নেই। তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। মহিলা কসম করে বলল, নেই। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার চোখে সাদা অংশ নেই। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের চক্ষু কোটর সাদা ও কালো হয়ে থাকে।

অন্য একজন মহিলা তাঁর দরবারে হাজির হয়ে বহনের জন্য একটি উট চাইলো। তিনি বললেন, বহনের জন্য আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চা দেব। মহিলা বলল, বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? তিনি বললেন, উট তো উটের বাচ্চাই। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৯৮)

আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা)-এর একজন পুত্র ছিল। যার নাম ছিল আবু ওমায়ের। রাসূলুল্লাহ (স) যখনই তাদের কাছে যেতেন তখন তাকে ডেকে বলতেন, হে আবু ওমায়ের! কেমন আছে তোমার নুগায়র? (সহিহ বুখারী : ৬১২৯)

আবু ওমায়েরের নুগায়র নামক একটি পাখি ছিল। তিনি সেই পাখিটি নিয়ে খেলা করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি আমাকে বললেন, আয়েশা! এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। আমি আমার ওড়নাকে পেটে গুঁজে দিলাম এবং একটি রেখা টেনে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রতিযোগিতা শুরু হলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে হারিয়ে দিয়ে বললেন, আয়েশা! এটা 'যিল মুজায'-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ।

'যিল মুজায'-এর ঘটনা সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমি 'যিল মুজায' নামক স্থানে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে আগমন করেন। আমার পিতা একটি জিনিস দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে সেই জিনিসটি চাইলে আমি তা না দিয়ে দৌড়ানো আরম্ভ করলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-ও আমার পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমাকে ধরতে পারলেন না।

তিনি আরও বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তার আগে চলে গেলাম। অতঃপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সাথে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছনে ফেলে বিজয়ী হলেন। তিনি বললেন, এই বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। (সুনানে আবি দাউদ : ২৫৭৮)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে ছিলেন। সাওদা বিনতে যামআ (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি হারিরা (মধু ও ময়দা মিশ্রিত সুমিষ্ট খাদ্যবিশেষ) বানিয়ে

রাসুলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত করলাম। সাওদাকে খেতে বললে সে খেতে অস্বীকৃতি জানালো। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! খাও, অন্যথা আমি তোমার মুখে তা মেখে দিবো। সে বললো, আমি তা চেখেও দেখবো না। আমি সেখান থেকে কিছু হারিরা নিয়ে তার মুখে মেখে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মাঝেই বসা ছিলেন। তিনি তাঁর পা ছড়িয়ে দিলেন যাতে সাওদাও বদলা নিতে পারে। অতঃপর সাওদা সেখান থেকে হারিরা নিয়ে আমার মুখে মেখে দিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই দৃশ্য দেখে হাসতে লাগলেন। (সুনানে নাসায়ী : ৮৮৬৮)

যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী (রা) যারপরনাই কুশ্রী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন বাইয়াত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন আয়েশা (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান ছিল না। বাইয়াতের পর যাহ্হাক (রা) বললেন, আমার দু'জন স্ত্রী আছে, যারা এই মহিলা অর্থাৎ, আয়েশা (রা)-এর চেয়েও ভালো। আপনি বিবাহ করলে তাদের একজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেই। আয়েশা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা বেশি সুশ্রী, না তুমি? সে বলল, আমি তাদের চেয়ে অনেক ভালো। এই কথোপকথন শুনে রাসূলুল্লাহ (স) এই ভেবে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না যে, এমন চেহারা নিয়েও সে নিজেকে সুশ্রী মনে করে।

আলকামা (র) আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর জিহ্বা দেখিয়ে দেখিয়ে হুসাইন (রা)-কে হাসাচ্ছিলেন, এই দৃশ্য দেখে উয়াইনা ইবনে বদর (রা) বললেন, আমি আমার ছেলেকেও এতটা ভালোবাসি না। সে যৌবনে পদার্পণ করেছে অথচ আমি কখনো তাকে চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

যে ব্যক্তি অন্যের ওপর দয়া করে না তার ওপরও দয়া করা হয় না।

রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ জাতীয় যত রসিকতা ও হাসিঠাট্টার রেওয়ায়েত রয়েছে তার অধিকাংশই তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চাদের সাথে সম্পৃক্ত, কারণ তাদের অন্তর কোমল ও দুর্বল হয়ে থাকে। এই দুর্বলতার চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই তিনি তাদের সাথে এ জাতীয় রসিকতা করতেন।

একবার সুহাইব (রা)-এর চোখ উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তাঁকে খেজুর খেতে দেখে বললেন, তুমি খেজুর খাচ্ছো? তোমার তো চোখ উঠেছে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অপর পাশ দিয়ে চিবাচ্ছি। একথায় রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসলেন। রাবী বলেন, এমনকি আমি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৪৪৩)

বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার রাস্তায় খাওআত ইবনে যুবায়ের আনসারী (রা) কতিপয় মহিলার সাথে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) সেখান দিয়ে গমনকালে তাকে দেখে বললেন, তুমি এখানে মহিলাদের সাথে বসে আছো কেন? তিনি বললেন, আমার উটটি অবাধ্য। মহিলারা তার জন্য রশি বানিয়ে দিচ্ছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাজে চলে গেলেন। ফিরতি পথে তিনি আবার তাকে সেখানে দেখে বললেন, ওহে আবু আবদুল্লাহ! তোমার উট কি এখনো পালিয়ে যায়? তিনি বলেন, তাঁর কথায় আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম, এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

আমি মদীনায় আগমন করলাম। একদিন তিনি আমাকে মদীনার একটি মসজিদে নামায আদায় করতে দেখে আমার পাশে বসলেন। তাঁকে দেখে আমি নামায দীর্ঘায়িত করতে চাইলাম। তিনি বললেন, নামাযকে সংক্ষিপ্ত করো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি নামায শেষ করলে তিনি বললেন, আবু আবদুল্লাহ! তোমার উট কি এখনো পালিয়ে যায়? তাঁর কথায় আমি এতটাই লজ্জিত হলাম যে, তাঁর থেকে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম, কিন্তু একদিন আমি আবার তাঁর সামনে পড়ে গেলাম। তিনি তখন গাধার পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি আবার বললেন, আবু আবদুল্লাহ! তোমার উট কি এখনো পালিয়ে যায়? আমি বললাম, ওই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে আমার উট আর পালায় না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহু আকবার! হে আল্লাহ! আপনি তাকে হেদায়াত দান করুন। রাবী বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য প্রদান করেছিলেন এবং তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন।

নুআইমান আনসারী একজন রসিক ব্যক্তি ছিল, কিন্তু খুব মদ্যপান করতো। মদ্যপানের পর তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত করা হলে

তিনি আপন জুতা দিয়ে তাকে খুব প্রহার করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও আদেশ করতেন, তাঁরাও জুতা করতেন। অনেকবার এভাবে প্রহৃত হওয়ার পর একদিন জনৈক সাহাবি বললেন, তোমার প্রতি আল্লাহর লানত। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবিকে বললেন, এরূপ বলো না। এ ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখে। (সহিহ বুখারী : ২৩১৩)

এই নুআইমানের অবস্থা ছিল, মদীনায় কখনো দুধ অথবা অন্য কোনো খাদ্যবস্তু এলে সে তা ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত করে বলত, হুযুর, এ বস্তুটি আমি আপনার জন্যই ক্রয় করেছি এবং হাদিয়া এনেছি। যখন সেই বস্তুর মালিক দাম চাইতে আসত, তখন তাকেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত করে বলত, হুযুর অমুক বস্তুর দামটি দিয়ে দিন। তিনি বলতেন, তুমি তো আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলে। সে বলত, আমার কাছে দাম ছিল না, কিন্তু মন চাচ্ছিল, আপনি এ বস্তুটি খান। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) হেসে দাম দিয়ে দিতেন। অতএব কখনো কখনো এ ধরনের হাসিঠাট্টা করা জায়েয।

১১. হারাম উপহাস ও কৌতুক

যদি উপহাস বা কৌতুকের কারণে অপরের কষ্ট হয় তাহলে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাকে (যে-নাকারীকে) উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। (সূরা হুযুরাত : ১১)

উপহাসের অর্থ হচ্ছে অন্যকে হেয় করা, ছোট করা এবং তার দোষত্রুটি হাস্যকরভাবে বর্ণনা করা। এটা কথা ও কাজের অনুকরণ অথবা অঙ্গভঙ্গি দ্বারাও হতে পারে। কারও অনুপস্থিতিতে এমনটি হলে হবে গীবত আর উপস্থিতিতে হলে হবে ঠাট্টা, উভয়ের সারমর্ম একই।

আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তির অঙ্গ ভঙ্গি নকল করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

আল্লাহর শপথ! অনেক কিছু পাওয়ার পরিবর্তেও আমি পছন্দ করি না যে, কোনো মানুষের হেয় করি। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮৭৫)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন কারিমে ইরশাদ করেন,

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا.

এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং সব হিসাব রেখেছে। (সূরা কাহফ : ৪৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতে صغيرة (সগীরা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো মুমিনকে উপহাস করার উদ্দেশ্যে মুচকি হাসা। আর كبيرة (কাবীরা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুমিনকে উপহাস করার উদ্দেশ্যে অট্টহাসি দেওয়া।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই তাফসির দ্বারা বোঝা যায় যে, মুমিনকে নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করা এবং তার দোষত্রুটি নিয়ে হাসাহাসি করা গুনাহের কাজ।

আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বাতকর্মের (বায়ু নির্গত) ব্যাপারে হাসতে নিষেধ করে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ এমন কাজে কেন হাসে, যে কাজ সে নিজেও করে? (সহিহ বুখারী : ৪৯৪২)

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যারা মানুষকে নিয়ে উপহাস করে কেয়ামতের দিন তাদের সামনে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দিয়ে বলা হবে, এসো। যখন সে তীব্র ব্যথা বেদনা নিয়ে সেই দরজার কাছে উপনীত হবে তখন দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আরেকটি দরজা খুলে যাবে এবং একইভাবে তাকে সেখানে প্রবেশ করার আহবান জানানো

হবে। সে দরজার কাছে পৌঁছলে এবারও দরজাটি বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবেই চলতে থাকবে। একপর্যায়ে তাকে জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের আহবান জানানো হলেও সে ওই আহবানে সাড়া দিবে না। মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইকে এমন গুনাহের জন্য লজ্জা দেয়, যা থেকে সে তাওবা করেছে। সে (উপহাসকারী) ওই গুনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। (জামে তিরমিযী : ২৫০৫)

এসব হাদিসের সারমর্ম এটাই যে, কাউকে অপমান করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও উপহাস করা নাজায়েয। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে এর কারণও বলে দিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে,

عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ.

কেননা যাকে (যে-নাকারীকে) উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। (সূরা হুজুরাত : ১১)

কেউ যদি উপহাসে মজা পায়। তাহলে একে উপহাস না বলে ঠাট্টা বলা হবে। যার বিধান বিশদাকারে পেছনে গত হয়েছে। আর কেউ যদি উপহাসে কষ্ট পায় তাহলে তাকে নিয়ে উপহাস করা হারাম। যেমন, কারও কথার মাঝে বা কাজের মাঝে কোনো ভুল বের করে উপহাস করা, কারও অসুন্দর চেহারা নিয়ে উপহাস করা অথবা কারও কোনো চারিত্রিক ত্রুটি নিয়ে উপহাস করা ইত্যাদি। এ জাতীয় বিষয় নিয়ে ঠাট্টা উপহাস করা হারাম।

১২. গোপন তথ্য ফাঁস করা

এটাও হারাম। কারণ এতেও কষ্ট হয় এবং বন্ধুত্বের হক বিনষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

যখন কোনো ব্যক্তি কথা বলার পর চোখ বাঁকা করে তখন এটা আমানত হয়ে যায়। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮৬৮)

হাসান (রা) বলেন, কোনো ভাইয়ের গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়াও খেয়ানতের শামিল।

বর্ণিত আছে, আমীর মুয়াবিয়া (রা) ওলীদ ইবনে ওতবাকে কোনো গোপন খবর দিলেন। তিনি তাঁর পিতা ওতবাকে গিয়ে বললেন, আজ আমীর মুয়াবিয়া (রা) একটি গোপন খবর দিয়েছেন। আমাকে যখন বলেছেন, তখন আপনার নিকট আর গোপন থাকবে কেন? তখন ওতবা বললেন, বিষয়টি আমাকে বলো না। কারণ, যতক্ষণ মানুষ গোপন বিষয় গোপন রাখে, ততক্ষণ তার থাকে, কিন্তু ফাঁস করে দিলে অপরের এখতিয়ারে চলে যায়। ওলীদ বললেন, বাপবেটার মধ্যেও এমন হয় নাকি? তিনি বললেন, বাপবেটার মধ্যে হয় না ঠিক, কিন্তু আমি চাই, গোপন কথা ফাঁস করার অভ্যাস যেন তোমার না হয়। এরপর ওলীদ আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমার পিতা তোমাকে ভুলের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

মোটকথা, গোপন কথা ফাঁস করা খিয়ানত। এতে কারও ক্ষতি হলে হারাম। ক্ষতি না হলেও তা হীন মানসিকতার পরিচায়ক।

১৩. মিথ্যা ওয়াদা

ওয়াদা করার ব্যাপারে জবান আগে থাকে, কিন্তু তা পূর্ণ করার সময় অন্তর গড়িমসি করে। ফলে মিথ্যা ওয়াদা করা হয়ে যায়। এটা পরিষ্কার মুনাফিকীর লক্ষণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। (সূরা মায়েদা : ১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, اَلْعِدَةُ عَطِيَّةٌ ওয়াদা করা দানের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি আরও বলেন, ওয়াদাও এক প্রকার ঋণ।

আল্লাহ তাআলা ইসমাঈল (আ)-এর প্রশংসায় বলেন,

اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ.

নিশ্চয়ই সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। (সূরা মারইয়াম : ৫৪)

বর্ণিত আছে, ইসমাঈল (আ) এক লোকের সাথে কোনো এক স্থানে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। লোকটি তা ভুলে গেলেও ইসমাঈল (আ) তার অপেক্ষায় বাইশ দিন সেখানে অবস্থান করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। আমি কিছুটা দোদুল্যমান ওয়াদা করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ তাআলার নিকট এক তৃতীয়াংশ মুনাফিকী নিয়ে যাবো না। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকেই কন্যা দান করলাম।

আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হামসা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (স)-এর সঙ্গে নবুওয়তের পূর্বে একটি লেনদেন করেছিলাম। তাঁর কিছু পাওনা আমার নিকট অবশিষ্ট ছিল। আমি বললাম, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি সেদিন এবং পরের দিন অঙ্গীকারের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। তৃতীয় দিন এসে তাঁকে সেই জায়গাতেই পেলাম। তিনি বললেন, মিয়া! তুমি বড় বিপদে ফেলে গেলে। এখানে তিন দিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করছি। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৯৬)

ইবরাহিম ইবনে আদহামকে কেউ জিজ্ঞেস করল, যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসবে বলে ওয়াদা করে না আসে, তাহলে তার জন্য কতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? তিনি বললেন, পরবর্তী নামাযের সময় আসা পর্যন্ত।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) প্রত্যেক ওয়াদার সাথে "ইনশাআল্লাহ" বলতেন। এতে ওয়াদা পূর্ণ করা না হলেও কোনো দোষ থাকে না। তবে যদি কেউ সংকল্প করে রাখে যে, পূর্ণ করবে না, তাহলে এরই নাম 'নিফাক'।

আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি অভ্যাস পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক, যদিও সে নামায রোযা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে থাকে। অভ্যাস তিনটি এই– ১. কথা বললে মিথ্যা বলা ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করা এবং ৩. আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করা। (সহিহ বুখারী : ৫৯)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোনো একটি স্বভাব থাকবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। স্বভাবগুলো হলো, কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতারণা করে আর বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি করে। (সহিহ বুখারী : ৩৪)

এটা তারই অবস্থা, যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার নিয়ত রাখে না, অথবা বিনা ওযরে ওয়াদার খেলাফ করে, কিন্তু যে ওয়াদা করার সময় পূর্ণ করার ইচ্ছা রাখে, অতঃপর কোনো ওযরের কারণে পূর্ণ না করে, সে মুনাফিক হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) আবুল হায়সামকে একটি গোলাম দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। এরপর গনিমতের মালে তিনটি গোলাম আসে। দুটি গোলাম বণ্টন করে দেওয়া হলো। একটি রয়ে গেল। আদরের মেয়ে ফাতেমা (রা) এসে বললেন, দেখুন, যাঁতাকল চালাতে চালাতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। এ গোলামটি আমাকে দান করুন, কিন্তু আবুল হায়সামের সাথে কৃত ওয়াদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে পড়ে গেল। তিনি কন্যাকে বললেন, তোমাকে গোলাম দিয়ে দিলে আমার ওয়াদা ভঙ্গ হবে। এরপর তিনি গোলামটি আবুল হায়সামকেই দান করেন।

বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (স) হুনাইন যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি ঠিক বলেছো, যা ইচ্ছা নিয়ে যাও। অতঃপর সে রাখাল সমেত আশিটি ভেড়া পছন্দ করলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে তা প্রদান করে বললেন, তুমি তো ওই বৃদ্ধার তুলনায় খুব সামান্য জিনিসই চেয়েছো, যে হযরত মুসা (আ)-কে হযরত ইউসুফ (আ)-এর হাড়গোড়ের সন্ধান দেওয়ার পর এর প্রতিদান চেয়ে বলেছিল, আমাকে যুবতী বানিয়ে দিন এবং আপনার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করান। বলা হয় যে, লোকেরা ওই ব্যক্তির রাখাল সমেত আশি ভেড়ার তলবকে এতটাই তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করতো যে, এক পর্যায়ে তার এই ঘটনাকে কৃপণতার দৃষ্টান্তরস্বরূপ প্রদান করা হতো। বলা হতো, أَشَحُّ مِنْ صَاحِبِ الثَّمَانِيْنَ وَالرَّاعِنِ-রাখাল সমেত আশি ভেড়ার মালিকের চেয়েও কৃপণ।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ওয়াদা পূরণের নিয়তে কেউ কারও সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর কোনো কারণে তা পূর্ণ করতে না পারলে সেটা ওয়াদা ভঙ্গ নয়।

এই হাদিসটি অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَفِيْ نِيَّتِهٖ اَنْ يَفِيَ فَلَمْ يَجِدْ، فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ.

যদি কেউ তার ভাইয়ের সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নিয়তে ওয়াদাবদ্ধ হয়। অতঃপর কোনো কারণে সেই ওয়াদা পূর্ণ করতে অপারগ হয়, তাহলে তার কোনো গুনাহ নেই। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৯৫)

১৪. মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা শপথ

এটা হারাম এবং মারাত্মক অপরাধ। ইসমাঈল ইবনে আওসাত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর আমি আবু বকর (রা)-কে খুতবায় এ কথা বলতে শুনেছি— আমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে দাঁড়িয়ে হিজরতের প্রথম বছরে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন— এতটুকু বলেই আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। এরপর কান্না থামিয়ে এ হাদিস বর্ণনা করলেন,

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ.

তোমরা অসত্য থেকে বেঁচে থাকো। অসত্য পাপাচারের সঙ্গী, তারা উভয়ে জাহান্নামী। তোমরা সত্যকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। কেননা, সত্য নেকের সাথী। তারা উভয়েই জান্নাতে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৪৯)

আবু উমামা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মিথ্যা নিফাকের একটি দরজা। হাসান বসরী (র) বলেন, জাহের ও বাতেন, কথা ও কাজে ভিন্নতা থাকা নিফাকের আলামত। বস্তুত মিথ্যার উপরই নিফাকের ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সবচেয়ে বড় খেয়ানত হচ্ছে, তোমার ভাইকে এমন একটি কথা বললে যে কথায় সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করছে, কিন্তু তুমি ওই কথায় মিথ্যাবাদী। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৭১)

ইবনে মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মিথ্যা বলা যার অভ্যাসে পরিণত হয় তার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় লেখা হয়। (সহিহ বুখারী : ৬০৯৪)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা পরস্পর একটি বকরি বেচাকেনা করছিলো এবং কসম করছিলো। একজন বলছিলো, আল্লাহর শপথ! আমি এর থেকে কম করবো না, অপরজন বলছিলো, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এর চেয়ে বেশি দিবো না।

অতঃপর দুজনের একজন বকরিটি ক্রয় করল, অতঃপর রাসূল (স) বললেন, দুজনের একজন নিজের উপর গুনাহ ও কাফফারাকে ওয়াজিব করে নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মিথ্যা রিযিক কমিয়ে দেয়।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ব্যবসায়ীরা গুনাহগার হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। তাহলে ব্যবসায়ীরা গুনাহগার হবে কেন? তিনি বললেন, তারা শপথ করে গুনাহগার হয় এবং কিছু বললে মিথ্যা বলে, তিনি আরও বলেন, তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। প্রথম, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দান করে খোঁটা দেয়। দ্বিতীয়, যে মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রি করে। তৃতীয়, যে টাখনুর নীচ পর্যন্ত পাজামা পরিধান করে। (সহিহ মুসলিম : ১০৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কোনো কথা বলে আর ওই কথার মাঝে মাছির ডানা পরিমাণ মিথ্যা বলে, এই মিথ্যা তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত একটি কালো দাগ সৃষ্টি করে। (জামে তিরমিযী : ৩০২০)

আবু যর গিফারী (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলূল্লাহ (স) বলেন, তিন ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, ১. ওই ব্যক্তি যে যুদ্ধের ময়দানে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে এমনকি শহিদ হয়ে যায় বা আল্লাহ তার বাহিনীকে বিজয় দান করেন, ২. ওই ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তা সহ্য করে যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং ৩. ওই ব্যক্তি যে কোনো কাফেলার সাথে সফরে রয়েছে এবং সফর তাদের ক্লান্ত করে দিয়েছে। সবাই থেমে বিশ্রাম করছে কিন্তু সে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছে অতঃপর সাথীদের জাগ্রত করেছে। আর তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ অপছন্দ করেন, ১. অধিক কসমকারী ব্যবসায়ী। ২. অহংকারী ফকির এবং ৩. যে কৃপণ অনুগ্রহ করে খোঁটা দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য যে লোকদের হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। (জামে তিরমিযী : ২৩১৫)

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমাকে বলল, চলুন! আমি তার সাথে চলতে লাগলাম। এরই মাঝে আমি দুই ব্যক্তিকে দেখলাম, তাদের একজন দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন বসে ছিল। দণ্ডায়মান ব্যক্তির হাতে লোহার কীলক যার দ্বারা সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে কঠিনভাবে আঘাত করছে। অতঃপর আমি আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞেস করলাম, এ কী হচ্ছে ওখানে। উত্তরে সে বলল, ওই ব্যক্তি মিথ্যুক, তাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে শাস্তি দেওয়া হবে।

আবদুল্লাহ বিন জারাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম। মুমিন জিনা করে? উত্তরে তিনি বললেন, কখনো হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি মিথ্যা বলে? তিনি উত্তরে বললেন, না। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) এই আয়াত পাঠ করেন,

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ.

আল্লাহর নিদর্শনে যারা অবিশ্বাসী, তারা শুধু মিথ্যাই রচনা করে (সূরা নাহল : ১০৫)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই দুআ পড়তে শুনেছি,

اَللّٰهُم طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَفَرْجِيْ مِنَ الزِّنَا وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ.

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে কপটতা থেকে, লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার থেকে এবং জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র রাখুন।

তিনি আরও বলেছেন,

ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না। এমনকি তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না— ১. জিনাকারী বৃদ্ধ, ২. মিথ্যুক বাদশাহ, ৩. অহংকারী দরিদ্র ।

আবদুল্লাহ বিন আমের (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বাড়িতে আসেন। আমি তখন ছোট ছিলাম বিধায় খেলতে চলে গেলাম।

আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ! এসো তোমাকে একটি জিনিস দিব। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, কী দিবে তাকে? আমার মা বললেন, খেজুর। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যদি তুমি কোনো কিছু না দিতে তাহলে তোমার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় থাকতো। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৯১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ যদি আমাকে কংকর পরিমাণ নিয়ামত দান করেন আমি তা তোমাদের সকলের মাঝে বণ্টন করে দিবো। তোমরা তখন আমাকে কৃপণ, ভীরু ও মিথ্যুক হিসেবে পাবে না। (সহিহ বুখারী : ২৮২১)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তখন ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহের কথা বলবো না? এরপর বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, মিথ্যাও কবিরা গুনাহ। (সহিহ বুখারী : ২৬৫৪)

ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন ফেরেশতারা ওই মিথ্যার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে চলে যায়। (জামে তিরমিযী : ১৯৭২)

আনাস (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা আমার ছয়টি বিষয় মেনে নাও। আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নেব। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ওই ছয়টি বিষয় কী? তিনি বললেন, যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করো না। আমানতের খেয়ানত করো না। দৃষ্টি অবনত রাখো। লজ্জাস্থানের হেফাজত করো। হাত দ্বারা অন্যায় করো না।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় শয়তানের সুরমা, চাটনি এবং সুগন্ধি রয়েছে। তার চাটনি হলো মিথ্যা কথা, সুগন্ধি হলো রাগ আর সুরমা হলো ঘুম।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা আমার সাহাবা ও তাদের পরবর্তী যুগে আগত লোকদের সাথে সদাচরণ করো। কারণ, এরপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে, মানুষ কথায় কথায় কসম করবে এবং সাক্ষ্য চাওয়া ব্যতীতই সাক্ষ্য প্রদান করবে। (জামে তিরমিযী : ২১৬৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে মিথ্যা সংবাদ দেয় সে দুই মিথ্যুকের একজন।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, যে ব্যক্তি আমার থেকে হাদিস বর্ণনা করে কিন্তু সে জানে যে তা সত্য নয়, সে দুই মিথ্যুকের একজন।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করবে পরকালে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) মিথ্যুকের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আয়েশা (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট মিথ্যার বদাভ্যাস সর্বাধিক অপছন্দীয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন কোনো সাহাবির মিথ্যা জেনে নিতেন, তখন সে ব্যক্তির নতুনভাবে তাওবা না করা পর্যন্ত তিনি তার প্রতি মন থেকে মলিনতা দূর করতে পারতেন না।

মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে আমলের ক্ষেত্রে কে সবচেয়ে ভালো? ইরশাদ হলো, 'যার জিহ্বা মিথ্যা বলে না, অন্তর পাপে লিপ্ত হয় না এবং লজ্জাস্থান ব্যভিচার করে না।'

লোকমান (আ) আপন পুত্রকে বললেন, মিথ্যা বলো না, যদিও তা পাখির গোশতের মতো সুস্বাদু মনে হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) সত্যবাদিতার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, চারটি বিষয় যদি তোমার মধ্যে থাকে তাহলে দুনিয়ার কোনো কিছু না পেলেও সমস্যা নেই— ১. সত্যবাদিতা। ২. আমানতদারিতা। ৩. উত্তম চরিত্র। ৪. হালাল খাবার।

মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তাকওয়া অবলম্বনের, সত্যবাদিতার, আমানতদারিতার, অঙ্গীকার পূর্ণ করার, সালাম দেওয়ার এবং নম্রতা অবলম্বন করার।

সাহাবি ও মনীষীদের বাণী

আলী (রা) বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে মিথ্যা বলা। আর নিকৃষ্ট অনুশোচনা হচ্ছে কিয়ামত দিবসের অনুশোচনা।

ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) বলেন, আমি ছোটো বেলা থেকেই মিথ্যা পরিহার করে এসেছি।

ওমর (রা) বলেন, আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিকে উত্তম মনে হয় যার নাম উত্তম। যখন সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তখন সে ব্যক্তিকে ভালো মনে হয়, যার অভ্যাস ভালো। লেনদেন করার পর সে ব্যক্তি ভালো মনে হয়, যে কথায় সাচ্চা এবং ওয়াদায় পাক্কা।

মায়মুন ইবনে আবু শাবিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি কিতাব লেখার জন্য বসলাম। হঠাৎ একটি হরফ আমার লেখা বন্ধ করে দেয়। যদি তা লিখি তাহলে তার মান বেড়ে যাবে। কিন্তু আমি মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবো না। ওই শব্দকে বাদ দেওয়ার পর আমি চিন্তা করছিলাম। ইত্যবসরে ঘরের দিক থেকে আওয়াজ এল,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ.

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে শাশ্বত বাণীর (কালেমার) মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (সূরা ইবরাহিম : ২৭)

ইমাম শাবী (র) বলেন, আমার জানা নেই মিথ্যা ও কৃপণতার মধ্যে কোনটি জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে।

ইবনুস সাম্মাক (র) বলেন, আমার মতে মিথ্যা না বলার কারণে সওয়াব পাওয়া যাবে না, কেননা আমি দুনিয়া প্রাপ্তির আশায় মিথ্যা বলি না।

জনৈক ব্যক্তি খালিদ ইবনে সুবাইহকে জিজ্ঞেস করল, মাত্র একবার মিথ্যা বললেও কি কাউকে মিথ্যাবাদী বলা হবে? তিনি বললেন, নিশ্চয়।

মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি কোনো এক কিতাবে পড়েছি। প্রত্যেক খতিবের বয়ানকে তার আমলের সাথে মিলানো হবে। যদি কথা ও কাজে মিল থাকে তাহলে সে সত্যবাদী। কিন্তু যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে আগুনের তৈরি কাঁচি দিয়ে তার ঠোঁচ চিড়ে ফেলা হবে এরপর তা পুনরায় পূর্বের রূপ ধারণ করবে এবং তার সাথে একই আচরণ করা হবে।

মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন, মানুষের অন্তরে সত্য ও মিথ্যার মাঝে সংঘাত চলতে থাকে। এর একটি অপরটিকে অন্তর থেকে বের করে দেয়।

ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক (র)-এর সাথে কোনো একটি বিষয়ে কথা বলছিলেন। ওলিদ বলল, আপনি মিথ্যা বলছেন। ওমর বললেন, যেদিন থেকে আমি জেনেছি মিথ্যা তার কথকের ক্ষতি করে সেদিন থেকে আমি মিথ্যা বলি না।

যেখানে মিথ্যা বলা হালাল

প্রকাশ থাকে যে, মিথ্যা সত্তাগতভাবে হারাম নয়; বরং হারাম এদিক থেকে যে, এর দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয়। এ ক্ষতির সর্বনিম্ন স্তর হলো প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। সুতরাং যদি কোথাও মূল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার মধ্যে উপকারিতা থাকে, মিথ্যা বলার অনুমতি থাকা উচিত; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন, মিথ্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যের চেয়েও ভালো হয়ে থাকে। যেমন— যদি কোনো ব্যক্তি পালিয়ে তোমার মাধ্যমে কোনো এক ঘরে লুকিয়ে থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তি তরবারি নিয়ে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য খুঁজতে থাকে, এবং তোমাকে জিজ্ঞেস করে, অমুক ব্যক্তি কোথায়? তাহলে এক্ষেত্রে তোমার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব।

সারকথা, যেখানে একটি উৎকৃষ্ট লক্ষ্য মিথ্যা ও সত্য উভয়টি দ্বারা অর্জিত হতে পারে, সেখানে মিথ্যা বলা হারাম। আর যদি কেবল মিথ্যা দ্বারাই সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়, তাহলে লক্ষ্য বৈধ হলে মিথ্যা বলাও বৈধ এবং লক্ষ্য ওয়াজিব হলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব; যেমনটি বর্ণিত উদাহরণ দ্বারা বোঝা যায়। যেখানে পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন মিথ্যা ছাড়া সম্ভব নয়, সেখানে মিথ্যা বলা বৈধ; কিন্তু যথাসম্ভব বৈধ মিথ্যা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় মিথ্যাও মুখে উচ্চারিত হওয়ার অথবা প্রয়োজনের বেশি মিথ্যা বলে ফেলার আশঙ্কা থাকে। এ থেকে বোঝা গেল, মিথ্যা হারাম হলেও, প্রয়োজনে জায়েয হতে পারে।

উম্মে কুলসুম (রা) বর্ণনা করেন, আমি কখনো শুনিনি যে, রাসূলুল্লাহ (স) তিনটি স্থান ব্যতীত কোথাও মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। (১) দু' ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি করতে, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য দূর করতে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ اَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا اَوْ نَمٰى خَيْرًا.

যে দু'ব্যক্তির মাঝে সন্ধি স্থাপনে ভালো কথা বলে এবং ভালো বর্ণনা করে, সে মিথ্যুক নয়। (সহিহ বুখারী : ২৬৯২)

আসমা বিনতে ইয়াযিদ বলেন, প্রত্যেক মিথ্যাই তার কথকের উপর লিখে রাখা হয়, তবে যে দুই মুসলমানের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য মিথ্যা বলে, সে ব্যতীত।

আবু কাহেল (রা) রেওয়ায়েত করেন, দু সাহাবির মধ্যে তর্কাতর্কি হলো। এক পর্যায়ে তারা পরস্পরকে খুন করতে উদ্যত হলো। আমার সঙ্গে তাদের একজনের দেখা হলে বললাম, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে চাও কেন? সে তো তোমার গুণগান করছিল। এরপর অপরজনের সাথেও সাক্ষাৎ হলে এ কথাই বললাম, অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। তারপর আমি ভাবতে লাগলাম, তাদের মাঝে সন্ধি হয়েছে ঠিক, কিন্তু মিথ্যা বলার জন্য আমার কী অবস্থা হবে? তাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, হে আবু কাহেল! পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে, যদিও তা মিথ্যা বলেই হয়।

আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, আমার স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলব? তিনি বললেন, মিথ্যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। সে বলল, আমি তার সাথে ওয়াদা করব? তিনি বললেন, এতে অসুবিধা নেই। (মুআত্তা মালেক : ২ : ৯৮৯)

বর্ণিত আছে, ইবনে আবি আযরা ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বেশি বেশি বিবাহ করতো এবং স্ত্রীদের সাথে খোলা করতো। একথা মানুষের মাঝে চর্চা হতে লাগল। ওমর (রা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তার কাছেও বিষয়টি ভালো মনে হলো না।

ইবনে আবি আযরা যখন জানতে পারল যে, এ সংবাদ ওমরের কাছেও পৌঁছে গেছে তখন যায়েদ ইবনে আরকামের হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল এবং তার সামনে স্ত্রীকে কসম দিয়ে বলতে লাগল, তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো? স্ত্রী বলল কসম দিয়ে বলছেন কেন? সে বারবার কসম দিতে লাগল। তখন স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি। যায়েদ বিন আরকাম এ কথা শুনলেন।

এরপর উভয়ে ওমর (রা)-এর কাছে এলে ইবনে আবি আযরা বলল, আপনারা সবাই আমার ব্যাপারে বলে বেড়াচ্ছেন, আমি আমার স্ত্রীদের উপর জুলুম করি, তাদের সাথে খোলা করি। আপনি যায়েদ ইবনে

আরকামকে জিজ্ঞেস করুন। ওমর (রা) তাকে প্রকৃত ঘটনা জিজ্ঞেস করলে, যায়েদ ঘটনা বর্ণনা করলেন।

এরপর স্ত্রীকে ডাকা হলো। সে ও তার ফুফু ওমর (রা)-এর দরবারে আসল। ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন তুমি তোমার স্বামীকে এমন কথা বলেছো? স্ত্রী বলল, জী আমি বলেছি। এখন আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি। মূল বিষয়টি হচ্ছে আমার স্বামী কসম দিয়ে ওই কথা বলিয়েছেন। আমি মিথ্যা বলার হিম্মত করতে পারিনি, ফলে সত্য বলে দিয়েছি। আমি কি মিথ্যা বলবো? ওমর (রা) বললেন, হ্যাঁ মিথ্যা বলে দিবে। তোমার যদি স্বামীকে পছন্দ না-ই হয় তবুও তা বলে বেড়াবে না। কেননা, ঘরের শান্তি হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্যে। লোকদের উচিত ইসলাম ও ইহসানের ওপর জীবনযাপন করা।

নাওয়াস বিন সামআন কিলাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কী হলো আমি তোমাদের মিথ্যার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখছি, যেভাবে কীটপতঙ্গ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যেকের মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবেই লেখা হয়। তবে কেউ যদি যুদ্ধে মিথ্যা বলে তা ভিন্ন কথা। কেননা যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে কৌশলের জায়গা। এমনিভাবে বিবদমান দুই ব্যক্তির মাঝে সন্ধি স্থাপনের লক্ষ্যে মিথ্যা বললে অথবা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বললে তা লিখা হবে না।

সাওবান (র) বলেন, মিথ্যা পুরোটাই গুনাহ। তবে যে মিথ্যা দ্বারা কোনো মুসলমান ভাইয়ের উপকার করা হয় অথবা তার কোনো ক্ষতি দূর করা হয় তা গুনাহ নয়।

আলী (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো হাদিস বর্ণনা করি তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে মিথ্যা বলা থেকে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। কিন্তু যখন আমরা পরস্পর কথা বলি তখন এটা রণক্ষেত্রের ন্যায়। আর রণক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

মিথ্যা বলার ব্যাপারে উপরিউক্ত তিনটি স্থানের ব্যতিক্রম হুকুম হাদিস থেকে জানা গেল। যদি আরও কোনো স্থান এমন হয়, যেখানে বিশুদ্ধ লক্ষ্য সামনে রেখে মিথ্যা বলা হয়, তবে সেই স্থানও এতে অন্তর্ভুক্ত

হবে। উদারহণত, কোনো ডাকাত ও জালেম যদি কাউকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করে বল, তোর ধনসম্পদ কোথায়? তবে 'ধনসম্পদ নেই' বলা তার জন্য জায়েয।

অথবা যদি কোনো বাদশাহ গ্রেফতার করার পর এমন এক অশ্লীল কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যা আল্লাহ ও সে ছাড়া আর কেউ জানে না। এক্ষেত্রে তার জন্য অস্বীকার করা জায়েয অর্থাৎ, এরূপ বলবে, আমি জিনা করিনি। আমি চুরি করিনি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের কোনো খারাপ কাজ করবে সে যেন তা গোপন রাখে। কারও গুনাহ প্রকাশ করাও একটি গুনাহ। এর দ্বারা বোঝা যায়, নিজের জান-মাল হেফাজতের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয।

অন্যের উপকারার্থে মিথ্যা বলার উদাহরণ হচ্ছে, কেউ অন্যের গোপন বিষয় জানতে চাইলে মিথ্যা বলে দেওয়া যে, আমি জানি না। অথবা মিথ্যা বলে দুইজনের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেওয়া। বা নিজের স্ত্রীদের মাঝে হিকমতের পন্থা অবলম্বন করবে যে, প্রত্যেকের কাছেই প্রকাশ করবে যে, সে তাকে খুব ভালোবাসে।

যদি স্ত্রী এমন জিনিসের কামনা করে যা স্বামীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় তাহলে স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিবে।

কিন্তু যেহেতু মিথ্যা একটি খারাপ বিষয় তাই চিন্তা করতে হবে যে, সত্য বললে যে খারাবি প্রকাশ পাবে তা এবং মিথ্যার খারাবির মাঝে কোনটি বেশি খারাপ। এরপর সে অনুপাতে কথা বলবে। যদি সত্য বললে ক্ষতি কম হয় তাহলে সত্যই বলে দিবে আর যদি সত্য বললে ক্ষতি বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে মিথ্যা বলে দিবে। আর যদি উভয়টির মাঝে সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে সত্যকে প্রাধান্য দিবে। কেননা মিথ্যা প্রয়োজন ও জরুরতের কারণে বৈধ। সুতরাং যদি প্রয়োজন ও জরুরতের গুরুত্বের ব্যাপারে সন্দিহান হয় তাহলে মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকবে। উদ্দেশ্যের স্তরসমূহ অনুধাবন করা জটিল বিধায় মানুষের উচিত মিথ্যা বলা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা। যদি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা বলা হয় তাহলে মিথ্যা পরিহার করাই উচিত। আর যদি অপরের উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত থাকে তাহলে মিথ্যা বলে তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা উচিত।

সাধারণত মানুষ নিজের স্বার্থের কারণেই মিথ্যা বলে থাকে যাতে সম্পদ ও মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং ওই সব বিষয় সহজে পাওয়া যায় যা না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। এমনকি কোনো কোনো মহিলা তার সতীনকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বলে যে, আমাকে তো এই এই অলংকার দিয়েছে, এই দামি পোশাক দিয়েছে, আমাকে এটা দিয়েছে ওটা দিয়েছে। এসব কথা বলা হারাম।

আসমা (রা) বলেন, আমি জনৈক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম, 'আমার একজন সতীন রয়েছে। আমি তার সামনে অনেক কিছু পেয়েছি বলে থাকি। যাতে তাকে তিক্ত করে তুলতে পারি, অথচ এসব মিথ্যা। এখন জানতে চাই এটা কি আমার ক্ষতির কারণ হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

যে ব্যক্তি এমন জিনিস পাওয়ার দাবি করে যা সে পায়নি, সে মিথ্যার চাদরে আবৃত ব্যক্তির ন্যায়। (সহিহ বুখারী : ৫২১৯)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন,

مَنْ تَطَعَّمَ بِمَا لَا يَطْعَمُ وَقَالَ : لِيْ وَلَيْسَ لَهُ وَأُعْطِيْتُ وَلَمْ يُعْطَ ... كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

যে এমন খাবার খাওয়ার দাবি করে যা সে খায়নি এবং সেটাকে নিজের বলে দাবি করে অথচ এটা তার নয়। অথবা বলে আমি ওই জিনিস পেয়েছি অথচ সে পায়নি। এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মিথ্যার চাদরে আবৃত ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত হবে।

এর মধ্যে আলেমের ওই ফতোয়াও অন্তর্ভুক্ত যে ব্যাপারে তার তাহকীক নেই এবং ওই হাদিসও দাখিল যার প্রমাণ নেই। কেননা এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ইলমের বড়াই দেখানো। এজন্য সে 'আমি জানি না' বলতে অসম্মান বোধ করে। তাহকিক ছাড়া কথা বলা, ফতোয়া দেওয়া, হাদিস বর্ণনা করা হারাম।

বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলার হুকুমও এটাই যা মহিলাদের সাথে মিথ্যা বলার হুকুম। বাচ্চাদের যদি মিথ্যা ওয়াদা ও মিথ্যা ভয় ব্যতীত পড়ানো না

যায় তাহলে মিথ্যা বলা জায়েয। আমরা পূর্বে একটি হাদিসে বলেছিলাম যে, এ ধরনের কথাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। ওই হাদিস আপন জায়গায় সঠিক আর আমাদের ব্যাখ্যাও সঠিক। কেননা জায়েয মিথ্যাও আমলনামায় লেখা হবে এবং এর হিসাবও হবে যে, তার মিথ্যা বলা সঠিক ছিল কি না। উদ্দেশ্য যদি হয় বাচ্চাকে সংশোধন করা তাহলে বৈধ। কিন্তু এক্ষেত্রে ধোঁকা এবং প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ বেশি হয়। বাহ্যত মনে হয় সংশোধনের জন্যই বলেছে কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে ভিন্ন।

মিথ্যা বলার পূর্বে ভেবে দেখবে যে, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য বলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না মিথ্যা বলা। বস্তুত এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। অনেক সময় মানুষের অল্প বিবেচনা তা নির্ণয় করতে পারে না যে, কোনটি উত্তম। এজন্য মিথ্যা পরিহার করাই উত্তম। তবে যেখানে মিথ্যা বলা ওয়াজিব যেমন মিথ্যা না বললে প্রাণ চলে যাবে সেখানে মিথ্যা বলার অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ফযিলতের ক্ষেত্রে হাদিস বানানো জায়েয। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল। (সহিহ বুখারী : ১১০)

এই হাদিসের উপর আমল না করার কোনো কারণ নেই। তারগিব ও তারহিব-এর জন্য হাদিস বানানোর প্রয়োজন নেই। অসংখ্য আয়াত ও হাদিস এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

কেউ কেউ বলেন, ওইসব আয়াত ও হাদিস পুরনো হয়ে যাওয়ায় মানুষের অন্তরে সেগুলো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই নতুন নতুন বিষয় মানুষকে শোনানোর প্রয়োজন হয়। এজন্য হাদিস বানাতে হবে। এটা নিরেট ধ্বংসাত্মক একটি কথা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যকে মুসিবত ও গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজে হাদিস বানিয়ে মুসিবতের মধ্যে নিপতিত হওয়া কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। শরিয়তও তা সমর্থন করে না। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে এই ভ্রান্ত ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে রক্ষা করুন।

ইঙ্গিতেও মিথ্যা বলা ঠিক নয়

পূর্ববর্তীদের উক্তি হচ্ছে, ইঙ্গিতে মিথ্যা বললে তা মিথ্যা হয় না।

ওমর (রা) বলেন, যদি কেউ ইঙ্গিতে কোনো মিথ্যা বলে তবে সে মিথ্যা থেকে বেচেঁ যায়। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য, যখন কেউ মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হয়, তখন যেন ইঙ্গিতে মিথ্যা বলে দেয়। নতুবা বিনা বাধ্যবাধকতায় মিথ্যা বলা প্রকাশ্যেও জায়েয নয়– ইঙ্গিতেও নয়। ইঙ্গিতে মিথ্যা বলার অর্থ হচ্ছে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বলা, যার এক অর্থ বক্তার উদ্দেশ্য হয় এবং শ্রোতা অন্য অর্থ বুঝে। যেমন বর্ণিত আছে, একবার মুতাররিফ যিয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে বলল, এতোদিন পরে? মুতাররিফ (র) অসুস্থ ছিলেন বলে অজুহাত পেশ করে বললেন, আপনার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি আমার পার্শ্ব উঠাতে পারিনি তবে আল্লাহ যখন চেয়েছেন।

ইবরাহিম (র) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি তোমার নাম নিয়ে কোনো মিথ্যা বলে আর তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না চাও তাহলে বলো,

إِنَّ اللهَ لَيَعْلَمُ مَا قُلْتُ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ.

এ বাক্যটি দুটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে আল্লাহ জানেন, আমি যা কিছু এই ব্যাপারে বলেছি। বা আল্লাহ জানেন, এ ব্যাপারে কিছুই করিনি। আরবি বাক্যে ما হরফটি শ্রোতার নিকট না বোধক অর্থে মনে হবে আর তোমার কাছে তা ইবহাম বা অস্পষ্ট অর্থে।

মুআয ইবনে জাবাল (রা) ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে এক জায়গার গভর্নর ছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর পত্নী তাঁকে বলল, অন্য গভর্নররা যেমন বাড়িতে এলে কিছু নিয়ে আসে, আপনিও তেমন কিছু এনেছেন কি? তিনি বললেন, না। কারণ আমার সাথে একজন গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল। এ কথা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলা, কিন্তু তাঁর পত্নী বুঝল, সম্ভবত ওমর (রা) তাঁর পেছনে কোনো গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন। তাই বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। আর ওমর (রা) কি না আপনার পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। মহিলাদের

মধ্যে এ বিষয়টির খুব চর্চা হলো। অবশেষে ওমরের কাছেও এই অভিযোগ পৌঁছল। তিনি মুআযকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কবে তোমার পেছনে গুপ্তচর প্রেরণ করলাম? তিনি বললেন, আমি একথা তো বলিনি যে, আপনি গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন। আমি কেবল বলেছিলাম, আমার সাথে গুপ্তচর ছিল। পত্নীর আবদারের সামনে এছাড়া আমার কোনো ওযর ছিল না। ওমর (রা) হাসলেন এবং তাঁকে কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বললেন নাও, এ দিয়ে পত্নীকে খুশি করো।

ইবরাহিম নাখয়ী (র) একথা তার মেয়েকে বলতেন না, আমি তোমার জন্য মিষ্টান্ন কিনে আনবো বরং বলতেন, তুমি কী মনে করো, যদি আমি তোমার জন্য মিষ্টান্ন কিনে আনবো? কেননা অনেক সময় তার কাছে মিষ্টান্ন কেনার অর্থ থাকতো না। এমনিভাবে যখন তিনি বাড়ি থেকে বের হতে চাইতেন না কিন্তু ওই সময় কেউ তাকে ডাকছে তখন খাদেমকে বলে দিতেন যাও বলে দাও, মসজিদে গিয়ে খুঁজুন।

ইমাম শাবী (র)-কে যদি ডাকা হতো কিন্তু তখন তিনি বাড়ি থেকে বের হতে চাইতেন না তাহলে খাদেমকে বলতেন, এই গোলাকার বৃত্তে হাত রেখে বলবে, তিনি এখানে নেই।

মোটকথা, প্রয়োজনের সময় ইঙ্গিতে মিথ্যা বলা যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে এটা করা উচিত নয়। কেননা, এটা একটা কৌশল। এতে প্রতিপক্ষ বাস্তবের বিপরীত বুঝে। সুতরাং তা মাকরূহ। আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা বলেন, আমি আমার পিতার সাথে ওমর ইবনে আবদুল আযিযের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন আমার পরিধানে ছিল উৎকৃষ্ট দামি পোশাক। আমি সেখান থেকে বের হলে তখন আমার উৎকৃষ্ট পোশাক দেখে লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনিন তোমাকে এই পোশাক দিয়েছেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। এতে আমার পিতা আমাকে শাসিয়ে বললেন, খবরদার, মিথ্যা কথা বলো না। আবদুল্লাহর এ বাক্যটি মিথ্যা ছিল না, কিন্তু সাধারণত শাসনকর্তার জন্য ওয়াদা কোনো পুরস্কারের বিনিময়ে হয়ে থাকে বিধায় লোকেরা এ থেকে এটাই বুঝে থাকবে যে, খলিফা দান করেছেন। এতে যেন একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথার উপর তাদেরকে রেখে যাওয়া হয়। তাই তিনি এ দুআ করতে নিষেধ করলেন।

হ্যাঁ ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলা জায়েয, যেমন কাউকে আনন্দ প্রদানের জন্য। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার এক মহিলাকে বললেন, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না। আরেকজনকে বলেছিলেন, তোমার স্বামীর চোখে সাদা রয়েছে। আরেকজনকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে উটের বাচ্চার উপর আরোহণ করাবো।

স্পষ্ট মিথ্যা যেমনটি নুআইমান আল আনসারী ওসমান (রা)-এর সাথে অন্ধের ঘটনায় করেছিলেন। তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে ওসমান (রা)-এর সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে বলেছিলেন, তিনি নুআইমান আনসারি। অথবা যেমন মানুষ নির্বোধদের সাথে ঠাট্টা করে বলে, অমুক মেয়ে তোমাকে বিবাহ করতে চায়। এটা তো মিথ্যা। তবে এর দ্বারা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য না হতে হবে। এর কথককে ফাসেক বলা যাবে না। তবে এতে তার ঈমানের কিছু ক্ষতি তো হয়েই থাকে।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার ভাইয়ের জন্য ওই জিনিস পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য করে যাকে এবং হাসি মজার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকবে।

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মানুষ অপরকে হাসানোর জন্য এমন কথা বলে যার দ্বারা সে জাহান্নামের অতলে চলে যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য অপর মুসলমানের গীবত অথবা অন্তরে কষ্ট দেওয়া, শুধু মজা নয়।

আরেকটি মিথ্যা আছে, যার কারণে কেউ ফাসেক হয় না। তা হচ্ছে, অভ্যাসগতভাবে অতিরঞ্জিত বলা; যেমন অনেকে বলে, তোমাকে এটা করতে একশ' বার নিষেধ করেছি। এতে সংখ্যা বোঝানো উদ্দেশ্য হয় না; বরং অতিরঞ্জন সহকারে আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য, কিন্তু যে জিহ্বা অতিরঞ্জিত কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে মিথ্যার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়।

আরেকটি মিথ্যার অভ্যাস মানুষের মধ্যে আছে। তা হচ্ছে, যখন কাউকে বলা হয়– এসো, খানা খাও। তখন সে জওয়াব দেয়, আমার ক্ষুধা নেই। কোনো ভালো উদ্দেশ্য এর সাথে জড়িত না থাকলে এটাও মিথ্যা ও হারাম। আসমা বিনতে ওমায়েস (রা) বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা)-এর বাসররাতে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং আমিই তাকে সাজিয়ে ছিলাম। আমার সাথে আরও কয়েকজন মহিলা ছিল। আমরা যখন

আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে গেলাম তখন তার গৃহে এক পেয়ালা দুধ ছাড়া কিছুই ছিল না। তা থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন এবং বাকিটুকু আয়েশা (রা)-কে দিলেন। লজ্জায় তিনি হাত বাড়ালেন না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত সরিয়ে দিয়ো না, নিয়ে নাও। তিনি লজ্জাভরেই তা নিলেন এবং পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার সঙ্গিনীদেরকে দিয়ে দাও। মহিলারা আরজ করল, আমাদের ক্ষুধা নেই। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, পেটে ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করো না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! যদি কোনো খাবার আমাদের খেতে মনে চায় এবং আমরা বলে দেই, ক্ষুধা নেই, তবে এটাও কি মিথ্যার মধ্যে গণ্য হবে? তিনি বললেন, মিথ্যা তো মিথ্যাই। অল্প হলে অল্পই লেখা হয়।

মুত্তাকিরা এ ধরনের মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকতেন। লাইছ ইবনে সাদ (র) বলেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা)-এর চোখে পিচুটি জমতো। তাকে বলা হলো, আপনি যদি পিচুটি মুছতেন ভালো হতো। তিনি বললেন, তাহলে ডাক্তারের সাথে কৃত ওয়াদার কী হবে? আমি তাকে বলেছি। হাত দিয়ে চোখ স্পর্শ করবো না।

এটা হচ্ছে পরহেযগারদের সাধনা। আর যে এই সাধনা ত্যাগ করবে সে তার অজান্তে সে মিথ্যার মধ্যে নিপতিত হয়ে যাবে।

জাওয়াব তাইমি বলেন, রাবি ইবনে খুছাইমের বোন তার ভাতিজাকে দেখতে এসে জিজ্ঞেস করল, পুত্র আমার! তোমার অবস্থা এখন কেমন? রাবি উঠে বসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে দুধ পান করিয়েছো? সে বলল না, রাবি বললেন, তাহলে তোমার ছেলে কীভাবে হলো? তোমার তো ভাতিজা বলা উচিত ছিল।

মানুষের অভ্যাস হলো, সে যে বিষয়ে জানে না সে ব্যাপারে বলে আল্লাহ জানেন। ঈসা (আ) বলেন, এটা বড় গুনাহ। কিছু লোক স্বপ্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْفِرْيَةِ اَنْ يَّدَّعِىَ الرَّجُلُ إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ اَوْ يَرٰى فِىْ عَيْنَيْهِ فِى الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَ اَوْ يَقُوْلُ عَلَىَّ مَالَمْ أَقُلْ.

বড় গুনাহ হচ্ছে মানুষ নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কারও দিকে নিজেকে সম্বোধিত করা, যে স্বপ্ন সে দেখেনি তা দেখার ভান করা। আর আমি যা বলিনি তা আমার নামে বলে বেড়ানো।

অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا.

যে ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাপারে মিথ্যা বলবে কিয়ামতের দিন তাকে দুটি যবের দানায় গিঁট দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনো পারবে না। (সহিহ বুখারী : ৭০০২)

১৫. গীবত

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে গীবতের নিন্দা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যারা গীবত করে তারা যেন মৃতের গোশত খায়। বলা হয়েছে,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটা ঘৃণ্যই মনে কর। (সূরা হুজুরাত : ১২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

এক মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও ইজ্জত সম্মান সবটুকুই অপর মুসলমানের ওপর হারাম। (সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪)

গীবত হচ্ছে কারও সম্মানে আঘাত করা। নবীজি (স) রক্তের সাথে তাকে একত্র করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, গীবত করো না। আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকো।

জাবির ও আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا اِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَزْنِيْ وَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ.

গীবত করা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। কেননা, গীবত জিনার চেয়েও নিকৃষ্টতম। জিনা করে মানুষ তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুল করে নেন, কিন্তু গীবতকারীকে মাফ করা হয় না, যতক্ষণ যার গীবত করা হয় সে মাফ না করে।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মেরাজের রাতে আমি এমন লোকদের কাছেও গিয়েছি, যারা নিজেদের মুখমণ্ডল নখ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা অন্যের গীবত করতো এবং তাদের ইজ্জত সম্মান নিয়ে কথাবার্তা বলত।

সুলাইম বিন জাবের (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমার উপকারে আসবে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না চাই তা নিজের বালতি দ্বারা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানি দেওয়া হোক না কেন। ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করবে। তার অনুপস্থিতিতে গীবত করবে না।

বারা ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) এত উঁচু আওয়াজে ভাষণ দিলেন যে, বাড়ির মহিলারাও তা শুনতে পেল। তিনি বললেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيْهِ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ.

হে ওই সকল লোক যারা মুখে ঈমান এনেছো, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করোনি। তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষের পিছে লেগে থেকো না। যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের দোষের পিছনে পড়বে আল্লাহ তার দোষের পিছনে পড়বেন। আর আল্লাহ যার দোষের পিছনে পড়বেন তাকে ঘরের ভিতরে লাঞ্ছনায় ফেলবেন। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮৮০)

মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা এ মর্মে ওহি পাঠালেন— যে ব্যক্তি গীবত থেকে তাওবা করে মারা যাবে, সে সবার শেষে বেহেশতে যাবে। আর যে কখনোই গীবত করবে না সে সবার আগে বেহেশতে যাবে।

আনাস (রা) বলেন, একদিন নবী কারীম (স) রোযার আদেশ দিয়ে বললেন, আমি যে পর্যন্ত অনুমতি না দেই কেউ ইফতার করবে না। সাহাবায়ে কেরাম রোযা রাখলেন। সন্ধ্যা হলে এক একজন এসে ইফতারের অনুমতি নিতে লাগল। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী! দু'জন মহিলাও রোযা রেখেছিল। আপনি অনুমতি দিলে তারাও ইফতার করতো। রাসূলুল্লাহ (স) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে পুনরায় একই কথা বললো এবং রাসূলুল্লাহ (স)-ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে তৃতীয় বার নিবেদন করার পর তিনি বললেন, তারা রোযা রাখেনি। যারা সারাদিন মানুষের গোশত ভক্ষণ করে, তাদের আবার কীসের রোযা? তুমি গিয়ে তাদেরকে বলো, তোমরা রোযা রেখে থাকলে বমি করো, সে মহিলাদ্বয়কে এ নির্দেশ শুনিয়ে দিল। তারা বমি করলে প্রত্যেকের মুখ দিয়ে জমাট রক্ত নির্গত হলো। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যার কব্জায় আমার প্রাণ, যদি এ জমাট গোশতপিন্ড তাদের পেটে থেকে যেত তবে জাহান্নাম তাদেরকে খেয়ে ফেলতো।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, যখন তিনি তার থেকে বিমুখ হলেন। তখন সে আবার এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! তারা উভয়ে মারা গেছে অথবা মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। নবী কারীম (স) বললেন, তাদেরকে নিয়ে এসো। তারা এলে তিনি একটি বড় পাত্র আনার আদেশ দিলেন। উভয়ের একজনকে বললেন, বমি করো। সে পুঁজ, রক্ত বমি করল এমনকি পাত্র ভরে গেল এরপর অপরজনকে বলা হলো, তুমিও বমি করো, সেও পুঁজ ও রক্ত বমি করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এই দুই মহিলা আল্লাহ তাদের জন্য যা হালাল করেছেন তার থেকে রোযা রেখেছে আর ইফতার করেছে এমন জিনিস দ্বারা যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তারা একজন আরেকজনের পাশে বসেছিল এবং মানুষের গোশত খাচ্ছিল। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৪৩১)

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন রিবা তথা সুদ নিয়ে ভাষণ দিলেন এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, আল্লাহর কাছে সুদের এক দিরহাম ছত্রিশবার যেনা করার চেয়েও মারাত্মক। সবচেয়ে দামি হচ্ছে মুসলমানের মর্যাদা।

জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একবার এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন আমিও তার সাথে ছিলাম। দুটি কবর দেখে বললেন, এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে। এর কারণ, তাদের একজন গীবত করে বেড়াতো আর আরেকজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকতো না। এরপর কাঁচা খেজুরের ডাল আনতে বললেন এবং ভেঙ্গে করব দুটিতে পুঁতে দিতে বললেন যাতে করে তাদের আযাব হালকা হয়। কেননা, তা যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ আযাব হালকা হতে থাকবে। (সহিহ বুখারী : ২১৬)

বর্ণিত আছে, মাআয়েয আসলামী (রা)-কে যখন যেনার শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল তখন একলোক তার সাথীকে বলল, তাকে কুকুরের ন্যায় মেরে ফেলা হয়েছে। ফেরার পথে রাসূল (স) রাস্তায় একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ওই দুইজনকে বললেন, এর গোশত খেয়ে নাও। তারা বলল, এর গোশত খাব? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মাআয়েযের ব্যাপারে তোমরা যে কথা বলেছো তা এই মৃতদেহের চেয়েও খারাপ। (মুসনাদে তয়ালিসি : ২৪৭৩)

সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর হাসি মুখে সাক্ষাৎ করতেন, একে অপরের গীবত করতেন না। এই আমলকে উত্তম আমল মনে করতেন। আর এর বিপরীত করাকে মুনাফিকদের আমল মনে করতেন।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে দুনিয়াতে তার ভাইয়ের (গীবত করে) গোশত খাবে। পরকালে তার সামনে তার গোশত পেশ করে বলা হবে, তুমি তা জীবিত খেতে এখন মৃত খাও। এরপর সে খাবে এবং চিৎকার করতে থাকবে। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৪২৮)

বর্ণিত আছে, দুই ব্যক্তি মসজিদের দরজায় বসে ছিল। তখন এক মুখান্নাস (হিজড়া) যাচ্ছিল। তারা বলল তার মাঝে এখনো কিছু মেয়েলি স্বভাব রয়ে গেছে। এরপর জামাত দাঁড়িয়ে গেলে তারা নামাযে শরিক হয়ে যায়। নামাযে এই চিন্তা আসে যে, মুখান্নাসের ব্যাপারে এরূপ বলা উচিত হয়নি। নামায শেষ করে তারা আতা বিন আবি রাবাহকে বিষয়টি বললে তিনি বললেন, তোমরা অযু করে আবার নামায পড়ে নাও। আর যদি রোযা রেখে থাকো তাহলে তার কাযাও আদায় করে নিবে।

মুজাহিদ (র)-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - هُمَزَةٌ হচ্ছে মানুষের ভর্ৎসনাকারী আর لُمَزَةٌ হচ্ছে যে মানুষের গোশত ভক্ষণ করে। (সূরা হুমাযাহ : ১)

কাতাদা (র) বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, কবরে আযাবের তিনটি কারণ রয়েছে। এক. গীবত, দুই. পেশাব, এবং তিন. চোগলখোরী।

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! গীবত মানুষের দীনের ক্ষেত্রে এতো প্রভাব বিস্তার করে যে, ক্যান্সারও এতো দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

কেউ কেউ বলেছেন, আমরা সালাফদের পেয়েছি যে, তারা নামায, রোযাকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং তারা মানুষের সম্মানহানি থেকে বিরত থাকাকে ইবাদত মনে করতেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন তুমি তোমার সাথির দোষ উল্লেখ করার ইচ্ছা করো তখন প্রথমে নিজের দোষ উল্লেখ করো।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা অপর ভাইয়ের চোখে ময়লা দেখতে পাও, কিন্তু নিজের অন্তরের চোখের ময়লা দেখতে পাও না।

হাসান বসরী (র) বলতেন, হে আদম সন্তান তুমি ঈমানের হাকিকতে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না তোমার মাঝে বিদ্যমান দোষ মানুষের মাঝে খোঁজা বাদ দিবে। এমনকি যদি তুমি সংশোধনের ইচ্ছায় এমনটি করে থাকো তাহলে প্রথমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো। যখন তুমি এরূপ করবে তখন তুমি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে।

মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন, ঈসা (আ) তাঁর সহচরদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একটি মৃত কুকুর দেখতে পেলেন। সহচরগণ বলল, কী দুর্গন্ধ! ঈসা (আ) বললেন, তার দাতগুলো কত সুন্দর! এর দ্বারা তিনি গীবত না করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তাদের সতর্ক করে বললেন, আল্লাহর মাখলুকের ভালো আলোচনা করা উচিত।

আলী ইবনে হুসাইন (রা) এক ব্যক্তিকে গীবত করতে শুনে বললেন, তোমার গীবত থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, যারা চালচলনে কুকুরের ন্যায়, তাদের খাবার হচ্ছে গীবত।

ওমর (রা) বলেন, তোমরা আল্লাহর যিকির করো, কেননা তা শেফা। আর তোমাদের মানুষের আলোচনা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক, কারণ তা একটি ব্যাধি।

গীবত কাকে বলে

গীবত বলা হয় অপরের এমন আলোচনা করা— যা শুনলে সে খারাপ মনে করে। এ আলোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি, বংশগত ত্রুটি, চারিত্রিক ত্রুটি বা ধর্ম, কর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়ার দোষ সম্পর্কিত হলেও গীবত।

আর শরীরের দোষ, যেমন তুমি আলোচনা করলে যে, সে দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী তার দৃষ্টি বাঁকা বা টেরা, টাক, কালো ইত্যাদি। এমন সব ধরনের বিষয় যা সে অপছন্দ করে।

বংশের দোষ, যেমন তার পিতা নাপিত, হিন্দু, ফাসেক, মুচি, মেথর অথবা এমন কিছু যা সে অপছন্দ করবে।

চরিত্রের দোষ, যেমন তার চরিত্র জঘন্য, সে কৃপণ, অহংকারী, রিয়াকারী, বিদ্বেষী, রাগী, ভীরু, অক্ষম, দুর্বল চিত্তের অধিকারী, হটকারী ইত্যাদি।

দীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন বলল চোর, মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, খেয়ানতকারী, জালেম, নামায ও যাকাতে অলসতাকারী, সে ভালোভাবে রুকু সেজদা করে না। নাপাক থেকে বেঁচে থাকে না। পিতামাতার অবাধ্য, যাকাত যথাস্থানে দেয় না। রোযা থাকাবস্থায় পাপাচার থেকে বিরত থাকে না।

দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, যেমন, সে বেআদব নিজের ওপর অন্যের হক আছে মনে করে না, কিন্তু অন্যের ওপর নিজের হক আছে মনে করে। বাচাল, পেটুক, বেশি ঘুমায়, যথাস্থানে বসে না ইত্যাদি।

আর কাপড়ের ক্ষেত্রে যেমন, বড় আস্তিনওয়ালা, ময়লা কাপড় পরিধানকারী, লম্বা আঁচলওয়ালি।

অবশ্য কারও কারও বক্তব্য হচ্ছে, কারও দীনদারি সম্পর্কে আলোচনা করা হলে সেটা গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, এতে আল্লাহ তাআলা যা মন্দ বলেছেন, তার নিন্দা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেমন তারা বলে— রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মুখে যখন জনৈকা মহিলার আলোচনা করা হয় যে, সে প্রচুর নামায রোযা করে, তবে প্রতিবেশীদেরকে জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়। তখন তিনি বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। এ থেকে বোঝা যায়, এ ধরনের সমালোচনা নিষিদ্ধ হলে রাসূলুল্লাহ (স) অবশ্যই নিষেধ করে দিতেন যে,

এ ধরনের আলোচনা করো না। কিন্তু আমরা বলি, এ বক্তব্য ও দলিল ঠিক নয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রা) যে আলোচনা করতেন, তাতে তাদের কাউকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য থাকতো না; বরং লক্ষ্য থাকতো মাসআলার বাস্তবতা জেনে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিস ব্যতীত অন্য কোথাও এর প্রয়োজন ছিল না। তবে কথা হচ্ছে এসব বিষয়ও যে অন্য স্থানে গীবতের অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) গীবতের সংজ্ঞা এরকমই বর্ণনা করেছেন। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। সাহাবায়ে কেরাম (রা) নিবেদন করলেন, যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়, তা যদি তার মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে বিষয় তার মধ্যে থাকলেই তো গীবত। না থাকলে তা আরও বড় অপরাধ। অর্থাৎ, অপবাদ হবে।

মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির আলোচনা হচ্ছিল। তখন তারা বলল তার অক্ষমতা কী? রাসুলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা তোমার ভাইয়ের গীবত করেছো। তারা বলল, আমরা তো তাই বলেছি যা তার মধ্যে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ তার মধ্যে আছে বলেই তার অনুপস্থিতিতে তোমাদের একথা বলা গীবত হয়েছে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তাকে অপবাদ দিলে।

আয়েশা (রা) জনৈকা মহিলা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, সে বেঁটে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তার গীবত করেছ। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৭৫)

হাসান বসরী (র) বলেন, অপরের সমালোচনা তিনভাবে হয়ে থাকে, গীবত, অপবাদ ও মিথ্যা রটনার মাধ্যমে, সব কিছুর নিন্দা কুরআনে রয়েছে। গীবত হচ্ছে যা তার মধ্যে রয়েছে তা বলা, অপবাদ হচ্ছে যা তার মধ্যে নেই তা বলা আর মিথ্যা রটানো হচ্ছে যা তোমার কাছে এসেছে তা রটানো।

ইবনে সিরীন (র) এক ব্যক্তির আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, ওই ব্যক্তি কালো। অতঃপর সাথে সাথে বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ! আমার মনে হয় আমি তার গীবত করেছি।

ইবনে সিরীন (র) ইবরাহিম নাখয়ী (র)-এর আলোচনা করলেন তখন তার হাত চোখে রাখলেন এবং মুখে বললেন না টেরা।

আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা কেউ কারও গীবত করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক মহিলা সম্পর্কে বলেছিলাম, সে লম্বা আঁচলওয়ালি। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, বমি করে ফেলে দাও, বমি করে ফেলে দাও। অতঃপর আমি এক টুকরা গোশত বমি করলাম।

গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয়

জানা উচিত, গীবত মুখে বলার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যে পন্থায় কেউ অপরের দোষ জেনে নিতে পারে, তা-ই গীবতের অন্তর্ভুক্ত, চাই তা ইঙ্গিতে অথবা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের মাধ্যমেই হোক। আয়েশা (রা) বলেন, একবার এক মহিলা আগমন করল। সে যখন চলে গেল, তখন আমি হাতে ইশারা করে প্রকাশ করলাম, সে বেঁটে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তার গীবত করেছ। যদি কেউ খোঁড়া ব্যক্তির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ করে, তবে এটাও গীবত; বরং গীবতের চেয়েও বেশি। কেননা, এতে আসল আকারের চেয়ে বাড়িয়ে দেখানো হয়। যদি কোনো লেখক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু লেখে কিংবা তার কোনো কথা পুস্তকে উদ্ধৃত করে, তবে এটাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোনো কারণ অথবা ওযর লেখে দিলে গীবত হবে না। নাম নির্দিষ্ট না করে যদি 'কিছু লোকে বলে' লেখা হয়, তবে গীবত হবে না। যদি বলা হয়, 'যার সাথে আজ দেখা হয়েছিল' অথবা 'যে আমার কাছে এসেছিল' তবে গীবত হবে। কেননা, সম্বোধিত ব্যক্তি এতেই লোকটিকে চিনে নেবে, কিন্তু নির্দিষ্ট হয় না, এমনভাবে বললে গীবত হবে না। যেমন– রাসূলুল্লাহ (স) যখন কারও কাজ খারাপ মনে করতেন, তখন এভাবে বলতেন, মানুষের কী হলো, তারা এমন এমন কাজ করে?

সবচেয়ে খারাপ গীবত হচ্ছে, ওলামায়ে কেরামের গীবত। কেননা তারা সাধু সেজে নিজেদের মাকসাদ প্রকাশ করে। আর মানুষ মনে করে সে গীবত করছে না। অথচ সে অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন। তার জানা নেই সে এক সময়ে দুই গুনাহ করছে, ১. গীবত ও ২. রিয়া। সুতরাং যখন তার সামনে কোনো ব্যক্তির আলোচনা হয় সে তখন বলে আল্লাহর শোকর যে,

তিনি আমাদের বাদশাহের দরবারে আসা যাওয়ার পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রেখেছেন অথবা বলে, দুনিয়া তালাশ করে লাঞ্ছনার পিছনে পড়া থেকে হেফাজত করেছেন। অথবা দুআয় বলে, হে আল্লাহ! আমাদের নির্লজ্জতা ও অসম্মানি থেকে রক্ষা করুন! এর দ্বারা উদ্দেশ্য অপরের দোষ প্রকাশ করা। এজন্য কখনো শোকরের শব্দ ব্যবহার করে আবার কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করে, কিন্তু দুআ বা শোকর কোনোটিই তার উদ্দেশ্য থাকে না।

কখনো এমন ব্যক্তির প্রশংসা করে যার গীবত করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন, অমুক ব্যক্তি কতইনা ভালো! অমুক অনেক ইবাদত করে তবে তার মধ্যে একটি খারাপ অভ্যাস রয়েছে, এমনকি আমাদের মধ্যেও রয়েছে, তা হচ্ছে ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির গুণ। লক্ষ করুন, বাহ্যত একথার মধ্যে নিজের নিন্দা রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে অপরের দোষ বলা। কিন্তু এমন পন্থা অবলম্বন করছে যে শ্রোতা বক্তার ইখলাছ ও নিজেকে ছোট মনে করার বিষয় বোঝে, এবং তাকে বুযুর্গ মনে করে। বাস্তবে এই বক্তা তিনটি গুনাহে লিপ্ত ১. গীবত, ২. রিয়া ও ৩. আত্মপ্রশংসা।

অথচ নিজেকে অনেক বড় মুত্তাকি মনে করছে। শয়তান এভাবেই মূর্খদের নিয়ে খেলা করে, যখন তারা ইলম ব্যতীত ইবাদতে লিপ্ত হয়। শয়তান তার চক্রান্ত দ্বারা তাদের আমল বরবাদ করে দেয়। তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করে এবং লাঞ্ছিত করে।

অনেক সময় যখন মজলিসের লোকেরা কারও দোষ শুনতে চায় না তখন বলে উঠে, সোবহানাল্লাহ! কী অবাক কান্ড। এখানে আল্লাহর নাম সম্মান ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য নয়; বরং নিজের বাতেনী খারাবি প্রকাশ করার জন্য বলে থাকে। কখনো গীবত করার জন্য এরূপ করে থাকে যে, আমি আমার বন্ধুর এই অবস্থার কারণে খুব পেরেশান। আল্লাহ তাকে শান্তি দান করুন! এই দুআ ও পেরেশান হওয়া তার উপর সহানুভূতি দেখানোর জন্য নয়; বরং শুধু নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। যদি এটাই উদ্দেশ্য হতো তাহলে নামাযের পরে একা একা দুআ করতো। মজলিসে এভাবে করতো না।

এমনিভাবে বলে থাকে হায়! বেচারা এতো বড় বিপদে আছে, আল্লাহ তাকে ও আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন! এসব বাক্য বাহ্যত দুআ

বোঝাচ্ছে কিন্তু তার অন্তরের খারাবি ও তার নিকৃষ্ট ইচ্ছা আল্লাহ তো জানেন। কিন্তু এই ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে জানে না যে, ওই ব্যক্তির চেয়েও সে আরও বড় বিপদে আছে।

গীবত শোনার পর আশ্চর্যান্বিত হওয়াও গীবত। কেননা, আশ্চর্য হলে গীবতকারী আনন্দিত হয় এবং আরও বেশি বলতে অনুপ্রাণিত হয়। এ পন্থায় যেন তার কাছ থেকে গীবত বের করছে। যেমন বলবে, আশ্চর্য! আমি ধারণা করতে পারি না এরূপ হবে অথবা এ পর্যন্ত তার ব্যাপারে কল্যাণকর বিষয়ই ধারণা করেছি বা আমি তার থেকে এর ভিন্নটা প্রত্যাশা করেছি, আল্লাহ এই মুসিবত থেকে আমাদের হেফাজত করুন। এসব কথা গীবতকারীর সত্যায়ন আর গীবতের সত্যায়নও গীবত। বরং চুপচাপ শ্রবণ করাও গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসে আছে, اَلْمُسْتَمِعُ اَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ শ্রোতাও গীবতকারীদের একজন।

বর্ণিত আছে, আবু বকর (রা) ও ওমর (রা) একজন আরেকজনকে বলেছিলেন, অমুক ব্যক্তি বেশি ঘুমায়। এরপর তারা রুটি খাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে তরকারি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা তো তরকারি খেয়েছো। তারা বললেন, আমরা তো জানি না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোশত খেয়েছো। অথচ তাদের একজন ছিলেন কথক আর আরেকজন ছিলেন শ্রোতা।

কাউকে গীবত করতে দেখলে শ্রোতার উচিত মুখে গীবত করতে নিষেধ করা। এতে সক্ষম না হলে অন্তরে খারাপ মনে করা। যদি দাঁড়িয়ে যেতে পারে অথবা অন্য কথার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও না করে তাহলে সেও গীবতের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

আর যদি মুখে বলে, চুপ থাকো কিন্তু অন্তরে সে আগ্রহী হয় তাহলে এটা নিফাক হবে। সে ততক্ষণ গুনাহ থেকে বের হতে পারবে না যতক্ষণ না অন্তরে সে তা ঘৃণা করবে। এক্ষেত্রে হাত দ্বারা ইশারা করে চুপ করানো যথেষ্ট হবে না। অথবা ভ্রু বা কপাল দ্বারা ইশারা করাও যথেষ্ট হবে না। কেননা, তা উল্লিখিত বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা বুঝায়, বরং এটাকে কঠিন করে বলবে।

হাদিসে আছে,

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهِ اَذَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ.

যার কাছে কোনো মুমিনকে অপদস্থ করা হয় এবং সাহায্য করার মতো ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে সাহায্য না করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সকলের সম্মুখে তাকে অপমান করবেন। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ৪৮৭)

আবু দারদা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষা করবে আল্লাহর উপর আবশ্যক হয় যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। (মুসনাদে আহমদ : ৬ : ৪৬১)

মুসলমানদের সহায়তার ফযিলতের ব্যাপারে অনেক হাদিস রয়েছে যা আমরা আদাবুস সুহবত, পর্বে উল্লেখ করেছি।

গীবতের কারণ

এগারোটি কারণে মানুষ গীবত করে। তন্মধ্যে আটটি লোক সমাজে প্রচলিত। আর বাকি তিনটি দীনদার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। প্রচলিত আটটি নিচে পেশ করা হলো,

ক. রাগের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্য অন্যের গীবত করা হয়। এর কারণে কখনো বাহ্যত মন্দ বলা হয় না, কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ থেকে যায়; ফলে ভবিষ্যতে সদাসর্বদা মন্দ বলার ভিত্তি স্থাপিত হয়ে যায়।

খ. অন্যের দেখাদেখি এবং তার সুরের সাথে সুর মেলানোর জন্য গীবত করা হয়। আপন সঙ্গী কারও সম্পর্কে মন্দ আলোচনা করলে মনে করা হয়, তার মতো না বললে সে বুঝি বেজার হয়ে যাবে কিংবা বন্ধুত্ব ছেড়ে দিবে। তখন তার কথার ন্যায় কথা বলা হয় এবং একে উত্তম সামাজিকতা গণ্য করা হয়। সে মনে করে এর মাধ্যমে পরিবেশের সাথে তাল মিলানো হচ্ছে। অনেক সময় সঙ্গীসাথিরা কারো ওপর রেগে গেলে সেও তার ওপর রাগ দেখায়, সে তার সঙ্গীসাথিকে একথা বুঝাতে চায় যে, বিপদে আপদে, দুঃখ কষ্টে সর্বাবস্থায় সে তাদের সাথে রয়েছে।

গ. পূর্ব সতর্কতার জন্য গীবত করা হয়। অর্থাৎ, যখন কেউ বুঝতে পারে, অমুক ব্যক্তি কোনো বড়লোকের সামনে তার দোষ বর্ণনা করবে বা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন পূর্ব থেকেই সে তার দোষ বর্ণনা করতে শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হলে তা শোনার মতো অবস্থা না থাকে। অথবা সত্য বিষয়গুলো দিয়ে আলোচনা শুরু করে যাতে পরবর্তীতে মিথ্যা বলতে পারে। তখন প্রথম সত্যের সাথে মিথ্যা চালিয়ে দিবে। দলিল পেশ করবে এবং বলবে, আমার মিথ্যার অভ্যাস নেই। আমি তার অবস্থার ব্যাপারে এরূপ সংবাদ দিয়েছি। যা বলেছি তাই।

ঘ. নিজের কোনো দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যের গীবত করা হয়। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়, সেও তো এরকমই করেছে কিংবা এ কাজে সে আমার সাথি ছিল।

ঙ. অহংকার ও ঔদ্ধত্যের ইচ্ছায় গীবত করা হয়, যাতে অপরকে নীচ জ্ঞান করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায়। যেমন কারও সম্পর্কে বলা, সে তো মূর্খ, কিছুই বুঝে না। এর উদ্দেশ্য থাকে, তার তুলনায় আমি বেশি জানি।

চ. হিংসাবশত গীবত করা হয়। অর্থাৎ, যখন কাউকে দেখে, মানুষ তার প্রশংসা ও সম্মান করে, তখন হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং অন্য কিছু করার ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ প্রকাশ করতে শুরু করে, যাতে মানুষ তার সম্মান ও প্রশংসা না করে। সে চায়, মানুষের মাঝে তার মর্যাদা না থাকুক, যাতে মানুষ তার সম্মান করা থেকে বিরত থাকে। কেননা, মানুষের মুখে ওই ব্যক্তির প্রশংসা শোনা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হয়। এটাই হচ্ছে হিংসা। এটা বিদ্বেষ বা শত্রুতা নয়। কেননা, যার ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করা হয় তার থেকে কোনো অপরাধকে দাবি করে। আর হিংসা কাছের বন্ধু ও আত্মীয়ের সাথেও হয়ে থাকে।

ছ. ঠাট্টাচ্ছলে গীবত করা হয়। এতে অপরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে নিজে হাসা, অপরকে হাসানো উদ্দেশ্য হয়।

জ. অপরকে ঘৃণার পাত্র করার লক্ষ্যে গীবত করা। এটা সামনে এবং পিছনে উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আর যে তিনটি কারণে বিশেষ করে দীনদার শ্রেণীর মধ্যে গীবত হয়ে থাকে, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সেগুলো বাহ্যত কল্যাণমূলক কথা, কিন্তু শয়তান তাতে অনিষ্ট ও মিশ্রিত করে দেয়।

এক. কারও দীনদারির ত্রুটি অবগত হয়ে বিস্মিত হওয়া এবং একথা বলা যে, অমুকের ব্যাপারটি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। যদিও ধার্মিক ব্যক্তির ত্রুটি বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু ওই ব্যক্তির উচিত ছিল তার নাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করা। এখানে নাম বলাটা শয়তানের কাজ। এর ফলে অজান্তেই সে গুনাহগার ও গীবতকারী হয়ে যায়। এরই একটি উদাহরণ হচ্ছে— এক ব্যক্তি বলল, আমি অমুকের দাসীপ্রীতি দেখে অবাক না হয়ে পারি না, অথচ দাসীটি কুৎসিত। অথবা কেউ বলল, সে কীভাবে তার সামেনে বসে থাকে অথচ সে একজন মূর্খ ব্যক্তি।

দুই. কারও ত্রুটি দেখে দয়াপরবশ হওয়া এবং দুঃখ করা। যেমন কাউকে দূষণীয় কাজে লিপ্ত দেখে দয়ার ছলে এভাবে বলা— তার অবস্থা দেখে আমার খুব দুঃখ হয়। এখানে দুঃখের দাবি করা তার জন্য শুদ্ধ হলেও তার নাম উচ্চারণ করার কারণে গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

তার দুঃখিত ও দয়াপরবশ হওয়া নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু শয়তান তার অজান্তে তাকে খারাবির দিকে ঠেলে দিয়েছে। দুঃখ ও দয়া প্রকাশ তো নাম উল্লেখ করা ব্যতীতও সম্ভব, কিন্তু শয়তান তাকে নাম উল্লেখ করার জন্য উত্তেজিত করে, যাতে এর দ্বারা তাকে দয়া প্রকাশ ও পেরেশান হওয়ার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করা যায়।

তিন. আল্লাহর ওয়াস্তে কারও প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা; অর্থাৎ, কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখার পর ধর্মের কারণেই ক্ষোভ দেখা দেয়। এতে তার নাম উচ্চারণ করে ক্ষোভ প্রকাশ করলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ" নীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা এবং অন্যকে জানতে না দেওয়া। এ তিনটি কারণ এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়; এমনকি আলেমদের পক্ষেও কঠিন।

কেননা তারা মনে করে, বিস্ময়, ক্ষোভ ও দয়া যখন কেবল আল্লাহর জন্যই হবে তখন নাম প্রকাশ করার অবকাশ রয়েছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; বরং

গীবতের অনুমতির জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু সেখানেও নাম উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

আমের ইবনে ওয়াসেলা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি কিছু লোকের পাশ দিয়ে গমনকালে তাদের সালাম দিল। তারাও তার সালামের জবাব দিল। অতঃপর যখন লোকটি তাদের সেখান থেকে অতিক্রম করল তাদের একজন বলল, আমি আল্লাহর জন্য এর উপর অসন্তুষ্ট। উপস্থিত ব্যক্তিরা বলল, কত খারাপ কথাই না বলেছো।

অতঃপর তাদের একজনকে বলল, তাকে ধরে যা সে বলেছে তা জানিয়ে দাও। তাদের দূত তাকে ধরল এবং যা বলেছে তার সংবাদ দিলো। এরপর ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাকে ডাকার দরখাস্ত করল।

রাসূলুল্লাহ (স) তাকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তার উপর রেগে আছো কেন? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী, তার খবর ভালো করে জানি। আল্লাহর কসম! সে ফরজ ছাড়া আর কোনো নামায পড়ে না।

ওই ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (স)! তাকে জিজ্ঞেস করুন সে কি কখনো দেখেছে, নামায তার ওয়াক্তের বাহিরে পড়েছি বা খারাপভাবে অযু করেছি অথবা রুকু সেজদা ঠিকমত করিনি? রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। তবে আল্লাহর কসম! এই মাস যে মাসে ফাসেক, ফাজের সবাই রোযা রাখে এছাড়া সে আর কোনো রোযা রাখে না।

ওই ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কি কখনো দেখেছে, আমি ইফতার করে ফেলেছি বা রোযার হক আদায় করিনি? তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, না। সে বলল, আল্লাহর কসম! তাকে কখনো কোনো ভিক্ষুককে যাকাত ছাড়া কোনো কিছু দিতে দেখিনি। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। ওই ব্যক্তি বলল, তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কি আমাকে কখনো দেখেছে, যাকাত প্রার্থনাকারী যখন চেয়েছে তখন কোনো কিছু কম করেছি বা আটকে রেখেছি? রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, উঠে যাও, সে হয়ত তোমার চেয়ে উত্তম। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৪৫৫)

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

জানা উচিত, গীবত থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখার উপায় দু'টি— একটি সংক্ষিপ্ত ও অপরটি বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত উপায়টি হচ্ছে, মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে নেবে যে, গীবতের জন্য আল্লাহর গযবে পতিত হতে হবে। আরও বিশ্বাস করবে যে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর নিকট পুণ্য না থাকলে বদলস্বরূপ অপর ব্যক্তির গুনাহ তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে। ফলে সে জাহান্নামী হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে মৃত ভক্ষণকারীর সাথে সাদৃশ্য রাখে। সে জাহান্নামে যাবে এভাবে যে, তার গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং যার গীবত করা হয়েছে তার গুনাহও তার আমলনামায় দেওয়া হবে ফলে গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সবচেয়ে কম যা করা হবে তা হচ্ছে তার সওয়াব কমিয়ে দেওয়া হবে। এটা তখনই করা হবে যখন প্রশ্নোত্তর ও হিসাব-কিতাবের পর্ব শেষ হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, গীবত বান্দার আমলকে সবচেয়ে বেশি নষ্ট করে দেয়।

এক বর্ণনায় এসেছে— কেউ হাসান বসরী (র)-কে বললো, আমি শুনেছি, আপনি নাকি আমার গীবত করেন? তিনি বললেন, আমার দৃষ্টিতে তোমার এত মূল্য নেই যে, নিজের সওয়াবগুলো তোমাকে দিয়ে দিব।

মোটকথা, মানুষ যখন গীবত সম্পর্কিত হাদিসগুলো বিশ্বাস করে নেবে, তখন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে গীবত করতে মুখ খুলবে না।

আরেকটি উপায় হচ্ছে, যখন গীবত করার ইচ্ছা হয়, তখন মনে মনে ভাববে, নিজের মধ্যেও কোনো ত্রুটি আছে কি না? যদি কোনো দোষ পায়, তবে তা দূর করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ উক্তি স্মরণ করবে— طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ —সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের ত্রুটি তাকে অপরের ত্রুটি থেকে ফিরিয়ে রাখে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২০২)

যখন নিজের মধ্যে ত্রুটি থাকে, তখন নিজের ত্রুটিকে খারাপ না বলে অন্যের দোষকে খারাপ বলতে তার লজ্জা করা উচিত। কারও ইচ্ছাধীন ত্রুটির ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। নতুবা কোনো সৃষ্টিগত ত্রুটির কারণে কাউকে মন্দ বলা সৃষ্টিকর্তাকে মন্দ বলারই নামান্তর।

এক ব্যক্তি জনৈক পন্ডিতকে সম্বোধন করে বলল, হে কুৎসিত ব্যক্তি! সে উত্তর দিল, আমার কাছে চেহারার অবয়ব কিছুই না যে তা সুন্দর করব।

যদি মানুষ তার নিজের মধ্যে কোনো দোষ দেখতে না পায় তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে এবং অন্তরকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখবে। পরনিন্দা ও গীবত বড় ধরনের গুনাহ। কেউ যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে বুঝবে যে, তার ধারণা, সে সব দোষ থেকে মুক্ত, এটা চরম অজ্ঞতা বরং এটাই সবচেয়ে বড় দোষ।

আরেকটি পন্থা হচ্ছে, একথা চিন্তা করা যে, যদি কোনো ব্যক্তি আমার গীবত করে, তবে আমার কাছে তা কতটুকু খারাপ মনে হবে। সুতরাং আমি যদি অন্যের গীবত করি, তবে তার কাছেও ব্যাপারটি তেমনি দুঃখজনক হবে। অতএব, নিজের গীবত অন্যে করলে যেমন তাকে পছন্দ করা হয় না, তেমনি অপরের গীবত করাও অপছন্দ করা জরুরি।

আর বিস্তারিত উপায় হচ্ছে, যে কারণে গীবত করা হয়, সে কারণই দূর করতে হবে। কেননা, কারণ দূর হয়ে গেলেই ব্যাধি দূর হয়ে যায়। অতএব গীবতের কারণ যদি ক্রোধ হয়, তবে তা থেকে বাঁচার জন্য মনে মনে এরূপ চিন্তা করবে, যদি আমি তার ওপর রাগ ঝাড়ি, তবে আল্লাহ তাআলা গীবতের কারণে আমার ওপর রাগ ঝাড়বেন। কেননা, তিনি গীবত না করার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার আদেশ অমান্য করেছি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে নিজের ক্রোধ মেটায় সে জাহান্নামের এমন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে যে দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, তার জিহ্বা নীরব থাকে এবং সে ক্রোধ মেটায় না। অন্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করবে অথচ তার ক্রোধ মেটানোর সুযোগ ছিল। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে সকল মানুষের সামনে ডাকবেন এবং তার পছন্দমত হুর নেওয়ার স্বাধীনতা দিবেন।

কোনো এক নবীর সহিফায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান, যখন তোমার ক্রোধ হয়, তখন আমাকে স্মরণ করো। আমি আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করব।

গীবতের কারণ যদি দেখাদেখি ও বন্ধুদের মন রক্ষা করা হয়, তবে জানা উচিত, যে বিষয়ে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট হয়, তবে লাভ কী? বান্দা অপরের কারণে আপন প্রভুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবে, এটা কীভাবে সম্ভব? এরূপ করলে তার মতো নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞ কেউ হবে না।

তবে তোমার ক্রোধ যদি আল্লাহর জন্য হয়। তাহলে তা যার উপর ক্রোধ করা হচ্ছে তার খারাবি প্রকাশ করা আবশ্যক করে না। বরং আল্লাহর জন্য তোমার বন্ধুদের উপরও রাগ করতে পারো যখন তারা তার খারাবি উল্লেখ করবে। গীবতের মাধ্যমে তোমার রবের নাফরমানি করেছে।

গীবতের মাধ্যমে যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা ইচ্ছা হয়, তবে চিন্তা করবে, মানুষের অসন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহ তাআলার অসন্তুটি আরও বেশি কঠোর। গীবতের কারণে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন এটা তো নিশ্চিত, কিন্তু গীবতের পর মানুষ তাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করবে কি না, তা অনিশ্চিত।

কাজেই অনিশ্চিত একটি বিষয়ের মাধ্যমে তুমি দুনিয়ায় মুক্তি পাবে কিন্তু পরকালে ধ্বংস হবে, তোমার নেক আমল বরবাদ হবে এবং তুমি আল্লাহর তিরস্কারের পাত্র হবে, পরবর্তী মানুষের নিন্দা প্রতিহত করার অপেক্ষা করবে আর এটা সীমাহীন অজ্ঞতা।

অতএব, আমি হারাম ভক্ষণ করেছি, তাতে কী হয়েছে? অমুক ব্যক্তিও তো হারাম খায়— এ কথা বলায় কোনো কল্যাণ নেই। কেননা, সে ব্যক্তির অনুসরণই উপকারী হয়, যে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে। যে লোক এর বিপরীত কাজ করে, তার অনুসরণ কখনো করা উচিত নয়— সে যে কেউ হোক না কেন। মনে কর, কেউ যদি জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এ আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা থাকলেও কি তুমি তাতে ঝাঁপ দেবে? মোটেই না। যদি দাও তবে তো তুমি পাগল।

চিন্তার বিষয়, নিজের ওযর বর্ণনা করার জন্য যে ব্যক্তি অপরের নাম নেয়, সে দুটি গুনাহ করে– একটি গীবত, অপরটি তার ওযর। কেননা, কথায় বলে عذر گناہ بدتر از گناہ গুনাহের ওযর আরও বড় গুনাহ।

এর উদাহরণ ওই বকরির ন্যায় যে তার মাদী ছাগলকে পাহাড় থেকে পড়তে দেখে নিজেও ঝাঁপ দেয়। যদি তার বাকশক্তি থাকে এবং ওযর পেশ করে

বলে, মাদী ছাগল আমার চেয়ে বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তাই আমিও তা-ই করবো। তাহলে তার একাজের কারণে তুমি অবশ্যই হাসবে। তোমার অবস্থা তো তার অবস্থার মতোই। এরপরও তুমি অবাক হও না এবং নিজের উপর হাসোও না।

গীবতের কারণ যদি অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা ইচ্ছা হয়, তবে চিন্তা করবে, গীবতের কারণে আল্লাহর কাছে যে মর্যাদা ছিল, তা তো বিনষ্ট হলো। এখন মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ হওয়া একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। বরং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়, কেননা যখন তারা দেখবে, সে তো অপরের দোষ বের করার কাজে লিপ্ত থাকে তখন তোমার প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে যাবে। সুতরাং মাখলুকের কাছে যা রয়েছে তা তুমি নিশ্চিতভাবে আল্লাহর কাছে বিক্রিকারী হবে।

মাখলুকের মাঝে যদি তোমার মর্যাদা অর্জিত হয়ও তাহলে তারা আল্লাহর থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিতে পারবে না।

গীবতের কারণ যদি হিংসা হয়, তবে ভাবতে হবে, এর ফলে দুটি আযাব নিজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে– এক, দুনিয়াতে হিংসার অনলে দগ্ধ হওয়া এবং দুই, আখেরাতে গীবতের আযাব তার ঘাড়ে চাপানো হবে।

তুমি দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তুমি যাকে হিংসা করছো তার ক্ষতির ইচ্ছা করে নিজে মুসিবতে পরে গেছো এবং তাকে তোমার নেক আমল হাদিয়া দিয়েছো। ফলে তুমি তার বন্ধু এবং নিজের শত্রুতে পরিণত হওয়েছো। কারণ তোমার গীবত তার ক্ষতি নয় বরং তোমারই ক্ষতি করবে। তুমি তোমার নেক আমল তাকে দিয়ে অথবা তার গুনাহ বহন করে তারই উপকার করছো। অপরদিকে তুমি হিংসার সাথে মূর্খতাও একত্র করেছো। অনেক সময় তোমার হিংসা মাহসূদের (যাকে হিংসা করা হয়) মর্যাদার কারণ হবে। কোনো এক কবি বলেছেন, যখন আল্লাহ কারও ফযিলত বৃদ্ধি করতে চান তখন হিংসুকের মুখ খুলে দেন।

ঠাট্টা বিদ্রূপ

এই ঠাট্টা দ্বারা যখন তোমার উদ্দেশ্য হয়, অন্যকে মানুষের মাঝে লাঞ্ছিত করে নিজেকে আল্লাহ, ফেরেশতা ও নবীগণের কাছে ছোট করা। সুতরাং তুমি যদি কিয়ামতের দিন তোমার পেরেশানি ও আপসোস এবং পরকালে

লাঞ্ছনা নিয়ে চিন্তা করতে যেদিন তুমি যার ঠাট্টা করেছিলে তার গুনাহ বহন করবে ও তোমাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তা তোমাকে আরও বিচলিত করে ছাড়বে। তুমি যদি তোমার অবস্থা বুঝতে যে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত তুমি হবে। তুমি তাকে লাঞ্ছিত করছো অল্প কিছু মানুষের সামনে অথচ তুমি নিজেকে লাখো কোটি মানুষের মাঝে লাঞ্ছনার জন্য উপযুক্ত করছো। এবং তার গুনাহ বহনরত তোমাকে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে যেমনিভাবে গাধাকে টেনে নেওয়া হয়।

তার গুনাহের ওপর দয়াশীল হওয়া : যদিও তা ভালো কাজ কিন্তু ইবলিস হিংসা করে তোমাকে ধ্বংসের পথে প্ররোচিত করেছে এবং তোমার মুখ দিয়ে এমন কথা বের করেছে যার দ্বারা তোমার নেকি তার আমলনামায় চলে গেছে। ফলে তা অনুগ্রহকৃত ব্যক্তির গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর ওই ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহশীল হওয়ার বিষয়টি তোমার ওপর ফিরে আসবে। এভাবে যে এখন তোমার নেকি কমানো হবে এবং তুমি নিজের সওয়াব কমিয়ে দিলে; এমনিভাবে আল্লাহর জন্য রাগ করা গীবতকে আবশ্যক করে না বরং শয়তান তোমার নিকট গীবতকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছে যাতে করে আল্লাহর জন্য করা ক্রোধের সওয়াব বিনষ্ট করতে পারে। তুমি এই গীবতের কারণে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হবে।

অবাক করা যা তোমাকে গীবতের দিকে নিয়ে যায় : কাজেই তুমি নিজের ওপর অবাক হও যে, কীভাবে তুমি নিজেকে ধ্বংস করছো এবং নিজের দীনকে ধ্বংস করছো অপরের দীন দুনিয়ার কারণে। এরপরও তুমি দুনিয়ার শাস্তি থেকে নিরাপদ নও। কেননা আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন যেমনিভাবে তুমি আশ্চর্য প্রকাশ করে অপরের গোপন প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত করেছো।

এসব কিছুর প্রতিকার হচ্ছে, মারেফাত লাভ করা এবং ঈমানের বিষয়গুলো দৃঢ়ভাবে জানা। সুতরাং যার ঈমান শক্তিশালী হবে তার মুখ গীবত থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে।

অভ্যন্তরীণ গীবতও হারাম

মনে রাখতে হবে, মুখে খারাপ বলা যেমন হারাম, তেমনি মনে মনে খারাপ ধারণা পোষণ করাও হারাম। খারাপ ধারণার অর্থ হচ্ছে অন্তরে

ইচ্ছা করে অপরকে মন্দ মনে করে নেওয়া। যদি মনের সন্দেহবশত কাউকে মন্দ মনে করা হয়, তবে তা মাফ। বরং সন্দেহ করাও ক্ষমা। যা নিষিদ্ধ তা হচ্ছে, মন্দ বলে ধারণা করার প্রতি মনের ঝোঁক প্রবল হওয়া।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বেঁচে থাকো; কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। (সূরা হুজুরাত : ১২)

কুধারণা হারাম হওয়ার কারণ হলো, মনের গহিন কোণের রহস্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অন্তরে খারাপ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়ার অধিকার বান্দার নেই। হ্যাঁ, যখন কারও মধ্যে খারাপ জিনিস এমনভাবে দেখা যায় যে, তাতে অস্পষ্টতার সুযোগ থাকে না। তখন অবশ্য খারাপ ধারণা করা যায়, কিন্তু এর আগে কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা শয়তানের কাজ। সেজন্য একে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ.

হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, যেন অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসে। (সূরা হুজুরাত : ৬)

যদি এখানে কোনো সংশয় থাকে যা কোনো ফাসাদের দিকে ইশারা করছে এবং কথার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে তাকে সত্যায়ন করা যাবে না। কেননা ফাসেক সত্যবাদী হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে তবে তাকে সত্য বিশ্বাস করে নেওয়া যাবে না। এমনকি কারও মুখের গন্ধ শোঁকার পর মদের গন্ধ পাওয়া গেলেই তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে যে সে মদ পান করেনি বরং কুলি করেছে। অথবা জোড় করে পান করানো হয়েছে, এর প্রতিটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই অন্তরে এ ব্যক্তির মদপানের বিষয়টি বিশ্বাস করে নেওয়া যাবে না। মুসলমানের ব্যাপারে কুধারণাও করা যাবে না।

হাদিসে আছে,

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَاَنْ يُظَنَّ بِهٖ ظَنُّ السُّوْءِ.

আল্লাহ তাআলা মুসলমানের রক্ত, তার ধনসম্পদ এবং তার প্রতি কুধারণা পোষণ করা হারাম করেছেন। (শুআবুল ঈমান : ৬২৮০)

এ থেকে বোঝা গেল, যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলমানের ধনসম্পদ ও রক্ত বৈধ হয়, কুধারণাও সেগুলো দ্বারাই বৈধ হয়।

অর্থাৎ, যখন চোখে দেখে নেয় অথবা আদেল সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া মনে কুধারণা এলে তা দূর করা উচিত এবং মনকে বোঝানো দরকার, এ ব্যক্তির অবস্থা আজ পর্যন্ত তোর কাছে গোপন রয়েছে। যে কারণে এখন তুই কুধারণা করছিস, এতেও ভালো-মন্দ উভয় প্রকার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অযথা মন্দের দিকে যাওয়া এবং অন্তরে তাই বিশ্বাস করার প্রয়োজন কি? প্রশ্ন হয়, সন্দেহ তো মানুষের মনে ঘোরাফেরা করতেই থাকে এবং অন্তরে সংলাপও চলতে থাকে। এমতাবস্থায় কোনটি 'যন' তথা ধারণা, তা কীরূপে জানব? এর কিছু আলামত জানা দরকার। জওয়াব হচ্ছে, ধারণা শক্তিশালী হওয়ার আলামত হচ্ছে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্বেকার বিশ্বাস দূর হয়ে যাওয়া অন্তরে তার প্রতি কিছুটা ঘৃণাভাব উদ্রেক হওয়া, কাছে বসলে অসহনীয় মনে হওয়া, সম্মান ও খাতির হ্রাস পাওয়া এবং সে কোনো গুনাহ করলে দুঃখিত না হওয়া। এসব আলামত পাওয়া গেলে বুঝে নেবে, অপরের প্রতি তুমি কুধারণার বশবর্তী হয়েছ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

ثَلَاثٌ فِي الْمُؤْمِنِ وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ فَمَخْرَجُهُ مِنْ سُوْءِ الظَّنِ اَنْ لَا يُحَقِّقَهُ.

তিনটি বিষয় মুমিনের মধ্যে হয়ে থাকে। আর তার জন্য এ থেকে বের হওয়ার পথও রয়েছে। সুতরাং খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে তা অন্তরে ধরে রাখবে না। (মুজামুল কাবির, তাবারানী : ৩ : ২২৮)

এর অর্থ হচ্ছে, যদি কখনো কোনো ভুল ধারণা অন্তরে চলে আসে তাহলে তা অন্তরে ধরে রাখবে না এবং কোনো অঙ্গ দ্বারা তা প্রকাশও করবে না।

অন্তরে জমে থাকা বা ধরে রাখার অর্থ হচ্ছে এর কারণে অপছন্দ করতে থাকা। আর অঙ্গের দ্বারা প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে তার ব্যাপারে অন্তরের ধারণা অনুপাতে জাহেরি অঙ্গের দ্বারা তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করা। এবং

সাথে সাথে এটাও বুঝিয়ে দেওয়া যে, সে কত জ্ঞানী কত অল্প সময়ে তার খারাপ ধরে ফেলেছে। বস্তুত মুমিন আল্লাহর নূরের মাধ্যমে দেখে অথচ ওই ব্যক্তি বাস্তবে আল্লাহর নূর দ্বারা নয় বরং শয়তানের ধোঁকার অন্ধকার দ্বারা দেখে আর যদি তোমাকে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কোনো সংবাদ দেয় এবং তোমার ধারণা হয় যে, সে সত্য বলেছে তাহলে এক্ষেত্রে তুমি অপারগ। কেননা যদি তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো তাহলে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করলে। আর ওই ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে সে সত্যায়ন পাওয়ার যোগ্য মিথ্যা নয়। আর এটা কোনোভাবেই ঠিক নয় যে, এক ব্যক্তির ব্যাপারে ভালো ধারণা বাকি রাখার জন্য অপরের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা। তবে এখানে এই বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে যে, ব্যক্তি যার ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছে তার সাথে পূর্ব কোনো শত্রুতা আছে কি-না অথবা সে তার সাথে হিংসা তো রাখে না? যদি এমন হয় তাহলে তার কথায় সন্দেহ রয়েছে। আর এই সন্দেহের কারণেই নির্ভরযোগ্য পিতার সাক্ষ্য তার পুত্রের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। দুশমনের সাক্ষ্যও এ কারণেই প্রত্যাখ্যাত হয়। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি সামনে চলে আসে তাহলে তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করবে না এবং না সত্য; বরং তাওয়াক্কুফ করবে এবং এই চিন্তা করবে যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছে তার ব্যাপারে পূর্বেও অস্পষ্ট ছিলো আর এখনও আছে।

কিছু লোক রয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে নির্ভরযোগ্য এবং উভয়ের মাঝে কোনো হিংসা বিদ্বেষও নেই, কিন্তু তার অভ্যাস হচ্ছে মানুষের পিছনে লাগা এবং তাদের দোষ বের করা ও আনন্দ উপভোগ করা। কাজেই এরা বাস্তবে নির্ভরযোগ্য নয়। অপরের গীবতকারী ফাসেক আর যে ব্যক্তির গীবত করার অভ্যাস রয়েছে তার সাক্ষ্য কবুল না করা উচিত। কিন্তু আজকাল লোকেরা গীবতকে দোষ মনে করে না। আর তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করে নেওয়া হয় এবং গীবতের খারাবি ও পরিণামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে লোকেরা গীবতে লিপ্ত হয়।

কুধারণা দূর করার উপায়

কোনো মুসলমানের প্রতি কুধারণা হলে পূর্বের তুলনায় তার সম্মান ও খাতির বেশি করবে এবং তার জন্য উত্তম দুআ করবে। এতে কুধারণা লোপ পাবে। এরপর থেকে শয়তান তোমার অন্তরে কারও ব্যাপারে ভুল

ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবে না। এভয়ে যে তুমি তার জন্য দুআ করতে শুরু না করে দাও এবং তার সম্মান করা শুরু করে দাও।

যদি কোনো নির্ভরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে কারও খারাবি তোমার জানা হয়ে যায় তো শয়তানের প্ররোচনায় এসে তার গীবত করা শুরু করবে না বরং তাকে এমনভাবে নসিহত করবে যাতে করে অন্য কেউ তা বুঝতে না পারে বা নসিহত করে আনন্দে ভেসে যাওয়া যে আমি অমুকের দোষ জানি এবং আল্লাহ আমাকে অপরের নসিহতকারী বানিয়েছেন এবং তাকে সরলপথ দেখানোর তাওফিক দিয়েছেন এধরনের কোনো ধারণা অন্তরে আনা যাবে না ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করাও যাবে না। যেমনিভাবে নিজের কোনো দোষ বা ত্রুটি দেখে পেরেশান হও তেমনিভাবে ওই ব্যক্তির দোষ দেখে পেরেশান হবে এবং দুআ করবে যাতে তার দোষ সে নিজে নিজেই ছেড়ে দেয়। তোমার নসিহতের প্রয়োজন না পড়ে এবং না অন্যের নসিহতের।

যদি তুমি এপথ অবলম্বন করো তাহলে তোমার তিন ধরনের সওয়াব অর্জিত হবে। এক. নসিহতের। দুই. তার অবস্থার ওপর পেরেশান হওয়ার কারণে। তিন. তার দীনের ব্যাপারে সহযোগিতার কারণে।

খারাপ ধারণার কারণে অন্তরে গুপ্তচরবৃত্তি ও আড়ি পাতার দিকে ধাবিত হয়। তাই অধিক জানার জন্য অস্থির হয়ে যায় ফলে আড়ি পাতা শুরু করে। অথচ কুরআনে আল্লাহ তাআলা তা নিষেধ করেছেন ও বলেছেন, وَلَا تَجَسَّسُوْا কুরআনের একটি আয়াতে খারাপ ধারণা, গীবত, আড়ি পাতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। تَجَسُّس এর অর্থ হচ্ছে কারও দোষ যা আল্লাহ গোপন রেখেছেন তা বের করার জন্য লেগে পরা। যতক্ষণ না তা প্রকাশ করতে পারে চেষ্টা করে যাওয়া। এর বিস্তারিত আলোচনা সৎকাজের আদেশের পর্বে আলোচিত হয়েছে।

যে কারণে গীবত বৈধ

হ্যাঁ, পরের নিন্দা করার পেছনে যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত ও শরিয়তসম্মত কারণ থাকে, তাহলে সেই গীবতে গুনাহ হয় না— এর ছয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. জুলমের বিচার প্রাপ্তির জন্য গীবত করা। যেমন, মাজলুম ব্যক্তি যদি ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তাকে বলে যে, অমুক নিম্নপর্যায়ের শাসক আমার ওপর

অবিচার করেছে, খিয়ানত করেছে অথবা আমার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে, তবে এটা গীবতের মধ্যে গণ্য না। কেননা, এটা না করলে বিচার পাওয়া যাবে না কিন্তু মাজলুম ছাড়া অন্য কেউ এরূপ বললে গীবত হবে। মাজলুমের জন্য জালেমের নিন্দা করা বৈধ।

হাদিসে এসেছে, إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا হকদারের জন্য কথা বলার অধিকার আছে। (সহিহ বুখারী : ২৩০৬)

দুই. মন্দ বিষয় দূর করা অথবা পাপাচারীকে সৎপথে আনার জন্য গীবত করা। যেমন, একবার ওমর (রা) যখন ওসমান কিংবা তালহার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে "আসসালামু আলাইকুম" বলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। ওমর (রা) এ বিষয়ে আবু বকরের (রা) নিকট অভিযোগ করলে তিনি নিজে তাঁদের নিকট গিয়ে উভয়ের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেন। এ অভিযোগ সাহাবায়ে কেরামের মতে গীবত ছিল না। কেননা, এর উদ্দেশ্য ছিল সন্ধি স্থাপন করা। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ৬)

এমনিভাবে যখন ওমর (রা)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে, আবু জুন্দুব শামে যাওয়ার পর মদে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি তার কাছে চিঠি পাঠালেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حٰمٓ. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ.

অতঃপর সে তওবা করলো। ওমর (রা) ওই সংবাদকে গীবত মনে করেননি। কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে ওমর (রা) তাকে কিছু নসিহত করেন এবং মদ আসক্তি থেকে ফিরে আসে। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯ : ২৪৪) সুতরাং এই দোষ বর্ণনা করা সঠিক ও সংশোধনের লক্ষ্যে, এটি যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা হারাম।

তিন. কোনো মাসআলায় শরিয়তের হুকুম জানার জন্য গীবত করা। যেমন কেউ মুফতির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা, ভাই অথবা স্ত্রী আমার উপর অবিচার করেছে। এখন শরিয়তের আইনে আমার কী করা উচিত? এক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং ইঙ্গিতে প্রশ্ন করবে। যেমন বলবে, আপনি এ সম্পর্কে কী বলেন, এক ব্যক্তির উপর

তার কোনো আত্মীয় অবিচার করেছে, এখন তার কী করা উচিত। যদি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলে তাও জায়েয। বর্ণিত আছে, ওতবার মেয়ে হিন্দা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল, আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ লোক। আমার ও সন্তানদের প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা দেয় না। আপনি অনুমতি দিলে আমি এ পরিমাণ অর্থ তার সম্পদ থেকে গোপনে নিয়ে নেব। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ঠিক যে পরিমাণ টাকাকড়ি তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ অর্থ তুমি নিতে পারো। (সহিহ বুখারী : ২২১১)

এখানে হিন্দা তার স্বামীর বিরুদ্ধে কৃপণতা ও জুলুমের আলোচনা করেছে। এসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বাধা দেননি। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

চার. অনিষ্ট থেকে কোনো মুসলমানকে রক্ষার জন্য গীবত করা। যেমন, একজন দীনদার আলেম ব্যক্তিকে দেখা গেল, তিনি ফাসেক গুনাহগারের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। এতে আশঙ্কা রয়েছে যে তার মধ্যে ফিসক ও বিদআত অনুপ্রবেশ করবে তাই ওই ব্যক্তির ফিসক ও বিদআতের ব্যাপারে আলেমকে জানানো বৈধ। আর এটাও স্পষ্ট হলো যে, দীনদার ব্যক্তিও গুনাহ সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিকে বলতে পারে, যাতে সে প্রভাবিত না হয়ে যায়। তেমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে ভৃত্য রাখতে চায়, কিন্তু তার কোনো ত্রুটি সম্পর্কে সে জানে না। তার কোনো বন্ধু ভৃত্যের দোষ সম্পর্কে জানে। এমন পরিস্থিতিতে বন্ধুর জন্য জায়েয, সে ভৃত্যের ত্রুটি মনিব বন্ধুকে বলে দেবে। এতে যদিও ভৃত্যের ক্ষতি, কিন্তু বন্ধুর কল্যাণের প্রতি প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে। অনুরূপভাবে বিবাহের ব্যাপারেও যদি কেউ কারও অবস্থা জানে তাহলে যেরূপ জানে, সেরূপই বলে দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ত্রুটি প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না।

যদি বোঝা যায়, সে এতটুকু বললেই বিবাহ ত্যাগ করবে, لَا يُصْلِحُ لَكَ তাহলে এতটুকু বলাই ওয়াজিব এবং এতেই যথেষ্ট। আর যদি জানতে পারে যে, স্পষ্ট বলা ব্যতীত সে সতর্ক হবে না। তখন স্পষ্টভাবে দোষ বলে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা কি খারাপ ব্যক্তিদের অবস্থান আলোচনা করতে ভয় করো, তার মর্যাদা হানি করো যাতে

মানুষ চিনতে পারে। তার মধ্যে যে খারাবি রয়েছে তা প্রকাশ করো যাতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলেন, তিন ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করা গীবত নয়— (১) জালেম শাসক, (২) বিদআতি, (৩) প্রকাশ্য পাপাচারী ফাসেক।

পাঁচ. যে ব্যক্তি এমন পদবিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে। যেমন খোঁড়া, কানা, টেকো, ইত্যাদি। এসব পদবি বললে গীবত হয় না। হাদিসের বর্ণনায় রাবিদের এরূপ পদবি পওয়া যায়। যেমন روى ابو الزناد এবং عن الاعرج সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব পদবিকে খারাপ মনে করে না বিধায় এতে গীবত হয় না।

ছয়. প্রকাশ্য পাপিষ্ঠ ব্যক্তির দোষ বললে গীবত হয় না। অর্থাৎ, যে সর্বসাধারণের সামনে পাপাচার করে এবং তার পাপাচার কারও নিকট গোপন নয়। যেমন মদখোর, হিজড়া ইত্যাদি।

হাদিসে আছে,

مَنْ اَلْقى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ مِنْ وَجْهِه فَلَا غِيْبَةَ.

যে ব্যক্তি লাজ-লজ্জার মুখোশ ছুড়ে ফেলে দেয়, তার গীবত নেই। (বায়হাকি, সুনানুল কুবরা : ১০ : ২১০)

সে তো প্রকাশ্যে অপরাধ করছে সেটা বললে আর দোষ কী? ওমর (রা) বলেন, যে ব্যক্তি খোলাখুলি গুনাহ করে, তার কোনো মানসম্মান নেই। অর্থাৎ তার দোষ প্রকাশ করলে মানহানি ও গীবত হবে না, কিন্তু যে গোপনে করে, তার সম্মানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছুলত ইবনে তরিফ বলেন, আমি হাসানকে বলেছিলাম, যে ফাসেক প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়ায় তার অবস্থা বর্ণনা করা গীবত কি-না।

তিনি বলেন, না। তার তো কোনো মর্যাদাই নেই।

হাসান বসরি (র) বলেন, তিনটি ক্ষেত্রে গীবত হয় না। কুপ্রবৃত্তি পূজারী, প্রকাশ্যে পাপাচারী, জালেম বাদশাহর অবস্থা বর্ণনা করলে। কেননা এসব লোকেরা যা করার প্রকাশ্যে করে এবং মাঝে মধ্যে এ নিয়ে গর্বও করে। সুতরাং যদি তাদের আলোচনা করা হয় তাহলে তারা অপছন্দ কেন করবে? সে তো তার খারাবি প্রকাশ করতে নিজেই আগ্রহী। তবে যে কাজ অপ্রকাশ্যে করে তা প্রকাশ করা গীবত হবে।

আওফ (র) বলেন, আমি ইবনে সিরিন (র)-এর দরবারে হাজ্জাজের খারাবি বর্ণনা করি। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা হাকেম, আদেল, আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে হাজ্জাজ থেকে প্রতিশোধ নিবেন ঠিক তেমনিভাবে তার গীবতকারী থেকেও প্রতিশোধ নিবেন। যেদিন তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তোমার এই ছোট্ট গুনাহ হাজ্জাজের বড় গুনাহের মোকাবেলায় কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

গীবতের কাফফারা

কেউ যদি গীবত করে ফেলে তবে তার উচিত তাওবা করা। অর্থাৎ, স্বীয় আমলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। এরপর যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া। এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হক থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। বরং অন্তরে পেরেশান, চিন্তিত হওয়াও জরুরি। কেননা, রিয়াকারী জাহেরিভাবে নিজের অপরাধ মাফ করায়। কিন্তু অন্তরে সামান্য পরিমাণও অনুশোচনা থাকে না। তার লক্ষ শুধু মানুষকে বোঝানো যে সে মুত্তাকি। আগে তো গীবতের গুনাহ ছিলই আর এখন রিয়ার গুনাহও যুক্ত হলো।

হাসান (র) বলেন, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়, তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করাই যথেষ্ট। ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। এর প্রমাণ, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বাণী,

كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ.

তুমি যার গীবত করছ, তার কাফফারা হচ্ছে, তুমি তার মাগফিরাতের দুআ করবে। (শুআবুল ঈমান : ৬৩৬৮)

মুজাহিদ (র) বলেন, কারও গোশত খাওয়ার কাফফারা এটাই যে, তার প্রশংসা করবে এবং তার জন্য উত্তম দুআ করবে। আতা ইবনে আবি রাবাহকে একজন প্রশ্ন করল, গীবত থেকে তাওবা কীভাবে হয়? তিনি বললেন, যার গীবত করা হয় তার নিকট গিয়ে বলবে, আমি যা বলেছিলাম তা ছিল ভুল। আপনার ওপর জুলুম হয়েছে। এখন আমি হাযির। ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিন। না হয় মাফ করে দিন। এ উক্তিটিই সঠিক। আর যারা বলে, ইজ্জতের কোনো বিনিময় নেই; এর জন্য ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব নয়, তাদের উক্তি সঠিক নয়। কারণ, সম্মান নষ্ট হয় এমন গালি দিলে সেজন্য শাস্তি দেওয়া হয়।

সহিহ হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কেউ কারও ওপর জুলুম করে চাই তা মাল সম্পদের জুলুম অথবা মর্যাদাহানি করে তাহলে তা ওই দিন আসার পূর্বে সমাধান করে নেয় যেন যেদিন কোনো ধনসম্পদ থাকবে না। তখন তার নেক আমল থেকে নেওয়া হবে। যদি তা না থাকে তাহলে যার গীবত করা হয়েছে তার গুনাহ গীবতকারীর আমল নামায় দিয়ে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারী : ২৪৪৯)

এক মহিলা অন্য এক মহিলাকে "লম্বা আঁচলওয়ালি" বললে আয়েশা (রা) তাকে বলেছিলেন, তুমি তার গীবত করেছ। এখন তার কাছে মাফ চাও। এ থেকে বোঝা গেল, সম্ভব হলে মাফ করিয়ে নেওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি নিরুদ্দেশ অথবা মৃত হয়, সেক্ষেত্রে তারজন্য উত্তম দুআ করবে এবং নেক কাজের সওয়াব বখশে দেবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর মাফ করে দেওয়া জরুরি কি-না?

এর জবাব হচ্ছে, মাফ করে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং ভালো কাজ। মাফ করানোর পদ্ধতি হচ্ছে তার খুব প্রশংসা করবে। তার সাথে বেশি মিশবে এবং সময় দিবে যাতে তার অন্তর নরম হয়। যদি সে মাফ না করে তাহলেও তার এই নিকটবর্তী হওয়া, তাকে সম্মান করা পরকালে তার গীবতের গুনাহের মোকাবেলায় হবে।

কোনো কোনো বুযুর্গ মাফ করতেন না যেমন সাবীদ বিন মুসায়য়াব (র) বলেন, যে আমার ওপর জুলুম করেছে তাকে আমি ক্ষমা করবো না।

ইবনে সিরীন (র) বলেন, গীবত আল্লাহ হারাম করেছেন আমি মাফ করে তা হালাল কেন করবো।

এখন যদি কেউ বলে রাসূলুল্লাহ (স) তো বলেছেন, তোমরা কি আবু যমযম এর মতো হতে অক্ষম? সে যখন ঘর থেকে বের হতো তখন সে বলতো, হে আল্লাহ! আমার সম্মান মানুষের জন্য সদকা করলাম। (তাবারানী মাকারিমে আখলাক : ৫৩)

এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, নিজের মর্যাদা সদকা করার অর্থ কী? এবং যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা সদকা করে তাকে কি খারাপ বলা যাবে? যদি এই সদকা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে হাদিসে বিদ্যমান তারগীবের অর্থ কী?

এর উত্তর হচ্ছে, মর্যাদা সদকা করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার ব্যাপারে ভালো মন্দ বলা যাবে বরং এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামতের দিন গীবতের প্রতিশোধ নিবো না। এই কথার দ্বারা গীবত করা জায়েয হয়ে যায় না এবং এর গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়াও যায় না। আর এটা যেন ক্ষমা আবশ্যক হওয়ার পূর্বে ক্ষমা করা। সুতরাং যখন অন্যায়ই প্রকাশ পায়নি তো মাফ কীসের, তবে এটাকে মাফের ওয়াদা বলা যেতে পারে যে অমুক ব্যক্তি যদি কোনো জুলুম করে তাহলে তার অগ্রীম মাফ ও কিয়ামতের দিন কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। কিন্তু যদি তার এই ওয়াদা থেকে ফিরে আসে এবং প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে অন্য হকের ন্যায় এটাও সে নিতে পারবে। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কেউ যদি বলে আমার ওপর জিনার অপবাদ দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। অতঃপর কেউ তার ওপর জিনার অপবাদ দেয় তাহলে তার বিচার চাওয়ার হক বাতিল হয়ে যায় না। পরকালের হকও দুনিয়ার হকের মতো।

মাফ করে দেওয়া উত্তম। হাসান বসরী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত উম্মত আল্লাহর সামনে হাঁটু ভেঙে বসবে, এরপর ঘোষণা আসবে যার প্রতিদান এখনো বাকি আছে তারা দাঁড়াও। তখন ওই সব লোকেরা দাঁড়াবে যারা দুনিয়াতে অন্যের জুলুম মাফ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

মানুষকে মাফ করুন এবং লোকদের সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং জাহেলদের থেকে দূরে থাকুন। (সূরা আরাফ : ১৯৯)

রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, عفو কী জিনিস? তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ কেউ যদি তোমার উপর জুলুম করে তাহলে তাকে মাফ করে দাও। যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করো।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হাসান বসরী (র)-কে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। এরপর হাসান বসরী (র) তার কাছে কিছু খেজুর হাদিয়া পাঠালেন এবং বললেন, আমি জানতে পেরেছি তুমি আমাকে নেকী হাদিয়া দিয়েছো তাই তোমাকে এ হাদিয়া পাঠালাম, আর যেভাবে তোমাকে মূল্যায়ন করার দরকার ছিল তা করতে না পারার কারণে ওযর পেশ করছি।

১৬. চোগলখোরী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ.

যে পেছনে গিবতকারী, একের কথা অপরের কাছে বলে বেড়ায়। (সূরা আল কলম : ১৩)

আরও বলেন,

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ.

রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাত। (সূরা কলাম : ১৩)

আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (র) বলেন, زَنِيْمٌ এর অর্থ হচ্ছে, যে জারজ কথা লুকায় না। এ আয়াত থেকে তিনি একথা উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করে না এবং চোগলখোরী করে, সে হারামজাদা। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দা করে। (সূরা হুমাযাহ : ১)

এ আয়াতে কারও কারও মতে هُمَزَةٌ এর অর্থ যে চোগলখোরী করে। কুরআনে আবু লাহাবের স্ত্রীকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (লাকড়ি বহনকারিণী) বলা হয়েছে। কথিত আছে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল চোগলখোরী করতো। কাজেই এর অর্থ হলো "কথা বহনকারিণী।"

কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا.

কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। (সূরা তাহরীম : ১০)

এ আয়াত লূত ও নূহ (আ)-এর স্ত্রীদের শানে নাযিল হয়েছে। লূত (আ) এর স্ত্রী যখনই তাদের ঘরে কোনো মেহমান আসত, সম্প্রদায়ের নিকট

গিয়ে খবর পৌঁছে দিত। তারা সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে মেহমানদের সাথে অপকর্মের প্রয়াস চালাত। নূহ (আ)-এর স্ত্রী লোকদের নিকট গিয়ে বলত, নূহ পাগল।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহিহ মুসলিম : ১০৫)

আরেক হাদিসে রয়েছে, নিন্দুক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর নিন্দুকই হচ্ছে চোগলখোর। (সহিহ বুখারী : ৬০৫৬)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ওই ব্যক্তি যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যার আচরণ নরম, যে অন্যকে ভালোবাসে, অন্যরাও তাকে ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। ভাইদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ ব্যক্তিদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।

রাসূলুল্লাহ (স) একবার সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে মারাত্মক দুষ্ট সম্পর্কে বলব না? সাহাবিরা আরজ করলেন, হ্যাঁ বলুন সর্বাধিক দুষ্ট কে? তিনি বললেন, যে চোগলখোরী করে বন্ধুদের সম্পর্কে ফাটল ধরায় এবং ভালো লোকদের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। (মুসনাদে আহমদ : ৬ : ৪৫৯)

আবু যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ তালাশ করার জন্য একটি শব্দের দ্বারা ইশারা করবে, তো আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ওই শব্দে তাকে দোষারোপ করবেন। (আস সামতু ওয়া আদাবুল লিসান : ২৫৮)

আবু দারদা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তির ওপর দোষারোপের জন্য এমন কথা বলে যার থেকে সে মুক্ত, তাকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কিয়ামতের দিন জাহান্নামে জ্বালাবেন। (আস সামতু ওয়া আদাবুল লিসান : ২৫৯)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তার উচিত জাহান্নামে ঠিকানা করে নেওয়া। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ৫০৯) বলা হয়, একতৃতীয়াংশ শাস্তি চোগলখোরীর কারণে হয়ে থাকবে।

ইবনে ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করার পর তাকে বললেন কথা বলো। সে বলল, যে আমার মধ্যে প্রবেশ করবে সে সৌভাগ্যশালী। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার ইজ্জতের কসম আট ধরনের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, মদপানকারী, জিনাকারী, চোগলখোর, ব্যভিচারের দূত, অসৎপুলিশ, মুখান্নাস, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, এমনিভাবে ওই ব্যক্তিও না যে বলে আমার ওপর আল্লাহর ওয়াদা বা অঙ্গীকার রয়েছে আমি যেন এটা এটা না করি। অতঃপর সে তা পূর্ণ করেনি।

কাবে আহবার (রা) বর্ণনা করেন, একবার বনি ইসরাঈলের ওপর দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়। তখন মূসা (আ) কয়েকবার ইসতেসকার নামায পড়লেন, কিন্তু বৃষ্টি হলো না এরপর আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন তোমাদের দুআ কবুল হবে না। কারণ, তোমাদের মাঝে একজন চোগলখোর রয়েছে। এরপর মূসা (আ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার নাম বলে দিন যাতে তাকে বের করে দিতে পারি। এরপর আল্লাহ ওহি নাযিল করলেন, হে মূসা! আমি তোমাদের চোগলখোরী থেকে নিষেধ করছি। অতঃপর সবাই তওবা করলো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পানি বর্ষণ করলেন।

এক ব্যক্তি সাত প্রশ্নের উত্তরের জন্য সাত শত ফরসখ পাড়ি দিল অতঃপর যখন হাকিমের সাথে সাক্ষাৎ করল, তাকে বলল, আপনি আমাকে সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ১. আকাশ ও তার থেকে ভারী জিনিস কী? ২. জমিন ও তার থেকে বেশি প্রশস্ত কী রয়েছে? ৩. পাথরের চেয়ে শক্ত কী আছে? ৪. আগুনের চেয়ে অধিক পুড়ানোর ক্ষমতা কার রয়েছে? ৫. যামহারির থেকে শিতল কী রয়েছে? ৬. সমুদ্র থেকে বড় কী আছে? ৭. এতিম থেকে দুর্বল কে আছে?

হাকিম উত্তর দিলেন, নির্দোষের ওপর অপবাদ দেওয়া সাত আসমান থেকে ভারী। সত্য কথা জমিন থেকেও প্রশস্থ। তুষ্টহৃদয় সমুদ্র থেকেও বড়। হিংসা-বিদ্বেষ আগুন থেকেও বেশি দগ্ধকারী। কোনো নিকটবর্তী থেকে প্রয়োজন পুরা না হওয়া যামহারির থেকে শীতল। কাফেরের অন্তর পাথর থেকে শক্ত। চোগলখোর এতিম থেকে বেশি লাঞ্ছিত, যদিও তা প্রকাশ পায় না। (আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৪৭০)

চোগলখোরীর পরিচয় ও তা দূর করার পদ্ধতি

পরনিন্দা চর্চাই চোগলখোরী। এটা যেমন, এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির নিকট গিয়ে এ কথা বলা, অমুক ব্যক্তি তোমাকে নিয়ে এ কথা বলছিল। প্রকৃত অর্থে চোগলখোরী এতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে বিষয় প্রকাশ করা ভালো নয় তা প্রকাশ করা। যার ব্যাপারে বলা হয়, তার নিকট খারাপ লাগুক কিংবা যার নিকট বলা হয়, তার নিকট খারাপ লাগুক অথবা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে খারাপ মনে হোক। প্রকাশ করা, চাই কথার মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে হোক এসবই চোগলখোরীর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, চোগলখোরী হচ্ছে গোপন তথ্য ফাঁস করা এবং অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করা। সুতরাং যখন কারও দৃষ্টি মানুষের অবস্থার ওপর পড়ে, তখন তার নীরব থাকা উচিত। কিন্তু যে বিষয়ে কোনো মুসলমানের উপকার অথবা কারও গুনাহ দূর করা প্রয়োজন, তাতে অবশ্য কথা বলা উচিত। যেমন, যখনই কাউকে কারও ধনসম্পদ নিয়ে যেতে দেখা যায়, তখন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। এতে অর্থসম্পদের মালিকের প্রতি বিবেচনা করা হবে। কিন্তু যদি দেখা যায়, কেউ আপন অর্থসম্পদ গোপন করছে, তখন তা প্রকাশ করে দিলে চোগলখোরী হবে। যে বিষয়ের মাধ্যমে চোগলখোরী করা হচ্ছে যদি তা ওই ব্যক্তির কোনো দোষ হয়ে থাকে তাহলে দুটি গুনাহ একত্র হয়েছে, ১. গীবত। ২. চোগলখোরী।

চোগলখোরীর কারণ

যার ব্যাপারে বলা হচ্ছে তার ব্যাপারে ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করার কারণে হতে পারে অথবা যার সামনে অন্যের বিষয় বলা হচ্ছে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অথবা কেবলি অনর্থক চর্চা। যার সামনে চোগলখোরী করা হয় এবং বলা হয় অমুক তো তোমার ব্যাপারে এটা এটা বলেছে বা তোমার ব্যাপারে এমন এমন কাজ করেছে। বা তোমার ব্যাপারে কোনো খারাপ পরিকল্পনা করেছে। বা তোমার শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করছে ইত্যাদি।

তার যে ছয়টি কাজ করতে হবে তা হচ্ছে—

এক. তার কথা সত্য মনে করবে না। কেননা, যে চোগলখোরী করে, সে ফাসেক। ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ.

হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, যেন অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। (সূরা হুযুরাত : ৬)

দুই. তাকে চোগলখোরী করতে নিষেধ করবে এবং বলবে, দ্বিতীয়বার আমার কাছে এ ধরনের কথা বলবে না। কুরআনে এ ব্যাপারে পরিষ্কার নিষেধ করা হয়েছে।

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো। (সূরা লোকমান : ১৭)

তিন. তার সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রাখবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার সাথে শত্রুতা রাখেন। আল্লাহ তাআলা যার সাথে শত্রুতা রাখেন, তার সাথে শত্রুতা রাখা অবশ্য কর্তব্য।

চার. কেবল তার কথায় অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

তোমরা কুধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো কুধারণা কবিরা গুনাহ। (সূরা হুজুরাত : ১২)

পাঁচ. তার কথার কারণে তামাশা ও দোষ অন্বেষ করো না। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوْا অন্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করো না।

ছয়. চোগলখোরকে চোগলখোরী করতে নিষেধ করে নিজেই তাতে লিপ্ত হয়ে যেয়ো না। যেমন মানুষের কাছে বলবে না যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এমন এমন বলে।

এর ফলে তুমি চোগলখোর ও গীবতকারী হবে এবং তুমি যা নিষেধ করেছো তা নিজেই এখন করছো। ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল, অতঃপর সে এক ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু বললো। এরপর ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে তোমার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিবো। যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. আর

যদি সত্যবাদী হও তাহলে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, هَمَّازٍ مَشَّآءٍ بِنَمِيمٍ আর তুমি চাইলে আমরা তোমাকে মাফ করে দিবো। অতঃপর ওই ব্যক্তি বললো, ক্ষমা করুন হে আমিরুল মুমিনিন! আমি আর এ কাজ করবো না।

বর্ণিত আছে, কোনো এক হাকিমের কাছে তার কোনো এক ভাই সাক্ষাৎ করতে আসলো এবং হাকিমের কোনো এক বন্ধুর ব্যাপারে ভালো মন্দ বলল, হাকিম একথা শোনার পর বলল, তুমি দেরি করে সাক্ষাৎ করতে আসতে (তাহলে কতইনা ভালো হতো)। কেননা! তুমি তিনটি গুনাহ নিয়ে এসেছো, ১. আমার এক ভাইয়ের ব্যাপারে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুললে। ২. আমার ফারেগ অন্তরকে ভিন্ন দিকে ঠেলে দিলে। ৩. তুমি তোমার নিজেকে অভিযুক্ত বানিয়ে ফেললে।

বর্ণিত আছে, সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক বসেছিলেন, আর তার পাশে বসেছিলেন ইমাম জুহরি (র)। সুলায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, হে অমুক! তুমি না-কি আমার ব্যাপারে এসব কথা বলেছো। অতঃপর ওই ব্যক্তি বলল, আমি এ ব্যাপারে কিছু বলিনি ও করিওনি। অতঃপর সুলায়মান বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে সে সত্যবাদী। জুহরি (র) বললেন, চোগলখোর সত্যবাদী হয় না। সুলায়মান বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। অতঃপর ওই লোকটিকে বলল, তুমি যেতে পারো।

হাসান বসরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি তোমার কাছে অন্যের চোগলখোরী করবে সে অপরের সামনে তোমার চোগলখোরী করবে।

একথার মধ্যে ইশারা রয়েছে, চোগলখোরীর উপর রাগ করা উচিত, তার কথা ও কাজে ভরসা করা উচিত নয়, আর কীভাবেই ভরসা করা হবে যে মিথ্যা, গীবত, ধোঁকাবাজী, খেয়ানত, ফাসাদ, বিদ্বেষ, মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ.

যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তারা তা ছিন্ন করে এবং জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে। (সূরা বাকারা : ২৭)

সে এসব কাজে লিপ্ত। সুতরাং তার ওপর আস্থা রাখা যায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। (সূরা শুরা : ৪২) চোগলখোর এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার খারাবি থেকে বেঁচে থাকার জন্য লোকেরা তার থেকে দূরে থাকে। (সহিহ বুখারী : ৬০৩২)

চোগলখোর তাদের একজন। তিনি আরও বলেছেন, জান্নাতে ওই ব্যক্তি প্রবেশ করবে না যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। (সহিহ বুখারী : ৫৯৮৪)

অর্থাৎ, মানুষের মাঝে সে হচ্ছে চোগলখোর আর কেউ কেউ বলেছেন, আত্মীয়তা ছিন্নকারী।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার কাছে এসে চোগলখোরী করল, তখন আলী (রা) বললেন, আমি তোমার কথা যাচাই করবো যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবো। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে শাস্তি দিবো। আর যদি মাফ চাও তাহলে মাফ করে দিবো। অতঃপর লোকটি বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আমাকে মাফ করে দিন।

মুহাম্মদ ইবনে কাবকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন বিষয়গুলো মুমিনের মর্যাদা কমিয়ে দেয়। তিনি বললেন, বেশি কথা বলা, গোপন ফাঁস করা, প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ করে নেওয়া। (আল উযলা : ৭১)

আমির আবদুল্লাহ ইবনে আমেরকে এক ব্যক্তি বলল, আমি শুনেছি অমুক ব্যক্তি আমিরের কাছে এ সংবাদ দিয়েছে যে, আমি আমিরের কুৎসা রটনা করেছি। আমির বলল, তুমি ঠিকই শুনেছো। সে বলল, আপনি বলুন সে কী বলেছে, যাতে আমি তার কথা মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমির বলল, আমি আমার মুখে নিজের দোষ বলতে পারবো না। সে যা বলেছে আমি তাকে সত্য মনে করিনি আর আমি তোমার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করবো না।

কোনো বুযুর্গের সামনে চোগলখোরীর আলোচনা করা হলো তিনি বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা প্রত্যেকের থেকে সত্য প্রত্যাশা করে। কিন্তু চোগলখোরদের মিথ্যার ওপরও ভরসা করে।

মুসআব ইবনে যুবায়ের (র) বলেন, চোগলখোরী করার তুলনায় চোগলখোরীকে মূল্যায়ন করা বেশি খারাপ। কেননা, চোগলখোরীর মধ্যে শুধু বর্ণনা করা হয় আর তা মূল্যায়নের মাঝে চোগলখোরীর সত্যায়ন ও ভবিষ্যতে চোগলখোরী করার অনুমতি বিদ্যমান, এজন্য চোগলখোর থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি ধরে নেওয়া হয় চোগলখোর তার কথায় সত্য তারপরও সে অনিষ্ট থেকে কেউ মুক্ত নয়। কেননা, সে অপরের গোপন বিষয় গোপন রাখে না। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ১২২)

এক বর্ণনায় আছে, লোকদের সামনে অন্যের চোগলখোর ব্যক্তি হচ্ছে হারামি।

এক ব্যক্তি সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের কাছে আসল এবং কথা বলার অনুমতি চাইলো। সে বললো, আমি এমন কিছু বলবো তা আপনার অপছন্দ লাগলেও শুনুন। কেননা এর পরে যা আছে তা আপনি পছন্দ করবেন। মালেক বললো, বলো। সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন! একদল লোক আপনাকে ঘিরে রেখেছে। তারা আপনার দুনিয়া ক্রয় করছে তাদের দীনের বিনিময়ে, আপনার সন্তুষ্টি তাদের রবের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে। আল্লাহর ক্ষেত্রে আপনাকে ভয় করেছে, কিন্তু আল্লাহকে আপনার ব্যাপারে ভয় করেনি। সুতরাং তাদের বিশ্বাস করবেন না। কেননা, তারা সরাসরি উম্মতের মাঝে ক্ষতি করবে না এবং আমানত বিনষ্ট করবে না এবং মর্যাদাহানি করবে না। তাদের নৈকট্যের মাধ্যম হচ্ছে হিংসা, চোগলখোরী, আর তাদের বড় মাধ্যম হচ্ছে গীবত ও কুৎসা রটনা।

আর আপনি তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও জিজ্ঞাসিত হবেন। আপনি যা করছেন সে ব্যাপারে তারা জিজ্ঞাসিত হবে না। আপনার আখেরাত ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের দুনিয়া সংশোধন হবে না। কেননা, সবচেয়ে প্রতারিত হচ্ছে বা ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তি হচ্ছে যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাত বিক্রি করে। (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ১০৫)

এক ব্যক্তি সুলায়মান ইবনে মালেকের কাছে আসে এবং যিয়াদ আযমের চোগলখোরী করে। সুলায়মান সন্ধির লক্ষে উভয়কেই ডাকলেন যিয়াদ তখন তার সামনে দুটি কবিতা পড়ে,

যার সারমর্ম হচ্ছে, তুমি এমন ব্যক্তি আমি তোমার কাছে আমার আমানত রেখেছি, তুমি তার মধ্যে খেয়ানত করেছো এবং ইলম ছাড়াই কথা বলে

দেওয়া তোমার অভ্যাস। তুমি এই মুআমালায় আমানতের মধ্যে খেয়ানত করে গুনাহ করেছো।'

এক ব্যক্তি আমর ইবনে ওবাইদকে বলেছে, উসওয়ারি তার ঘটনা বর্ণনার সময় আপনার নাম অনেক খারাপভাবে নিয়েছে তখন আমর বললো আপসোসের বিষয় তুমি না তার দিকটি খেয়াল রেখেছো যার কথা আমাকে শুনাচ্ছো, আর না আমার দিকটি খেয়াল রেখেছো যে, আমার বন্ধুর ব্যাপারে এমন সংবাদ দিয়েছো যা আমার ভালো লাগেনি। যাই হোক, বিষয়টি যদি তাই হয় যা তুমি বলেছো তাহলে তাকে বলে দাও মৃত্যু আমাদের গ্রাস করবে। আর পরকালে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তিনিই আমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন।

কোনো চোগলখোর সাহেব ইবনে আব্বাদের কাছে একটি চিঠি পাঠালো যে, যেই এতিম আপনার তত্ত্বাবধানে রয়েছে তার কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। যদি ওই সম্পদ কোষাগারে চলে যায় তাহলে ভালো।

ইবনে আব্বাদ চিঠির অপর পাশে লিখে দেন, চোগলখোরী অনেক খারাপ বিষয় যদিও তা সত্যই হোক না কেন। যদি তুমি এই চিঠি কল্যাণকামনায় লিখে থাকো তাহলে এর কারণে যে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে তা ওই ক্ষতির তুলনায় কম যা চোগলখোরী করার কারণে হয়ে থাকে। তোমার নসিহত আমি কবুল করবো না। যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে তাহলে এর শাস্তি দিতাম। হে মালাউন! মানুষের দোষ তালাশ করা থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ তাআলা গীবত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, এতিমকে ভালো প্রতিদান দান করুন। মৃত ব্যক্তির ওপর রহম করুন, চোগলখোরের ওপর অভিসম্পাত করুন।

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললো, আমি তোমাকে কিছু নসিহত করছি তা যদি অবলম্বন করো তাহলে মর্যাদা পাবে ও পাবে নেতৃত্ব। আর তা বাকি থাকবে যতদিন তুমি এই অভ্যাস ধরে রাখবে। প্রত্যেক নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তির সামনে নিজের অজ্ঞতা গোপন রাখবে। আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখবে। চোগলখোরী করবে না। তাদের মর্যাদাহানিকারীর কথা শুনবে না। যখন দুই জন পৃথক হবে তখন একজন অপরজনের মন্দ বিষয় বর্ণনা করবে না।

এক ব্যক্তি বলেন, চোগলখোরীর ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যা ও বিদ্বেষ এবং নিফাকের ওপর। আর এই তিনটি বিষয় লাঞ্ছনার কারণ।

মোটকথা, চোগলখোরী ত্যাগ করা উচিত। এর অনিষ্ট মারাত্মক হয়ে থাকে এবং কুফল বহু দূর পর্যন্ত গড়ায়। হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি গোলাম বিক্রয় করে ক্রেতাকে বলল, এর মধ্যে তেমন কোনো ত্রুটি নেই, তবে একটু চোগলখোরীর অভ্যাস আছে। ক্রেতা বলল, আমি এ ত্রুটি মেনে নিলাম। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর গোলাম একদিন মনিবের স্ত্রীকে বলল, আপনার স্বামী আপনাকে চান না। তিনি এখন অন্য একজন মহিলাকে ঘরে আনতে ইচ্ছুক। আমি একটি মন্ত্র জানি। আপনার স্বামী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ক্ষুর দিয়ে তার পিছনের কিছু চুল কেটে আনবেন। আমি তাতে মন্ত্র পড়ে দেব। এতে আপনার স্বামী আপনারই বশে থাকবে। মনিবের স্ত্রী গোলামের এ কথা বিশ্বাস করে নিল। সে স্বামীর নিদ্রার অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে ধূর্ত গোলাম মনিবকে গোপনে বলল, আপনার স্ত্রী অপর এক পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সুযোগমতো আপনাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটছে। যদি পরীক্ষা করতে চান, তবে ঘুমের বাহানায় বিছানায় শুয়ে থেকে লক্ষ করুন। মনিব তার কথায় নিদ্রার ভান করে বিছানায় শুয়ে রইল। স্ত্রী অপেক্ষায়ই ছিল। সে ক্ষুর নিয়ে স্বামীর দিকে অগ্রসর হলো। যখনই সে শিয়রের দিকে অগ্রসর হলো, স্বামী ভাবলো এ বুঝি গলা কাটতে আসছে। সে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে স্ত্রীকে হত্যা করল। তার শ্বশুরালয়ে খবর পৌঁছলে তারা এসে স্বামীকে হত্যা করল। এরপর এ হত্যাকাণ্ড স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্যে বিস্তার লাভ করলো। সামান্য একটু চোগলখোরীর কারণে কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল।

১৭. দ্বিমুখী কথা

যেমন এক ব্যক্তি পরস্পরে শত্রুভাবাপন্ন এমন দু' ব্যক্তির সাথে আলাদা আলাদা সাক্ষাৎ করে প্রত্যেকের সাথে তার পছন্দসই কথা বলে। এটা সাক্ষাৎ মুনাফিকি। আম্মার ইবনে ইয়াসির রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

দুনিয়াতে যার দু'রকম চেহারা হবে, কিয়ামতের দিন তার দু'টি আগুনের জিহ্বা হবে । (সুনানে আবি দাউদ : ৪৮৭৩)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পরকালে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে ওই ব্যক্তিকে দেখতে পাবে যে দ্বিমুখী। এই ব্যক্তির কাছে আসে ওই ব্যক্তির কথা নিয়ে আর ওই ব্যক্তির কাছে যায় এই ব্যক্তির কথা নিয়ে।

আরেক ভাষায় বলা যায়, যে ব্যক্তি প্রথম জনের কাছে আসে এক চেহারা নিয়ে আর দ্বিতীয় জনের কাছে যায় আরেক চেহারা নিয়ে। (সহিহ বুখারী : ৩৪৯৪)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দ্বিমুখী ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে আমানতদার নয়। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ২৮৯)

মালেক ইবনে দীনার বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি যে ব্যক্তি দ্বিমুখী হবে, তার আমানতদারিতা বাতিল। আল্লাহ তাআলা দ্বিমুখী ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিবেন। (মাসাবিউল আখলাক : ২৯১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী এবং যারা অন্তরে তাদের ভাইদের জন্য বিদ্বেষ পোষণ করে। যখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তোষামোদ করে এবং ওই সব ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হলে বিলম্ব করে, আর যদি শয়তানি কাজে ডাকা হয় তাহলে দ্রুত ধাবিত হয়। (মাসাবিউল আখলাক : ২৯৯)

ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা কখনো ইম্মাআ হবে না। লোকেরা বলল ইম্মাআ কী? তিনি বললেন, দ্বিমুখী হবে না। (মাসাবিউল আখলাক : ৩০১)

সকলেই একমত যে, দুইজনের সাথে দ্বিমুখী চেহারায় কথা বলা নিফাক। নিফাকের অনেক আলামত রয়েছে আর এটাও তার মধ্যে একটি।

বর্ণিত আছে, এক সাহাবি মৃত্যুবরণ করলে হুযাইফা (রা) তার জানাযার নামায পড়লেন না। তাই ওমর (রা) বললেন, হে হুযাইফা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবি মারা গেলেন আর তুমি তার জানাযা পড়লে না! হুজাইফা (রা) বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! সে তাদের মধ্যে থেকে (অর্থাৎ মুনাফিকদের), এরপর ওমর (রা) তাকে কসম দিয়ে বললেন, আমি কি তাদের দলভুক্ত? তিনি বললেন, না আপনার পরে তার ব্যাপারে আশঙ্কা রয়েছে। (মাসাবিউল আখলাক : ৩১১)

যদি প্রশ্ন করা হয় দ্বিমুখীর পরিচয় কী?

এর উত্তর হচ্ছে, এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করল এবং উভয়ের সাথেই সুন্দর কথা বলল এবং যা বলেছে সত্য বলেছে তাহলে এই ব্যক্তি দ্বিমুখী হবে না এবং মুনাফিকও হবে না। কেননা, দুই শত্রুর মাঝে উত্তম কথার মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব। যদিও এ ধরনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না। কেননা, বাস্তব বন্ধুত্বের দাবি হচ্ছে বন্ধুর দুশমনের সাথে দুশমনি রাখবে। যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যদি এক জনের কথা আরেকজনের কানে লাগায় তাহলে দ্বিমুখী হবে।

দ্বিমুখী চোগলখোর থেকে ও ক্ষতিকারক। কেননা, চোগলখোর তো একজনের কথা নিয়ে ফাসাদ সৃষ্টি করে আর দ্বিমুখী ব্যক্তি তো উভয়ের কথার মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করে।

এমনিভাবে দ্বিমুখী হওয়ার জন্য একজনের কথা আরেক জনের কাছে পৌঁছানো শর্ত নয়; বরং যদি প্রত্যেক দলের তার বিরোধীর সাথে দুশমনির কারণে প্রশংসা করে এবং তাকে সহায়তা করার আশ্বাস ও নিশ্চয়তা দেয় তো এটাও দ্বিমুখী আচরণ। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রশংসা করা আর অনুপস্থিতিতে দোষ বর্ণনা করা এটাও দ্বিমুখিতা। এক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে চুপ থাকা অথবা সত্য প্রশংসা করা।

ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে লোকেরা বলল, আমরা যখন আমিরদের দরবারে যাই তখন যেসব কথা বলি তা আমরা বাহিরে এসে বলি না। এরপর ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমরা এটাকে রাসূলের যুগে নিফাক হিসেবে গণ্য করতাম। (মাসাবিউল আখলাক : ৩০২)

যদি কোনো ব্যক্তির আমিরদের দরবারে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরও কোনো কারণে যেতে হয়েছে এবং তার ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত ছিল এবং তার প্রশংসা, তোষামোদি করে তাহলে এটা নিফাক হবে। কেননা, সে নিজেকে ইচ্ছা করে এই মিথ্যার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। যদি সে অল্পেতুষ্ট হতো তাহলে তার আমিরের দরবারে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না আর মিথ্যা প্রশংসা ও কথা বলারও প্রয়োজন পড়তো না। এটা স্পষ্ট নিফাক, এই অর্থই উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই হাদিসের,

حُبُّ الْمَالِ وَالْجَاهِ يُنْبِتَانِ فِي الْقَلْبِ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.

সম্পদ ও মর্যাদার লোভ অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে যেমনি পানি শস্য উদগত করে।

তবে যে ব্যক্তি ওই আমির ও হাকেমের দরবারে প্রয়োজনের কারণে যায় এবং কিছু প্রশংসাও করে। তাহলে সে মুনাফিক হবে না। এক্ষেত্রে তাকে অপারগ গণ্য করা হবে। কেননা ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা জায়েয।

আবু দারদা (রা) বলেন, আমরা অনেক সময় লোকের সামনে তার প্রশংসা করি, কিন্তু অন্তরে তার ব্যাপারে ঘৃণা পোষণ করি। (এটা তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য)। (সহিহ বুখারী : ৬১৩১; শুআবুল ঈমান : ৭৭৪৯)

আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে আসার অনুমতি চাইলো। বললেন, তাকে অনুমিত দাও। সে ছিল সমাজের খারাপ ব্যক্তি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তার সাথে নরম ভাষায় কথা বললেন, যখন সে চলে গেল আয়েশা (রা) বললেন, সে তো নরম কথা পাওয়ার যোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

يَا عَائِشَةُ! اِنَّ شَرَّ النَّاسِ الَّذِىْ يُكْرِمُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ.

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে যার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার সম্মান করে। (সহিহ বুখারী : ৬০৫৪)

কিন্তু এই বলার অনুমতি হাসি মজাকের ক্ষেত্রে, মিথ্যা প্রশংসার ক্ষেত্রে জায়েয নয়। এভাবে বললে তা স্পষ্ট মিথ্যা হয়ে যাবে। আর স্পষ্ট মিথ্যা কঠিন প্রয়োজন ছাড়া বলা যাবে না। অথবা বাধ্য করার ক্ষেত্রে, তখন মিথ্যা বলা জরুরি হয়ে যায়। যার বিস্তারিত আলোচনা মিথ্যার মুসিবতের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বরং বাদশাহ বা আমিরের বাতিল ও মিথ্যা কথায় মাথা নাড়িয়ে সাড়া দেওয়াও নিফাকের কাজ এবং সামর্থ্য থাকলে নিষেধ করবে নতুবা চুপ থাকবে।

১৮. বেহুদা প্রশংসা

এটাও কিছু জায়গায় নিষিদ্ধ। প্রশংসার মধ্যে ছয়টি বিপদ আছে। তন্মধ্যে চারটি যে প্রশংসা করে তার সাথে এবং দু'টি যার প্রশংসা করা হয় তার সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশংসাকারীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত চারটি বিপদ

এক. প্রশংসায় এত বাড়াবাড়ি করা যে, তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে যায়। খালিদ ইবনে মেদান বলেন, যে ব্যক্তি জনসম্মুখে কারও এমন বিষয়ে

প্রশংসা করে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন তোতলা করে উঠাবেন।

দুই. প্রশংসার মধ্যে কখনো রিয়ার প্রাধান্য থাকে। যেমন, প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। কিন্তু ওইক্ষেত্রে অন্তরে তার মুহাব্বত মোটেই থাকে না। ফলে সে রিয়াকার ও মুনাফিক হয়ে যায়।

তিন. প্রশংসায় কতক গুণ এমন বর্ণনা করা, যেগুলো প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে আছে কি না সে সম্পর্কে সে জ্ঞাত নয়। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি ধ্বংস হও, তুমি তো তোমার ভাইয়ের ঘাড় ভেঙে দিয়েছো। যদি সে শুনে থাকে তাহলে সে সফলকাম হবে না। এরপর বললেন, যদি কারও প্রশংসা করতে হয় তাহলে বলবে আমি তাকে ভালো মনে করি এবং আল্লাহর ওপর কারো তাযকিয়া (প্রশংসা) করি না। আল্লাহই সম্যক জ্ঞানী আর এভাবে তখনই বলবে যখন সে এভাবে তার ব্যাপারে জানে। (সহিহ বুখারী : ৬০৬১) যেমন কাউকে মুত্তাকি, পরহেযগার, দরবেশ ইত্যাদি বলে প্রশংসা করা। এ ধরনের গুণাবলি অপ্রকাশ্য এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যদি বলে, তাকে রাতে নামায পড়তে দেখেছি, সে সদকাও করে, হজও করে। এসব বিষয় সুনিশ্চিত এভাবে বললে সমস্যা হবে না।

এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, কারও সম্পর্কে বলা 'সে আদেল' হবে না। কেননা তা গোপন বিষয়। কাজেই সুদৃঢ়ভাবে আদেল জানার পরই বলা উচিত। নতুবা মুসিবতে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে অপরের প্রশংসা করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে সফর করেছ? কখনো ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করেছ? কিংবা সে কি তোমার প্রতিবেশী? লোকটি আরজ করল, এর কোনোটিই হয়নি। তিনি বললেন তাহলে তুমি তার প্রশংসা করো না।

চার. যার প্রশংসা করা হয় সে জালেম ও ফাসেক, তারপরও প্রশংসা করে তাকে খুশি করা হয়। এটা নাজায়েয। হাদিসে এসেছে, যখন ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তাআলা রেগে যান। হাসান বসরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি জালেমের দীর্ঘায়ুর জন্য দুআ করে, সে যেন কামনা করছে, আল্লাহর জমিনে আরও বেশি জুলুম হোক।

প্রশংসিত ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত দু'টি বিপদ

এক. প্রশংসার ফলস্বরূপ তার মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়। এগুলো মারাত্মক দোষ।

হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, একবার ওমর (রা) দোররা নিয়ে বসেছিলেন এবং সভাসদগণ তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় জারুদ ইবনে মুনযির আগমন করল। এক ব্যক্তি বলল, তিনি তো রবিয়া গোত্রের সরদার। কথাটি সকলেরই শ্রুতিগোচর হলো। জারুদ নিকটে এলে ওমর (রা) তাকে দোররা দিয়ে আস্তে আস্তে প্রহার করলেন। সে আরজ করল, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, তুমি শুননি, তোমার সম্পর্কে লোকটি কী বলেছে? জারুদ বলল, শুনেছি তো। তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা হলো, তুমি এতে আত্মম্ভরী হয়ে যাবে। তাই তোমার অহংকার হ্রাস করার জন্য আমি এ কাজ করেছি।

দুই. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন প্রশংসা দ্বারা জানবে, সে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে গেছে, তখন আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে অলসতা করবে। কেননা, উন্নতি সাধনের চেষ্টা সে-ই করে, যে নিজের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে জানে, কিন্তু যখন মানুষের মুখে প্রশংসাই শুনবে, তখন নিজের সম্পর্কে কামেল হওয়ার ধারণা করে নেবে এবং আমল করার প্রয়োজন বোধ করবে না। এ কারণেই এক হাদিসে প্রশংসাকারীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তুমি তোমার বন্ধুর গলা কেটে দিয়েছ। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৫১)

অন্য এক হাদিসে আছে,

إِذَا مَدَحْتَ اَخَاكَ فِيْ وَجْهِهٖ فَكَاَنَّمَا اَمْرَرْتَ عَلٰى حَلْقِهٖ مُوْسًى رَمِيْضًا.

তুমি তোমার ভাইয়ের প্রশংসা তার মুখের উপর করে তার গলায় যেন ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছ। (আযযুহদ : ৫২)

এমনিভাবে ওই ব্যক্তিকে বলেছেন যে অন্যের প্রশংসা করেছে, তুমি ওই ব্যক্তিকে জবাই করেছ আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। (আল আদাবুল মুফরাদ : ৩৩৫)

মুতাররিফ বলেছেন, যখনই কারো মুখে আমার প্রশংসা শুনেছি তখন আমি আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে গেছি। আর আত্মা লাঞ্ছিত হয়ে গেছে।

ইয়াযিদ ইবনে আবি মুসলিম (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রশংসা শুনে, শয়তান তাকে অহংকারে ফেলে দেয়। কিন্তু মুমিন এ থেকে সুরক্ষিত থাকে। (আযযুহদ : ২১৩)

ইবনুল মুবারক বলেন, মুতাররিফ ও ইয়াযিদ (র) যা বলেছে তা যথার্থ। তবে ইয়াযিদের মন্তব্য সাধারণের অন্তরের অবস্থা আর মুতাররিফের মন্তব্য বিশেষ লোকদের অন্তরের অবস্থা। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ প্রশংসায় ধোঁকা খেয়ে যায়। (আদাবুন নুফূস : ৭৩)

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَوْ مَشٰى رَجُلٌ إِلٰى رَجُلٍ بِسِكِّيْنٍ مُرْهَفٍ كَانَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيْ وَجْهِهٖ.

কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে ধারালো ছুড়ি নিয়ে যাওয়া তার সামনে প্রশংসা করা থেকে উত্তম। (আদাবুন নুফূস : ১০০)

ওমর (রা) বলেন, প্রশংসা হচ্ছে জবাই করা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ২৬৭৮৮) কেননা যাকে জবাই করা হয় সে সমুদয় কাজ থেকে অকার্যকর হয়ে পড়ে। প্রশংসাও ঠিক তেমনই, যার প্রশংসা করা হয় সে আমল থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে, প্রশংসা অন্তরে অহংকার ও আত্মপ্রীতি সৃষ্টি করে যা জবাইয়ের ন্যায় কার্যক্ষমতা বন্ধ করে দেয়। এদিক থেকেই তাশবিহ (মিল) দেওয়া হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, প্রশংসা যদি এসব অনিষ্ট থেকে মুক্ত হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই; বরং এরকম প্রশংসা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। আবু বকরের শানে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لَوْ وُزِنَ اِيْمَانُ اَبِيْ بَكْرٍ بِاِيْمَانِ الْعَالَمِيْنَ لَرَجَحَ.

যদি আবু বকরের ঈমান সারাবিশ্বের মানুষের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে তাঁর ঈমানই ভারী হবে। (কামাল : ৪ : ২০১)

ওমর (রা) সম্পর্কে তিনি বলেন,

لَوْلَمْ اُبْعَثْ لَبُعِثْتَ يَا عُمَرُ.

যদি আমি নবী না হতাম তবে হে ওমর! তুমি নবী হতে। (ফাযায়েলে সাহাবী : ৬৭৬)

এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কী হতে পারে? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) অন্তর্চক্ষু দিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, এ প্রশংসায় কোনো কুফল দেখা দেবে না।

ব্যক্তির নিজের প্রশংসা নিজেই করা খুবই খারাপ। কেননা, এতে অহংকার ও বড়ত্ব ভাব সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ.

আমি বনি আদমের সরদার এতে কোনো অহংকার নেই। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪৩০৮)

আমি একথা অহংকার করে বলছি না যেমনটি মানুষ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর গর্ব ছিল আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্যের অর্জনে। একারণে নয় যে, তিনি বনি আদমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন বাদশাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে গর্ব এজন্য করা যে, সে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, এজন্য নয় যে, অনেক প্রজার উপর শ্রেষ্ঠ।

এই বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, হাদিসে প্রশংসার নিন্দা কেন করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এর তারগিব (উৎসাহ) কেন দেওয়া হয়েছে।

এক বর্ণনায় আছে, কিছু লোক কোনো এক মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, وُجِبَتْ (অর্থাৎ জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।) (সহিহ বুখারী : ১৩৬৭)

এর দ্বারা বোঝা গেল, অপরের ভালো আলোচনাই করা উচিত। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিদের। কেননা, মুমিনদের শাহাদাতের ফলে তাদের মর্যাদা আরও বেড়ে যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন, বনি আদমের সাথে ফেরেশতা লেগে থাকে। যখন এক ভাই আরেক ভাইয়ের কল্যাণের কথা বলে। তখন ফেরেশতা বলে আল্লাহও তোমাকে কল্যাণ দান করুন। আর যখন ভাইয়ের দোষ বর্ণনা করে তখন ফেরেশতা বলেন, হে বনি আদম! তোমার দোষ তো গোপন! সুতরাং ক্ষান্ত করো এবং তোমার দোষ গোপন রাখার কারণে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। (আস সামতু ও আদাবুল লিসান : ৬১৫)

প্রশংসিত ব্যক্তির করণীয়

নিজের প্রশংসা শোনার পর চিন্তা করবে, জীবনের শেষ মুহূর্তটি খুব নাজুক ও বিপদসংকুল। কোনো আমলের উপর নির্ভর করা যায় না। রিয়া ইত্যাদি কত প্রকারের বিপদাশঙ্কা রয়ে গেছে। এরপর নিজের দোষ সম্পর্কেও চিন্তা করবে, যা সে নিজে জানে এবং প্রশংসাকারী জানে না। নিজের রহস্য ও অন্তরের অবস্থা চিন্তা করলে সে বাধ্য হয়ে প্রশংসাকারীকে বিরত রাখবে এবং তাকে অপদস্থ করবে।

হাদিসে আছে,

أُحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ.

প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো। (সহিহ মুসলিম : ৩০০২)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানে, প্রশংসা তার জন্য অনিষ্টকর হয় না। জনৈক মনীষী নিজের প্রশংসা শুনে বললেন, হে আল্লাহ! এরা আমার হাল অবস্থা জানে না, কিন্তু তুমি জানো। কেউ আলী (রা)-এর প্রশংসা করলে তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! যে বিষয় তারা জানে না এবং আমার সাথে করে, সেজন্য তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করো না। আমাকে মাফ করো এবং তাদের ধারণার চেয়েও ভালো করো। (তারিখে দিমাশক : ৩০ : ৩২২)

এক ব্যক্তি ওমর (রা)-এর প্রশংসা করলে ওমর (রা) বললেন, তুমি কি আমাকে ধ্বংস করবে এবং তোমার নিজেকেও ধ্বংস করবে?

অপর এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর সামনে তার প্রশংসা করলো। অপরদিকে তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, সে তার ওপর চড়াও হবে। এরপর আলী (রা) বললেন, তুমি মুখে যা বলছ আমি তার থেকে নীচে আর তোমার অন্তরে যা রয়েছে তার উপরে।

১৯. কথাবার্তার মাঝে সূক্ষ্ম ভুলভ্রান্তি

সাধারণত আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আলেমগণ সঠিক ভাষায় ও সতর্কতার সাথে কথাবার্তা বলে। মূর্খ জনসাধারণ এসব ক্ষেত্রে ভুল করে বসে। কিন্তু মূর্খতার কারণে এমন করা হয় বিধায় আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

হুযায়ফা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ.

তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে— যা আল্লাহ চান ও আপনি চান; বরং এমন বলা উচিত, যা আল্লাহ চান, অতঃপর আপনি চান। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৮০)

এ হাদিসের বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার চাওয়ার সাথে অন্যকে শরিক করে বলা যাবে না যে, আল্লাহ ও আপনি চাইলে এমন হবে। কারণ, এতে অসম্মান ও বেআদবি হয়। এভাবে বলা উচিত, আল্লাহর ইচ্ছা সর্বাগ্রে, এরপর আপনার ইচ্ছা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলল, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) চান। তিনি বললেন, তুমি আমাকে আল্লাহর সাথে শরিক করছ? বরং এভাবে বল, যা আল্লাহ একাই চান। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে খুতবা দিচ্ছিল এই বলে যে,

مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ... فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى.

এরপর রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, বলো

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ..فَقَدْ غَوٰى এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) তার কথা وَمَنْ يَعْصِهِمَا এভাবে বলাকে অপছন্দ করেছেন, কেননা তা বাড়াবাড়ি ও শরিক বোঝায়। (সুনানুল কুবরা, সুনানে নাসায়ী : ১০৭৫৯)

ইবরাহিম (র) বলেন, 'আল্লাহর আশ্রয় ও আপনার আশ্রয়' এ কথা বলাও ঠিক নয়; বরং একথা বলা জায়েয, আল্লাহর আশ্রয় এরপর আপনার আশ্রয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে অপছন্দ করেছেন যে, اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ হে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে আযাদ (মুক্ত) করুন। এর কারণ হচ্ছে আযাদ করা দোযখে প্রবেশ করার পর হয়ে থাকবে তাই শুধু শুধু কেন এই শব্দ বলবো আর এভাবেই বা কেন বলবো না 'হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন বা বাঁচান।'

এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ আপনি আমাদের ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের কিয়ামতের দিন রাসূলের সুপারিশ নসিব হবে।

হুযাইফা (রা) বলেন, মুমিনদের রাসূলের সুপারিশের প্রয়োজন পড়বে না বরং তাঁর সুপারিশ উম্মতের গুনাহগারদের জন্য হবে।

ইবরাহিম (র) আরও বলেন, যে ব্যক্তি অন্যকে গাধা বলে সম্বোধন করে, কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে— বল, আমি কি তাকে গাধা সৃষ্টি করেছিলাম? তুমি তাকে গাধা বললে কেন?

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু লোক আছে যারা কথায় কথায় শিরক করে। যেমন তারা বলে, এ কুকুরটি না থাকলে আজ রাতে সবকিছু চুরি হয়ে যেত। তারা সত্যিকার রক্ষাকারীর প্রতি খেয়াল করে না।

ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যদি কসম খেতেই হয় তাহলে আল্লাহর নামে কসম খাও। নতুবা চুপ থাকো। ওমর (রা) বলেন, এরপর আমি কখনো বাপ-দাদার নামে কসম করিনি। (সহিহ বুখারী : ৬৬৪৭; সহিহ মুসলিম : ৩ : ১৬৪৬)

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা আঙুরকে كرم (কারম) বলো না। কেননা 'কারম' হচ্ছে মুসলমান ব্যক্তি। (সহিহ বুখারী : ৬১৮৩, সহিহ মুসলিম : ২২৪৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ যেন "আমার বান্দা" ও "আমার বান্দি" না বলে। কারণ, সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং সকল বান্দীও তাঁরই। এক্ষেত্রে "আমার গোলাম" বলা উচিত। গোলামও তার প্রভুকে "রব" (পালনর্কতা) বলবে না; বরং প্রভু ও সরদার বলবে। কেননা, সকলের পালনকর্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআলা। (সহিহ বুখারী : ২৫৫২; সহিহ মুসলিম : ২২৪৯)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَّكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ.

তোমরা মুনাফিকদের সাইয়্যেদ বলো না, কেননা সে যদি তোমাদের নেতা হয় তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৭৭)

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে আমি ইসলাম থেকে মুক্ত, সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে যা বলেছে তাই হবে আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে নিরাপদে ইসলামে আর ফিরে আসতে পারবে না। (সুনানে আবি দাউদ : ৩২৫৮)

এ ধরনের আরও বহু আলোচনা রয়েছে তা সব এক লেখায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

আমি যেসব বিষয় آفَاتُ اللِّسَانِ (জিহ্বার বিপদাপদ) পর্বে আলোচনা করেছি সেগুলো থেকে বোঝা যায় মুখকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে মুসিবত থেকে নিরাপদে থাকা যাবে না এবং এর দ্বারা রাসূলের বাণী, مَنْ صَمَتَ نَجَا যে চুপ থাকে সে মুক্তি পায়—(জামে তিরমিযী : ২৫০১)-এর গুরুত্ব বোঝে আসে। এই মুসিবতগুলো ধ্বংসাত্মক। সুতরাং মুখ সংযত রাখার মাধ্যমে ওই সব মুসিবত থেকে বেঁচে থাকা যাবে। আর যদি মুখ উন্মুক্ত রাখা হয় তাহলে শঙ্কার মধ্যে পতিত হবে। তবে যদি শুদ্ধভাষী অগাধ জ্ঞান, পরহেযগারি, মুরাকাবা এবং নিয়ন্ত্রিত কথা বলার গুণ অর্জন করে তাহলে সেক্ষেত্রে এসব মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। এরপরও শঙ্কা থেকে যায়। সুতরাং তুমি যদি ওই ব্যক্তির মতো হতে না পারো, যে কথা বলে সফলকাম হয়েছে তাহলে ওই ব্যক্তির মতো হও যিনি চুপ থেকে নিরাপদ থেকেছে। নিরাপদ থাকাও এক ধরনের সফলতা ও গনিমত।

২০. জনসাধারণের জিজ্ঞাসা

আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও কালাম নিত্য না অনিত্য— এ জাতীয় প্রশ্ন সাধারণ মানুষের করা উচিত নয়। বরং কুরআনে যে সকল আদেশ নিষেধ রয়েছে, সেগুলো মেনে চলাই তাদের কাজ। তবে এটা মনের উপর কঠিন, এবং অনর্থক কথাবার্তা খুব সহজ মনে হয়। সাধারণ মানুষ অনধিকার চর্চা করে আনন্দ পায়। কারণ, শয়তান তাদের মনে এ ধারণা পাকাপোক্ত করে দেয় যে, তারা আলেম ও জ্ঞানীজন। অথচ তাদের মুখ দিয়ে অজ্ঞাতে কিছু কিছু কুফরি কালেমাও উচ্চারিত হয়ে যায়। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, কুরআন মাজিদে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনা এবং ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। কুরআনে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেগুলো ইবাদতের

সাথে সম্পৃক্ত নয়, সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও তর্ক-বিতর্ক করা বেআদবি। এতে কুফরের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন সূক্ষ্ম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম, সে ওই বিষয়ে মূর্খদের স্তরে পরিগণিত হবে এবং শাস্তিযোগ্য ও নিন্দনীয় হবে। এ কারণেই হাদিসে বলা হয়েছে—

ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

আমি যে বিষয়ে কথা বলা পরিহার করেছি, তা আমার মধ্যেই সীমিত থাকতে দাও। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা অযথা প্রশ্ন করেছে, নবীদের সাথে মতবিরোধ করেছে। আমি যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি, তা থেকে বেঁচে থাকো এবং যা করতে হুকুম করি, তা যথাসাধ্য পালন করো। (সহিহ বুখারী : ৭২৮৮)

আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে এত বেশি প্রশ্ন করতে লাগল যে, তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে মিম্বরে উঠে বললেন, যত ইচ্ছা প্রশ্ন করো। আমি জবাব দেব। তখন এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আমার পিতা কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযায়ফা। এরপর আরও দু'ভাই দাঁড়িয়ে প্রশ্ন রাখল, আমাদের পিতা কে? তিনি বললেন, যার সন্তান বলে তোমরা কথিত হও সে-ই তোমাদের পিতা। অতঃপর আরও একজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি জান্নাতে যাব, না জাহান্নামে? তিনি বললেন, জাহান্নামে। যখন সকলেই তাঁর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি বুঝতে পারল, তখন সকলে চুপ হয়ে গেল। কারও প্রশ্ন করার সাহস হলো না। ওমর (রা) আরজ করলেন,

رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا.

আল্লাহ আমাদের রব! ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (স) আমাদের নবী— এতেই আমরা সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ওমর! তুমি বসে যাও। মনে হয় তুমি তাওফিকপ্রাপ্ত। (সহিহ বুখারী : ৯৩)

অন্য এক হাদিসে রাসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেন, আমার মনে হয় লোকেরা বেশি প্রশ্ন করতে করতে একপর্যায়ে বলতে শুরু করবে, মানুষকে

তো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এমন প্রশ্ন কখনো মনে জাগলে তোমরা সূরা ইখলাস পড়ে বাম দিকে তিন বার থুতু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৭২২)

মূসা ও খিযির (আ)-এর ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যখন তখন যেখানে সেখানে প্রশ্ন করা মোটেই উচিত নয় এবং যে বিষয় বোঝার মতো বোধশক্তি নেই, তা কখনো জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। কুরআন শরিফে বর্ণিত হয়েছে, (সূরা কাহাফ : ৭০) মূসা (আ) খিযিরের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, স্বেচ্ছায় না বলা পর্যন্ত তিনি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। এরপর প্রথমে নৌকার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেই খিযির (আ) ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মূসা (আ) ওযর পেশ করলেন, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন। আর জিজ্ঞেস করব না, কিন্তু যখন তিন বার এমন হলো তখন খিযির (আ) বলতে বাধ্য হলেন,

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ.

এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত। (সূরা কাহফ : ৭৮)

এরপর তিনি মূসা (আ)-কে ছেড়ে চলে গেলেন।

মোটকথা, জনসাধারণের জন্য অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা খুবই খারাপ। এ থেকে অনেক অনর্থক বিষয় গজিয়ে উঠে। সুতরাং তাদেরকে বিরত রাখাই যথাযথ।

তাদের কুরআনের হরফ নিয়ে নিমগ্ন হওয়া এমন যেমন কোনো ব্যক্তি বাদশাহের নির্দেশ পালন করার পরিবর্তে তার চিঠির উপর চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল অথবা শব্দ ও বাক্যের গবেষণায় লিপ্ত হয়ে গেল অথচ তার দায়িত্ব ছিল কাজ করা, কিন্তু সে তা বাদ দিয়ে এমন কাজে লিপ্ত হয়েছে যার জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আর এমন ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই শাস্তির যোগ্য। এমনিভাবে সাধারণ ব্যক্তির কুরআনের হদ ও এর হরফ হাদেস না কাদিম এবং আল্লাহর গুণাবলি নিয়ে গবেষণা করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধের নিন্দা

ভূমিকা

সব প্রশংসাই আল্লাহর, অসুখী ব্যক্তিরা যাঁর ক্ষমা ও দয়ার প্রতীক্ষায় আছে। ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাঁর ক্রোধ ও দাপট থেকে সতর্ক থাকে। যিনি তাঁর বান্দাদের ধীরে পাকড়াও করেন।

তাদের দেহে প্রবৃত্তির তাড়না দিয়ে তাদেরকে প্রবৃত্তির ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন।

তাদেরকে ক্রোধের স্বভাব দিয়ে ক্রোধকে সংবরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের সমস্ত জীবনকে অন্যায় অপছন্দনীয় বস্তুর স্বাদ দিয়ে পূর্ণ করে বলেছেন, আমি দেখতে চাই কে কোনটা বেছে নেয়।

তাদেরকে নিজ-ভালোবাসার পরীক্ষায় ফেলেন; যাতে দেখতে পারেন কে তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে।

মানুষকে তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, গোপনে কর বা সবার সামনে, আমি কোনো কিছু সম্পর্কেই অনবহিত নই।

তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, হঠাৎ সবার অগোচরে আচমকা তিনি সবাইকে পাকড়াও করবেন। তিনি ইরশাদ করেন,

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ.

তারা কেবল অপেক্ষায় আছে এক ভয়াবহ শব্দের, যা তাদের আঘাত করবে তাদের তর্কবিতর্কের সময়। তখন তারা শেষ অসিয়তটুকুও করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরেও যেতে পারবে না। (সূরা ইয়াসিন : ৪৯-৫০)

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর। যিনি হলেন নবীদের সর্দার। যাঁর নেতৃত্বে চলবেন সকল নবী ও রাসূল। সেই সাথে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী পরিবার ও তাঁর সহচরদের ওপর।

মনে রাখবে, ক্রোধের স্বরূপ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যার প্রকৃতি হচ্ছে এ আয়াত,

نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.

আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, যা মনের ওপর উঁকি মারে। (সূরা হুমাযাহ : ৬-৭)

আগুন যেমন ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে, তেমনি ক্রোধের আগুন অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে প্রচ্ছন্ন থাকে। চকমকি পাথরে ঠোকা লাগতেই যেমন আগুন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি অহংকারের সামান্যতম আঘাতেই ক্রোধের আগুন অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরা ঈমানের নূরের সাহায্যে এ কথা আবিষ্কার করেছেন, মানুষের মধ্যে এমন একটি শিরা আছে, যা শয়তানের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা ক্রোধানলের পরশ পেয়ে দপ করে জ্বলে ওঠে এবং সত্যের সামনে নুয়ে পড়ে। তার বংশগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তা শয়তানের সাথে পাকাপোক্ত। শয়তান বলেছিল,

خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ.

আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আরাফ : ১২)

মাটির স্বভাব হচ্ছে স্থির ও গম্ভীর থাকা। পক্ষান্তরে আগুনের স্বভাব প্রজ্বলিত এবং লেলিহান শিখা হয়ে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হওয়া। রাগের মুহূর্তে যখন মানুষ অস্থির হয়, তখন মনে হয় যেন মাটি দিয়ে সৃষ্টি নয়; বরং শয়তানের মতো তার খামিরও আগুন।

ক্রোধের ফল হচ্ছে হিংসা ও বিদ্বেষ। অর্থাৎ শত্রুতা ও অপরের অকল্যাণ কামনা করা। ক্রোধ ও হিংসা দ্বারা বহু মানুষ ধ্বংস হয়েছে। তাই ধ্বংসের স্থান বলে দেওয়া অত্যাবশ্যক, যাতে এগুলো থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করে এবং অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে অন্তরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। কারণ, মন্দ বিষয় সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত মানুষ তাতে লিপ্ত থাকে। শুধু মন্দ বিষয় জানাই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় না জানা হয়।

আমরা এ পর্বে বর্ণনা করব, রাগের নিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে সৃষ্ট বিপদাপদ। মূল শিরোনাম থাকবে, ক্রোধের নিন্দনীয়তার বিবরণ। তারপর একে একে আসবে ক্রোধের স্বরূপ। আত্মসাধনার মধ্যেমে ক্রোধকে কি সমূলে বিলোপ করা যায় না-কি যায় না? ক্রোধ জাগার কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লে তার থেকে পরিত্রাণের উপায়। ক্রোধ সংবরণের ফযিলত। সহনশীলতার ফযিলত। কথার জবাবে কতটুকু কথা বলা যাবে। বিদ্বেষ ও তার পরিণাম সম্পর্কে মতামত। ক্ষমা ও কোমলতার ফযিলত। হিংসার নিন্দনীয়তা, হিংসার বাস্তবতা, তার কারণ ও প্রতিকারের উপায়। হিংসা দূর করার অপরিহার্যতা। নিজের সমকক্ষ, আত্মীয়স্বজন, চাচাতো ভাইদের সাথে হিংসার আচরণ বেশি ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কম হওয়ার কারণ। অন্তর থেকে হিংসা বিতাড়নের দাওয়াই। অন্তর থেকে হিংসা দূর করার অপরিহার্য পরিমাণ।

এ বিষয়গুলো নিয়ে সামনে আমি আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহই তাওফিকদাতা।

জেদ ও ক্রোধের পরিণতি

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

যখন কাফেররা তাদের অন্তরে পোষণ করল অহমিকা, জাহেলি যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন। (সূরা ফাতহ : ২৬)

এ আয়াতে কাফেরদের এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নিন্দা করেছেন যে, তারা অন্যায় জেদের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে মিথ্যার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ক্রোধেরই আরেক নাম জেদ। আল্লাহ তাআলা স্থিরচিত্ততা ও গাম্ভীর্য নাযিল করার কথা বলে মুমিনদের প্রশংসা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বলল, আমাকে সামান্য আমল বলে দিন। তিনি বললেন, لَاتَغْضَبْ অর্থাৎ রাগান্বিত হবে না। (সহিহ বুখারী : ৬১১৬)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, আমার জন্য বোধগম্য হয় এমন অল্প কিছু আমাকে আপনি বলুন। তিনি বললেন, রাগ করো না।

আমি আরও দুবার এই প্রশ্ন করলাম। প্রত্যেকবার তিনি একই জবাব দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কীসে আমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, তুমি নিজে রাগ করো না। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা অপরাজেয় পাহলোয়ান কাকে মনে কর? সকলেই আরজ করলেন, এরূপ ব্যক্তিকে মনে করি, যে কুস্তিতে কারও সাথে পরাজিত হয় না। তিনি বললেন, সে পাহলোয়ান নয়। বীর পাহলোয়ান সে ব্যক্তি, রাগের সময় যে নিজেকে দমিয়ে রাখে। (সহিহ বুখারী : ৬১১৪; সহিহ মুসলিম : ২৬০৯)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ.

যে নিজের রাগ দমন করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখেন। (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১২ : ৩৪৬-৩৪৭; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ৩৪৮)

সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বলেন, বৎস, অত্যধিক রাগ করা থেকে বেঁচে থাকা চাই। কারণ, অত্যধিক রাগ অন্তরকে হালকা করে দেয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৭০)

أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর বাণীর সমার্থক, নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। (সূরা আলে ইমরান : ৩৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমা (র) বলেন, এখানে নেতা বলে এমন নেতা উদ্দেশ্য, ক্রোধের ওপর যাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। (তাফসিরে তাবারি : ৩ : ৩ : ৩২৮)

আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, কখনো ক্রুদ্ধ হয়ো না। (মুসনাদুশ শামিয়্যিন, তাবারানি : ২১; মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ২৩৭৪)

ইয়াহইয়া (আ) ঈসা (আ)-কে বলেন, কখনো রাগ করো না।

ঈসা (আ) বললেন, আমি মানুষ। আমার পক্ষে কখনো রাগ না করে থাকা সম্ভব নয়। ইয়াহইয়া (আ) বললেন, তাহলে কখনো সম্পদ সঞ্চয় করো না। ঈসা (আ) বললেন, এটা করা সম্ভব। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৩৮৬)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, মাকাল ফল যেমন মধুর স্বাদ নষ্ট করে ফেলে, ক্রোধও তেমনি ঈমান নষ্ট করে ফেলে। (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৯ : ৪১৭; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৭৪১)

কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে কঠিন জিনিস কী? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর ক্রোধ।

লোকটি জানতে চাইলো, কোন জিনিস আমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে? তিনি বললেন, তুমি কখনো ক্রুদ্ধ হয়ো না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ক্রোধ মানুষকে জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

হাসান বসরী (র) বলেন, আদম সন্তান রাগবশত এমন লাফালাফি করে যে, মনে হয় এবারের লাফে দোযখে পড়ে যাবে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৬)

একবার জুলকারনাইনের সাথে এক ফেরেশতার সাক্ষাৎ হলো। তিনি ফেরেশতার কাছে জানতে চাইলেন, আমাকে এমন কোনো বিষয় শিক্ষা দিন যা আমার ঈমান ও ইয়াকিন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

ফেরেশতা বললেন, কখনো ক্রুদ্ধ হবেন না। কারণ রাগের সময় শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করতে পারে সহজে। সংবরণের মাধ্যমে রাগকে প্রতিহত করো। ভালোবাসার মাধ্যমে তাকে দমন করো। আর তাড়াহুড়া করো না। কারণ তাড়াহুড়া করতে গেলেই তুমি ভুল করে বসবে। কাছে-দূরে সবার জন্যই কোমল-হৃদয় হও। কখনো স্বেচ্ছাচারী হয়ো না। (কিতাবুয যুহদ, ইবনে আবিদ দুনয়া : ২৫৭; আল-মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, দাইনুরী : ২৩২)

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, প্রিয় পুত্র, ক্রোধের সময় মানুষের বিবেক-বিবেচনা ঠিক থাকে না। যেমন উত্তপ্ত চুলার মধ্যে জীবিত প্রাণ থাকতে পারে না। যার রাগ যত কম সে তত বেশি জ্ঞানী। সে যদি পার্থিব কোনো কারণে সৃষ্ট ক্রোধ সংবরণ করে তাহলে সেটা হবে ধূর্ততা ও কৌশল অবলম্বন। আর যদি সেটা আখেরাতের জন্য হয় তাহলে সেটা হবে জ্ঞান ও সহনশীলতা।

বলা হয়, ক্রোধ হলো বিবেকের শক্তি ও তার পথে প্রতিবন্ধক। খুতবা দেওয়ার সময় মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওমর (রা) বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই সফল, যাকে প্রবৃত্তি, লোভ, ক্রোধের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে। (সুনানুল কুবরা, বায়হাকি : ৩ : ১২১৫)

হাসান বসরি (র) বলেন, মুমিনের চরিত্র হলো, ধার্মিকতায় অবিচলতা, কোমলতায় দৃঢ়তা, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে ঈমানকে ধারণ করা। ধৈর্যের সাথে জ্ঞানার্জন করা। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া। অন্যের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। প্রাচুর্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। দারিদ্র্যের সময় সংযম প্রদর্শন করা। সক্ষম হলে ইহসান করা। সঙ্গ-বেদনা সহ্য করা। কঠিন সময়ে ধৈর্য ধারণ করা। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

গোড়ামি ত্যাগ করা। প্রবৃত্তি দমন করা। পেটকে আয়ত্বে রাখা। লোভকে কাবুতে রাখা। নিয়তকে অটুট রাখা। সে অত্যাচারিতকে সহায়তা করবে। দুর্বলকে দয়া করবে। কৃপণতা করবে না। অপচয়ও করবে না। অবিচারের স্বীকার হলে ক্ষমা করবে। অজ্ঞকে মার্জনা করবে। নফস থাকবে তার নিয়ন্ত্রণে। লোকেরা থাকবে তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত।

একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক বাক্যে আপনি আমাদের সামনে উত্তম চরিত্রের বিবরণ দিন। তিনি বলেন, ক্রোধ ত্যাগ করো।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) রেওয়ায়াত করেন, এক সংসারত্যাগী দরবেশ তাঁর ইবাদতখানায় ছিল। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইল। কিন্তু সে আপন কাজে অবিচল রইল। শয়তান একবার তার ঘরের কাছে এসে ডেকে বলল, দরজা খোলো। সে জবাব দিল, না। শয়তান আবার বলল, দরজা খুলে দাও, নতুবা আমি চলে যাব আর তুমি আপসোস করবে। দরবেশ এতেও ভ্রুক্ষেপ করল না। শয়তান বলল, আমি মাসীহ। দরবেশ বলল, তুমি মাসীহ হলে আমি কী করব? মাসীহ আমাদের ইবাদত ও সাধনার আদেশ করেছেন এবং কিয়ামতে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছেন। ওয়াদার খেলাপ করে যদি আজই চলে আসেন, তবে আমরা মানতে রাজি নই। এরপর শয়তান বলল, আমি শয়তান। তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না। এখন তুমি যা জিজ্ঞেস করবে তা বলব। দরবেশ বলল, আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাই না। এরপর শয়তান সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলে দরবেশ বলল, তুই কি শুনছিস? সে বলল, শুনছি, বলো। দরবেশ বলল, মানুষের কোন স্বভাবটি তোকে বেশি সাহায্য করে। শয়তান বলল, রাগ। মানুষ যখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়, তখন তাকে আমি এমনভাবে গড়িয়ে দেই, যেমন শিশুরা বলকে গড়িয়ে দেয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ৫২)

খায়সামা (র) বর্ণনা করেন— শয়তান বলে, আদম সন্তান আমার ওপর প্রবল হতে পারে না। যখন সে সন্তুষ্ট থাকে তখন আমি তার অন্তরে থাকি। আর যখন ক্রোধে নিমজ্জিত হয়, তখন উড়ে তার মাথার ওপর বসি। (আয-যুহদ, ইবনুল মুবারাক : ৩১৬; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ১১৭)

ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেন, ক্রোধ হচ্ছে প্রত্যেক অনিষ্টের চাবি। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৬)

এক আনসার বলেন, কঠোরতা নির্বুদ্ধিতার শিকড়। এর কারণ রাগ। যে ব্যক্তি মূর্খতায় তুষ্ট থাকে, তার সহনশীলতার দরকার নেই। কারণ, সহনশীলতা হচ্ছে উপকারী বিষয় এবং মূর্খতা দোষ ও ক্ষতিকর বিষয়। নির্বোধ কেউ কোনো কথার উত্তর দিলে চুপ করে থাকাই তার জবাব। (খতীব : আল ফকীহু ওয়াল মুতাফাককিহ : ৭১৩)

মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন— শয়তান বলে, আদম সন্তান থেকে আমি কখনো ক্লান্ত হইনি এবং তিনটি বিষয়ে কখনো ক্লান্ত হব না।

প্রথম, যখন সে কোনো নেশাদ্রব্য পান করবে, তখন তার লাগাম আমার হাতে থাকবে। আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাব। সে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবে।

দ্বিতীয়, যখন সে ক্রোধে নিমজ্জিত হবে তখন এমন কথা বলবে, যা সে জানে না এবং এমন কাজ করবে, যার জন্য অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয়, আমি সব সময় তাকে কৃপণতায় উৎসাহিত করতে থাকি এবং এমন বস্তুর লালসা দেই, যা তার সাধ্যে নেই। (জাম্মুল মুসকিল, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ৩৮)

এক মনীষী বলেন, রাগ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, এতে পরিণামে ক্ষমা চাওয়ার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন— রাগের সময় সহনশীলতার কী মূল্য। যেমনিভাবে লালসার বিষয় ছাড়া আমানতদারির কোনো মূল্য নেই। (তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির : ৩৩ : ১৭৮)

জনৈক বিচারপতিকে ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) পত্র লেখেন, রাগের মাথায় কাউকে শাস্তি দিয়ো না। কোনো অপরাধীর প্রতি রাগ হলে তাকে বন্দি করে রাখবে। অতঃপর রাগ দূর হয়ে গেলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেবে এবং শাস্তিও যেন পনেরোটি বেত্রাঘাতের অধিক না হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ৩০৪)

আলী ইবনে যায়েদ (রা) ওমর ইবনে আবদুল আযিযের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একবার এক কোরায়শী তাঁকে কটু কথা বললে তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে মাথা নামিয়ে রাখলেন। এরপর বললেন, তোমার ইচ্ছা ছিল, আমি ক্ষমতার মোহে শয়তানের কাছে পরাজিত হয়ে আজ তোমার সাথে এমন কথা বলি, যা কাল তুমি আমার সাথে বলবে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭৯৭১)

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, কুফরের খুঁটি চারটি। এক, ক্রোধ, দুই, খাহেশ, তিন, নির্বুদ্ধিতা এবং চার, লালসা। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ৭০)

রাগের স্বরূপ

আল্লাহ তাআলা প্রাণীকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণসমূহ দিয়ে বিলুপ্ত ও ধ্বংস হওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি আপন ভাণ্ডার থেকে

তাকে এমন ধরনের একটি বস্তুও দান করেছেন, যা দ্বারা সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, মানবদেহ উত্তাপ ও আর্দ্রতার মিশ্রণে গঠিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। সব সময়ই উত্তাপ আর্দ্রতাকে হজম ও শুষ্ক করতে থাকে। যদি খাদ্যের কাছ থেকে আর্দ্রতা সাহায্য না পায় এবং যে পরিমাণ শুষ্ক হয় সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ না হয়, তাহলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা খাদ্যকে প্রাণীদেহের উপযোগী করে তৈরি করেছেন এবং শরীরের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা নিহিত রেখেছেন, যাতে সে আহার করে এবং ক্ষতিপূরণ হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

মূলত যে সব বাহ্যিক কারণের দ্বারা প্রাণী ধ্বংস হয়, সেগুলো হচ্ছে তলোয়ারের মতো অস্ত্র ও অন্যান্য মারণাস্ত্র। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা ক্রোধশক্তি সৃষ্টি করেছেন, যা অন্তর থেকে জাগ্রত হয় এবং ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহ প্রতিহত করে। আল্লাহ তাআলা এ রাগকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করে মানুষের অন্তরের উপাদান করে দিয়েছেন। মানুষকে যখন কোনো উদ্দেশ্য থেকে বাধা প্রদান করা হয় অথবা তার ইচ্ছার বিপরীত কোনো ঘটনা ঘটে, তখন ক্রোধের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এরপর সেই আগুনের শিখা এমনভাবে প্রজ্বলিত হয় যে, অন্তরের অভ্যন্তরের রক্ত উষ্ণ হয়ে শিরা-উপশিরায় ঊর্ধ্বমুখে উত্থিত হয়। যেমন পাতিলের স্ফুটন ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়। এজন্যই রাগের সময় মানুষের মুখমণ্ডল ও চোখ লাল বর্ণ হয়ে যায়। চেহারায় রক্তের ঝলক ফুটে ওঠে। এ অবস্থা তখনই হয়, যখন মানুষ নিজের চেয়ে অধস্তন ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ নিতে সমপর্যায়ের হয়। কিন্তু যদি নিজের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির ওপর গোসসা আসে, যেখানে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম নয়, তখন রক্ত চামড়া থেকে জমাট হয়ে অন্তরের দিকে ফিরে যায় এবং মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়। ফলে চেহারা পাংশু বর্ণের হয়ে যায়। আর যদি সমকক্ষ ব্যক্তির ওপর গোসসা আসে, তাহলে উপর্যুক্ত উভয় প্রকার অবস্থা দেখা দেয়। মোটকথা, অন্তরের মধ্যেই রাগের স্থান।

অর্থাৎ, প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে শরীরের রক্ত স্ফীত হয়ে ওঠা। রক্তের এই স্ফীতি দুই বার দেখা দেয়। ঘটনা ঘটার আগে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণে। আর ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মত্ততায়।

প্রতিশোধের নেশাই হলো এই অসুরিক শক্তির অপরিহার্য দ্রব্য। আর প্রতিশোধ নিতে পারলেই শুধু ক্রোধ দমন হয়। অন্যথায় নয়।

এই রাগের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার কয়েকটি স্তর আছে।

প্রথম, সামান্য স্তর। এটা নিন্দনীয় এবং এমন রাগী ব্যক্তিকেই 'আত্মমর্যাদাহীন' বলা হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যে রাগের ব্যাপার দেখেও ক্রুদ্ধ হয় না সে নির্বোধ। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭ : ১৪৩)

এ থেকে জানা যায়, ক্রোধ ও জিদ আদৌ না থাকাটা দোষের।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় বলেন,

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ.

অর্থাৎ, তারা কাফেরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর। (সূরা ফাতহ : ২৯) তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিন। (সূরা তাওবা : ৭৩)

দ্বিতীয়, বাড়াবাড়ির স্তর। অর্থাৎ রাগ এতো বেশি হওয়া যে, জ্ঞানবুদ্ধি, দীনের আনুগত্য ও শাসনের বাইরে চলে যায়। এসময় মানুষের না থাকে মনের চোখ; না চর্মচক্ষু। না থাকে ভাবার শক্তি। না নির্বাচন-যোগ্যতা। বরং তখন সে দোদুল্যমান অবস্থায় চলে যায়।

এই বেশি মাত্রার রাগের একটি কারণ হচ্ছে জন্মগত। অর্থাৎ, জন্ম থেকেই কিছু লোক স্পর্শকাতর ও দ্রুত রাগী হয়ে থাকে। এমনকি স্বভাবগতভাবেই সে যেন ক্রোধের প্রতিমূর্তি। এই আগুন আরও উসকে দেয় অন্তরের উষ্ণতার মিশ্রণ। কারণ হাদিসের ভাষ্য মতে ক্রোধ অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন। (জামে তিরমিযী : ২১৯১)

এক্ষেত্রে আগুন নিভিয়ে ফেলার মাধ্যমেই শুধু এই উষ্ণতার বিলোপ ঘটানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ অভ্যাসগত। এমন লোকদের সাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা করা, যারা ক্রোধের হাতে পরাজিত, দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, রাগান্বিত হওয়াকে বীরত্ব মনে করে এবং যারা গর্বের সাথে বলে, আমরা কোনো

কিছু সহ্য করতে পারি না। এতে তারা এ কথাই বোঝাতে চায়, আমাদের একদম জ্ঞানবুদ্ধি নেই। যে ব্যক্তি এসব লোকের সংস্পর্শ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে থাকে, তার অন্তরে ক্রোধ সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হয়। ফলে সেও তেমনি হয়ে যেতে চায়।

ক্রোধের আগুন যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন উপদেশ কোনো কাজে আসে না; বরং উপদেশ দিলে ক্রোধ আরও বেড়ে যায়। বুদ্ধি দিয়ে যে কিছু লাভবান হবে, তাও হতে পারে না। কারণ, এ সময় বুদ্ধিও লোপ পেয়ে যায় অথবা ক্রোধের আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থায় মানুষ মস্তিষ্ক দ্বারা চিন্তা করে। কিন্তু যখন ক্রোধের আধিক্যে অন্তরে রক্ত টগবগ করে ওঠে, তখন তা থেকে একটি কালো ধোঁয়া মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয় এবং চিন্তার জগতে বিস্তার লাভ করে। বরং মাঝে মধ্যে ইন্দ্রিয়ের স্থানকেও ঘিরে নেয়। ফলে চোখে অন্ধকার দেখে এবং কানে ভোঁ ভোঁ ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না। দুনিয়া ঘুর্ণায়মান মনে হয়।

মাঝে মধ্যে ক্রোধের আগুন এতো প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, শরীরের আর্দ্রতা বিলুপ্ত হয়ে অনেক সময় মৃত্যু ঘটে। সত্যি বলতে কি, ঝড়ের সময় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে নৌকার যে অবস্থা হয়, তা অন্তরের সেই অবস্থার চেয়ে অনেক ভালো, যা রাগের সময় হয়ে থাকে। নৌকার তো রক্ষা পাওয়ার আশা থাকে। নৌকার যাত্রীরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নৌকা আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে, আর এখানে নৌকার মাঝি হচ্ছে অন্তর, যা রাগের আতিশয্যে অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। তখন তাকে বশ করার চেষ্টা করবে কে?

এবার আমরা জানব, প্রচণ্ড রাগের বাহ্যিক লক্ষণ কী ? মূলত এ ধরনের লোকের রাগান্বিত হওয়ার বাহ্যিক লক্ষ্যণ হলো, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপতে থাকা, অসংলগ্ন কর্মকাণ্ড করা, শ্লেষ্মা আসা, চোখ লাল বর্ণের হয়ে যাওয়া এবং নাক, মুখ ফুলে গিয়ে চেহারা বদলে যাওয়া। রাগান্বিত ব্যক্তি যদি রাগের সময় নিজের চেহারা দেখত, তবে লজ্জায় ক্রোধ বর্জন করতে বাধ্য হতো। এসব নমুনা যেহেতু অন্তরের বাহ্যিক আলামত, সেজন্য বোঝা যায়, অন্তরের অবস্থা আরও বিশ্রী হবে। কেননা, প্রথমে অন্তরের অবয়বই বিগড়ে যায়, যা পরে বাহ্যিক অবয়বেও প্রসার লাভ করে। ক্রোধের প্রভাবে জবানের অবস্থা এমন হয় যে, রাগান্বিত ব্যক্তি

অকথ্য ও অশ্লীল গালিগালাজ করতে থাকে, যা শুনে বুদ্ধিমানরা লজ্জাবোধ করে। এরপর যখন ক্রোধ প্রশমিত হয় তখন রাগান্বিত ব্যক্তিও লজ্জিত হয়। ক্রোধের প্রভাবে গোটা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নিঃসংকোচে মারপিট, হত্যা, জখম ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যার ওপর রাগ এসে যায়, সে লোক যদি সামনে থাকে তবে তার ওপর এসব অত্যাচার নির্বিচারে চলে। পক্ষান্তরে যদি সে পালিয়ে যায় তবে নিজের ওপরই ঝাল মেটাতে থাকে এবং পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, নিজের মুখে আঘাত করে, মাটিতে হাত মারতে থাকে। কখনো রাগের ফলে শরীরের চালিকা শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। আবার কখনো জীবজন্তুকে প্রহার করতে থাকে এবং ঘরের থালা-বাসন আছড়ে ফেলে চুরমার করে।

মনের ওপর রাগের প্রভাব হলো, যার ওপর রাগ হয়, তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তার ক্ষতি কামনা করা হয়, তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়া হয় এবং তার সম্মানহানির চেষ্টা করা হয়।

কারও মধ্যে আত্মমর্যাদা-বোধের অভাব দেখা দিলে অপছন্দনীয় বিষয় মেনে নেয়। তখন মা-বোন-স্ত্রীকে অপদস্থ করা হলে তার মনে কোনো দাগ পড়ে না। ইতরদের অপমান সে সহ্য করে নেয়। নিজেকে হীন মনে করে। এটাও একটা দূষণীয় বিষয়। কারণ এর ফলে নিজের আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেওয়া হয়ে যায়। এটা পৌরুষত্বহীনতার লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিশ্চয় সা'দ আত্মমর্যাদাশীল। আমার আত্মমর্যাদা তার চেয়েও বেশি। আর আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাশীল হলেন আল্লাহ তাআলা। (সহিহ বুখারী : ৬৮৪৬; সহিহ মুসলিম : ১৪৯৯)

মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা দেওয়া হয়েছে, নসব ঠিক রাখার জন্য। এ বিষয়টিতে মানুষ ছাড় দিলে এক বংশের সাথে অন্য বংশ মিলে যেতে পারে। তাই বলা হয়।' প্রতিটি গোত্রের পুরুষদের দেওয়া হয়েছে আত্মমর্যাদা। আর নারীদের দেওয়া হয়েছে বংশ রক্ষার দায়িত্ব।

ক্রোধস্বল্পতার কারণে নির্লিপ্ততা ও অপরাধ দেখে চুপ থাকার প্রবণতা মনে জন্ম নেয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দীনের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যক্তিরাই আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (মুসনাদুশ শিহাব, কাযায়ি : ১২৭৭; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭৯৪৮-৭৯৪৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ.

আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। (সূরা নূর : ২)

মূল কথা হলো, যার মনে ক্রোধ থাকবে না সে নফসের সাধনা থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ নফসের সাধনার একটা স্তর হলো প্রবৃত্তির ওপর ক্রোধকে চাপিয়ে দেওয়াও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দিকে মন ধাবিত হতে চাইলে নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা। কাজেই রাগ না থাকাও নিন্দনীয়।

অবশ্য, ক্রোধের মধ্যম একটা স্তর আছে। তা উত্তম ও প্রশংসনীয়। এই ক্রোধ জ্ঞান-বুদ্ধির ইঙ্গিতে পরিচালিত এবং ধর্মীয় নীতির অনুগত হয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যেখানে রাগ হওয়া জরুরি, সেখানেই এই রাগ প্রকাশ পায়। এ ধরনের রাগের কথাই আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, ক্রোধের এইসব কথাই নিচের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, خَيْرُ الْأُمُوْرِ اَوْسَطُهَا অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্তরই শ্রেষ্ঠ। (মারিফাতুস সাহাবা, আবু নুয়াইম : ৬ : ৩১৭০)

এ থেকে জানা গেল, গোসসার স্বল্পতা ও বাহুল্য দুটোই নিন্দনীয় এবং মধ্যম স্তরটি ভালো। যার ক্রোধশক্তি এত দুর্বল যে, আত্মসম্মানবোধ বিলুপ্তপ্রায় এবং অন্যায়, অবিচার অসহনীয় নয়, তার উচিত নিজের নফসের চিকিৎসা করানো, যাতে তার রাগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যার রাগ অনিয়ন্ত্রিত, তারও নফসের চিকিৎসা করা প্রয়োজন, যাতে রাগ উত্তম ও মধ্যম পর্যায়ে নেমে আসে। 'সীরাতে মুস্তাকীম' এ পর্যায়কেই বলা হয়। এই সরল পথ চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়ে ধারালো। কিন্তু যে ব্যক্তি এ রাস্তায় চলবে, তার উচিত, যতদূর সম্ভব এর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

অর্থাৎ, কিছুতেই তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সুষম বণ্টন করতে সমর্থ হবে না, যদিও ইচ্ছা থাকে। সুতরাং একজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে যেয়ো না যে, অন্যজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। (সূরা নিসা : ১২৯)

সুতরাং যে ব্যক্তি ন্যায়ভাবে সৎকর্ম করতে সক্ষম হয় না, সে যথাযথভাবে অসৎকর্মই করবে এটা ঠিক নয়। বরং কিছু ক্ষতির তুলনায় কিছু ক্ষতি হাল্কা এবং কোনো কোনো সৎকর্ম কোনোটার তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী। অতএব, যে ব্যক্তি বড় সৎকাজ করতে পারে না, সে ছোটো সৎকাজ করবে এবং যে অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে না, সে কম ক্ষতিকর অনিষ্ট করেই থেমে যাবে।

মুজাহাদার মাধ্যমে রাগ দূর করা যায়

কিছু লোকের ধারনা, সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে রাগ পরিপূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। তাদের মতে মুজাহাদার উদ্দেশ্যও তাই। আবার অনেকে বলেন, রাগের কোনো প্রতিকার নেই। এটা তাদের উক্তি, যারা মনে করে অভ্যাসও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্মগত ত্রুটি যেমন মানুষ সারাতে পারে না, অনুরূপ অভ্যাসও চিকিৎসাযোগ্য নয়। এই উভয় প্রকার মন্তব্য দুর্বল। এ সম্পর্কে কথা হচ্ছে, মূলত মানুষ কোনো জিনিস ভালোবাসে আবার কোনো জিনিস ঘৃণা করে। এমনিভাবে কিছু জিনিস তার মন-মেজাযের অনুকূলে এবং কিছু তার বিপরীত। সুতরাং যে বস্তু তার মন-মেজাযের বিপরীত, তার ওপর রাগ হয়। মনে করও, কেউ তার প্রিয়তম জিনিসটি কেড়ে নিল অথবা কেউ ক্ষতি করতে চাইল। এ সময় সে অবশ্যই রাগ হবে। কিন্তু যে জিনিসকে মানুষ ভালোবাসে, তা তিন প্রকার।

১. এমন জিনিস, যা সবার জন্যই জরুরি। যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য। সুতরাং কেউ যদি তার অন্ন কেড়ে নেয় অথবা কাপড় ছিনিয়ে নেয় অথবা বসত-বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেয়, তবে তার ওপর অবশ্যই রাগ হবে।

২. যে জিনিস কারও জন্য দরকার নয়; যেমন অনেক ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রয়োজনের বেশি চাকর-বাকর ইত্যাদি। এসব অভ্যাসের কারণে প্রিয়। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ যদি এসব জিনিসের অপব্যয় করে, তবে তার ওপর রাগ হয়। এ ধরনের রাগ সম্পূর্ণরূপে দূর হতে পারে। যেমন যদি কারও কাছে প্রয়োজনের বেশি একটি ঘর থাকে এবং কোনো জালিম এসে তা ধ্বংস করে দেয়, তবে

এজন্যে রাগ না-ও হতে পারে। যেমন— গৃহকর্তা জ্ঞানীগুণী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘরের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। সুতরাং আগ্রহ না থাকায় সে রাগ হবে না। কিন্তু আগ্রহ থাকলে অবশ্যই রাগ হবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক মানুষ আছে এমন বিষয়ের জন্য রাগ হয়ে থাকে, যা খুব একটা দরকারি নয়। যেমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নষ্ট করা, মজলিসে সভাপতি না বানানো ইত্যাদি। অপরদিকে সভাপতির আসনে বসার যার শখ নেই, অন্য কাউকে সেখানে বসতে দেখলেও তার রাগ হয় না।

বেশিরভাগ মানুষ প্রয়োজনীয় আগ্রহের কারণে কথায় কথায় রেগে যায়। তারা বুঝে না যে, খাহেশ ও শখ যত বেশি হয়, মানুষের মধ্যে ভুলও তত বেশি হয়। কারণ যার শখ বেশি, তার অভাব অনটন বেশি। আর যখনই চাহিদা বেড়ে যাবে নিজের অসম্পূর্ণতাও বেড়ে যাবে। অজ্ঞ ব্যক্তি সর্বক্ষণ নিজের চাওয়া ও চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে শ্রম দিয়ে যায়। অথচ এটাই দুঃখ ও বিষাদের কারণ। কেউ কেউ তো অজ্ঞতার সাগরে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, তাদের খারাপ কাজের বিষয়ে বললেও রেগে যায়। যেমন কেউ যদি বলে, তুমি তো ভালোভাবে দাবা খেলতে পারো না কিংবা বেশি মদ খেতে পারো না, তবে তাদের মন-মেজায বিগড়ে যায়। অথচ এসব বিষয় মানুষের মধ্যে না থাকাই উত্তম।

৩. এমন কিছু জিনিস আছে, যা কোনো কোনো মানুষের জন্য খুবই জরুরি এবং কোনো কোনো মানুষের জন্য মোটেই জরুরি নয়। যেমন বইপুস্তক শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন। সে বইপুস্তক ভালোবাসে। কেউ যদি তার বইপুস্তক পুড়িয়ে অথবা নষ্ট করে ফেলে, সে তার প্রতি রেগে যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক পেশাজীবী তার যন্ত্রপাতিকে ভালোবাসে। কারণ এর ওপর তার জীবিকা নির্ভরশীল।

আবশ্যকীয় মুহাব্বত সম্পর্কে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই হাদিস থেকে, যে ব্যক্তি নিরাপদ স্থানে থাকবে, শরীর সুস্থ থাকবে, আর তার কাছে এক দিনের খোরাকি থাকবে, মনে করতে হবে, সামগ্রিকভাবে পুরো পৃথিবী তার জন্য হয়ে গেছে। (জামে তিরমিযি : ২৩৪৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৪১)

বাস্তবতা সম্পর্কে যে জানে এবং এই তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখে, অনুমান করা যায়, সে অন্য কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না।

এ পর্যন্ত মানুষের যে বস্তুর প্রতি ভালোবাসা তা তিন প্রকারে আলোচনা হলো। এখন প্রতিটি প্রকারের মধ্যে মুজাহাদার ফল কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রথম প্রকার যেমন— যা সবার জন্যই জরুরি। এটা সাধনা দ্বারা অন্তরের রাগ পূর্ণাঙ্গ দূর করা যায় না। এতে মুজাহাদা এ উদ্দেশ্যে করা হয়, যাতে অন্তর রাগের অনুগত হয়ে না থাকে এবং রাগের ব্যবহার ততটুকুই করে, যতটুকু শরিয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে উত্তম। চেষ্টা সাধনা দ্বারা এই স্তর অর্জন করা সম্ভব। প্রথমে মনের ওপর জোর দিয়ে ধৈর্যধারণ করবে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ অবস্থার ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করবে। অবশেষে ধৈর্য ধরাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। এতেও সমূলে রাগ উৎপাটিত হবে না, তবে তার তীব্রতা হ্রাস পাবে এবং নেতিয়ে পড়বে। ফলে মুখে তার প্রভাব অনুভূত হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার সাধনার অবস্থাও তেমনই। কারণ, এতে কিছু লোকের জন্য তো সেসব জিনিস অত্যন্ত জরুরি। মুজাহাদার মাধ্যমে তাদেরও এই উপকার হবে যে, অন্তরে রাগের তীব্রতা থাকবে না এবং ধৈর্যের কষ্টও কম অনুভূত হবে। তৃতীয় প্রকার বস্তুর মধ্যে যে রাগের জন্ম হয়, মুজাহাদার মাধ্যমে তা উপড়ে ফেলা সম্ভব। অর্থাৎ জরুরি নয় এমন বস্তুর মুহব্বত যখন অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে, তখন সাথে সাথে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে সাধনার পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ এভাবে ধ্যান করবে— আমার দেশ হলো অন্ধকার কবর এবং অবস্থানের জায়গা আখেরাত। দুনিয়া কেবল একটি মধ্যবর্তী সেতু। এ সেতু অতিক্রম করে যাওয়া সুনিশ্চিত। এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা। এরপর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছাড়া সবগুলোকে মনে করবে, আসল বাসস্থান তথা আখেরাতে এসব বস্তু বঞ্চনার কারণ হবে। এসব চিন্তা-ভাবনার পর দুনিয়ার মুহব্বত অন্তর থেকে মুছে ফেললে নিশ্চিতই আশা করা যায়, ক্রোধ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই হবে যে, ক্রোধ প্রকাশ করবে না এবং তদনুযায়ী আমল করবে না। কেননা, ক্রোধ মুহব্বতের অনুসারী। মুহব্বত বিলুপ্ত হয়ে গেলে ক্রোধও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উদাহরণত এক ব্যক্তির কাছে কুকুর আছে। অন্য কোনো ব্যক্তি কুকুরটি আঘাত করলেও সে ক্রুদ্ধ হবে না।

মূলত ক্রোধ সমূলে উপড় ফেলা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু নেতিয়ে পড়া এবং সে অনুযায়ী আমল না হওয়া কম সফলতা নয়। এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, প্রথম প্রকার অর্থাৎ জরুরি জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাগ নয়; দুঃখ বেদনা হয়। যেমন কেউ গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বকরি লালনপালন করল। এখন সেই বকরি মারা গেলে তার দুঃখ অবশ্যই হবে। কিন্তু কারও প্রতি রাগ হবে না। তাছাড়া প্রত্যেক দুঃখের সাথে ক্রোধ হওয়া জরুরি নয়। দেহে অপারেশন করলে কষ্ট ও ব্যথা তো হয়। কিন্তু সে চিকিৎসকের ওপর রাগ করে না। সুতরাং যে ব্যক্তির ওপর তাওহীদ প্রবল এবং যে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন ও তাঁর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে, সে সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুর ওপরই রাগান্বিত হবে না। কেননা, সে মানুষকে লেখকের কলমের ন্যায় একটি মাধ্যম মনে করবে। বিচারক কলম দিয়ে কারও মৃত্যুদণ্ড লিখলে যেমন সে কলমের প্রতি রাগ হবে না, তেমনি কেউ তার বকরি জবাই করে খেয়ে ফেললে সে ওই ব্যক্তির প্রতিও রাগ হবে না। কারণ, জবাই ও মৃত্যু সে আল্লাহর পক্ষ থেকেই বিশ্বাস করে। কাজেই তাওহীদ প্রবল হওয়া অবস্থায় রাগ না হওয়া উচিত। এছাড়া আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখার দাবিও তা-ই। কেউ যখন ধারণা করবে, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যা ভালো তা-ই করেন, তখন সে বুঝে নেবে, ক্ষুধার্ত থাকা কিংবা অসুস্থ থাকাই সম্ভবত আল্লাহর কাছে আমার জন্য উত্তম। সুতরাং এ ব্যাপারে রাগ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, বাস্তবে তাওহীদ প্রবল হলে এটা সম্ভব। কিন্তু তাওহীদের এই স্তরের প্রবলতা সবসময় থাকে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিদ্যুত চমকের মতো; আসে আবার চলে যায়। ফলে পরিণামে অন্তরকে ওসিলার ওপর নির্ভর করতে হয়।

যদি তাওহীদ দ্বারা এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতো, তাহলে সৃষ্টির সেরা মহামানব মুহাম্মদ (স) অবশ্যই তা হাসিল করতে পারতেন। অথচ তিনিও রাগ করতেন। এমনকি রাগে তাঁর গণ্ডদেশে রক্তিম আভা দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি তো মানুষ, মানুষের মতো আমারও রাগ হয়। আমি কোনো মুসলমানকে কটুবাক্য বললে, লানত

করলে অথবা প্রহার করলে আপনি আমার পক্ষ থেকে এসব বিষয়কে তার জন্য নৈকট্যের কারণ করে দিন। (সহিহ মুসলিম : ২৬০১; মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১২৬২)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গিয়ে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি যেসব কথা রাগ অথবা খুশি অবস্থায় বলেন, সেগুলো আমি লিখে নেব? তিনি বললেন, লিখে নাও। যে আল্লাহ আমাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, এ মুখ থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। (সুনানে আবু দাউদ : ৩৬৪৬)

তিনি এ কথা বলেননি, আমি রাগ করি না; বরং বলেছেন, ক্রোধ আমাকে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ ক্রোধের দাবি অনুযায়ী আমি আমল করি না। আয়েশা (রা) একবার রাগ হলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আয়েশা, তোমার হয়েছে কি? তোমার শয়তান তোমার নিকটে এসে গেছে? আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার শয়তান নেই? তিনি বললেন, কেন থাকবে না। কিন্তু আমার দুআর ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে। এজন্য সে আমাকে ভালো কাজের কথা বলে। কিন্তু মন্দ কিছু বলে না। (সহিহ মুসলিম : ২৮১৫)

রাসূলুল্লাহ (স) এখানে এ কথা বলেননি যে, আমার শয়তান নেই। বরং বলেছেন, সে আমাকে ক্ষতির আদেশ করে না। এখানে শয়তান বলে রাগ বোঝানো হয়েছে।

আলী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাগ কখনো দুনিয়ার জন্য রাগ হতো না। কখনো সত্য বিষয়ে রাগ হলে তা কেউ টের পেতো না এবং তাঁর রাগের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারও থাকতো না। (শামায়েলে তিরমিযী : ২২৫)

এ হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ক্রোধ যদিও আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য বিষয় ছিল, কিন্তু তাতে মোটামুটিভাবে ওসিলারও ভূমিকা ছিল।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মগ্ন থাকে, তখন প্রয়োজনীয় বস্তু বেহাত হয়ে গেলেও সে ক্রুদ্ধ হয় না। কেননা, অন্তর তখন অন্য বিষয়ে মগ্ন থাকে। এতে ক্রোধের অবকাশ থাকে

না এবং মগ্নতার কারণে অন্য কিছু কল্পনায়ও আসে না। যেমন সালমান ফারসি (রা)-কে যখন কেউ গালি দিল, তখন তিনি বললেন, আমলের দাঁড়িপাল্লায় আমার নেকি কম হলে তুমি যা বলছ, আমি তার চেয়েও অধম। আর নেকি ভারী হলে তোমার কথায় আমার কোনো ক্ষতি হবে না। (আযযুহদুল কাবির, বায়হাকি : ৭৬৩)

এখানে তাঁর অন্তর আখেরাতে মশগুল ছিল বিধায় গালি দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এমনিভাবে রবী ইবনে খায়সামকে কেউ গালি দিলে তিনি বললেন, তোমার কথা আল্লাহ শোনেন। জান্নাতে একটি উপত্যকা আছে। যদি আমি সেটি অতিক্রম করতে পারি, তবে তোমার কথায় আমার কিছু যায় আসে না। আর যদি অতিক্রম করতে না পারি, তবে তুমি যা বলছ, আমি তার চেয়েও অধম। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ১৮)

এক ব্যক্তি আবু বকর (রা)-কে গালি দিলে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, তোর যে সকল দোষ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছেন, সেগুলো অনেক। তিনি যেন নিজের দোষ-ত্রুটি দেখার মধ্যে মগ্ন ছিলেন। মালেক ইবনে দিনার (র)-কে এক মহিলা রিয়াকার বললে, তিনি তাকে বললেন, একমাত্র তুমিই আমাকে ঠিকমতো চিনতে পেরেছ। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৩৩৯)

শা'বীকে কেউ মন্দ বললে তিনি বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। আর তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তোমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, দাইনুরী : ১৩৭)

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয়, এসকল মহান মনীষীগণ রাগ না করার কারণ এটিই ছিল যে, তাঁদের অন্তর দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মগ্ন ছিল। এও সম্ভবপর যে, গালি তাদের মনে প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু তাঁরা এদিকে মনোযোগ দেননি। অন্তরে যা প্রবল ছিল, তার প্রতিই তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং রাগ না হওয়ার এ পর্যন্ত দুটি কারণ বর্ণিত হলো, অন্তরের অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মগ্ন থাকা এবং তাওহীদের বিশ্বাস প্রবল হওয়া। তৃতীয় একটি কারণ হচ্ছে, এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা ক্রোধ অপছন্দ করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর মহব্বতের

কারণে ক্রোধ দমিত হয়ে যাবে। এটাও অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এমন হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে ক্রোধ দমন করার তাওফীক দান করুন।

মানুষ যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে তখন সে ইচ্ছা করলে প্রিয় কিছু হারানোর ক্রোধ দমন করতে পারে। কাজেই কখনো কখনো ক্রোধ না থাকাটা কল্পনাতীত কোনো বিষয় নয়। যখন মানুষ গুরুত্ববহ কোনো কাজে মগ্ন থাকে, যখন মানব মনে তাওহিদের ধারণা প্রবল হয় কিংবা কেউ যখন এই জ্ঞান রাখে যে, আল্লাহ তার কাছে রাগ না করারই ইচ্ছা করেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রেম তার অন্তরে প্রজ্বলিত ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করে দেয়। আর এসব বিষয় অসম্ভব হলেও অবাস্তব নয়।

এ পর্বে থেকে আমরা জানতে পারলাম, রাগ দমন করার সর্বোত্তম উপায় হলো দুনিয়ার মুহব্বত মন থেকে মুছে ফেলা। আর দুনিয়ার মহব্বত পেছনে ফেলে আসার মাধ্যম হলো, দুনিয়ার বিপদাপদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। যার বিস্তারিত বিবরণ দুনিয়ার নিন্দনীয় পর্বে আসছে।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি যে, মন থেকে মুছে ফেলবে সে রাগের অধিকাংশ উপকরণ থেকে মুক্তি লাভের উপায় খুঁজে পাবে। আর যেগুলো থেকে পুরোপুরি মুক্তি লাভ সম্ভব নয় সেগুলো আয়ত্বে নিয়ে আসতে পারবে।

রাগের রহস্য ও তা দমনের উপায়

রোগ বালাই দূর হওয়াও যেহেতু তার কারণ দূর হওয়ার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, সেজন্য রাগের কারণসমূহ এবং তা দমন করার উপায় জানা উচিত। হযরত ইয়াহইয়া (আ) ঈসা (আ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, সর্বাধিক কঠোর জিনিস কী? তিনি বললেন, আল্লাহর ক্রোধ। আবার জিজ্ঞেস করা হয়, এর কাছাকাছি কঠোর কোনটি? তিনি বললেন, মানুষের রাগ। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, কীসের দ্বারা রাগ প্রকাশিত হয়? তিনি বললেন, গর্ব, অহংকার, সম্মান কামনা থেকে রাগের সৃষ্টি হয়। এ থেকে বোঝা গেল, মনে ক্রোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণ এগুলো— অহংকার, বিদ্রূপ, অনর্থক হাসি-ঠাট্টা, অপরকে দোষারোপ করা, প্রতারণা, অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভ ইত্যাদি। শরিয়ত নিন্দিত এসব অভ্যাস থাকা অবস্থায় ক্রোধ দূর হওয়া

অসম্ভব। তাই বিপরীত গুণ দ্বারা এসব দোষ দূর করতে হবে। অর্থাৎ, বিনয় দ্বারা অহংকার এবং নিজেকে সঠিকভাবে চেনার দ্বারা আত্মপ্রীতি দূর করবে। অহংকার ও আত্মপ্রীতি পর্বে এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হবে।

কাজেই অহংকারকে বিনয় দিয়ে, আত্মমুগ্ধতাকে আত্মপরিচয় দিয়ে দমন করা চাই। গর্ব দূর করার জন্য নিজের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে গোলাম হিসেবে। কারণ আদিতে মানুষের পিতা একজনই ছিলেন। একসময় তারা মর্যাদার বিভিন্ন স্তরে আরোহণ করে ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। সুতরাং খালি চোখে মানুষেরা সকলে এক জাতি। আর মর্যাদাকর বিষয় অর্জনের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

আর গর্ব, অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা কখনো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হতে পারে না। কারণ সব কিছু হলো মন্দত্বের প্রতীক; বরং নিকৃষ্টতার মৌল বিষয়। এসব থেকে যদি তুমি মুক্ত হতে না পারো তাহলে অন্যের সাথে তোমার বিভাজনটা রইলো কোথায়? সর্বদিক থেকে তুমি আর একজন দাস যেহেতু একইরকমের তাহলে তোমার কীসের এত গর্ব-অহংকার।

হাসি-ঠাট্টা থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম হলো জীবনব্যাপী ধর্মের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মোৎসর্গ করে দেওয়া।

উপহাসের প্রতিকার হলো মানুষকে সম্মানের চোখে দেখা এবং তাদের নিয়ে উপহাস করা থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা।

আর রসিকতা থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো, মর্যাদা ও উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা।

গালিগালাজ করা থেকে মুক্তি পেতে হলে মন্দ কথা বলা থেকে জবানকে বাঁচিয়ে রাখা ও অন্য কারও কথার প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা।

পার্থিব বিলাস-উপকরণ অর্জনের প্রতি প্রবল লোভ থেকে বাঁচার উপায় হলো নিজের প্রয়োজনের পরিমাণ বস্তু নিয়েই তুষ্ট থাকা। আর তা হতে হবে অমুখাপেক্ষিতার মর্যাদা ও প্রয়োজনের লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিয়তে।

ক্রোধের প্রতিষেধক হিসেবে এসব চারিত্রিক গুণ অনেক বেশি কার্যকরী। এসব গুণ মানুষকে কঠিন সাধনার চেতনা থেকে মুক্তি দেয়। আর সাধনার ফলে মানুষের সম্মুখে আগত বিপদাপদ সম্পর্কে সে সম্যক ধারণা লাভ

করতে পারে; যাতে করে নফস এসব বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। তার মন্দত্ব থেকে দূরে থাকতে পারে। তারপর সে এসব কাজের সরাসরি বিরোধিতা করতে শুরু করবে। একসময় অভ্যাস হয়ে গেলে এসব কাজ তার জন্য করা সহজ হয়ে যাবে। আর একবার ভালো কাজের অভ্যাস হয়ে গেলে মন্দ অভ্যাসগুলো দূর হয়ে যাবে এবং নফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

সাথে সাথে এসব মন্দ অভ্যাস থেকে সৃষ্ট ক্রোধ থেকেও মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারবে।

অজ্ঞরা যখন ক্রোধকে বীরত্ব, মর্যাদার সোপান, উচ্চ সাহসিকতা বলে মনে করে এবং তাকে বিভিন্ন প্রশংসনীয় অভিধায় যুক্ত করে, এর ফলে মানবসত্তা এক সময় ক্রোধকে ভালো মনে করে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন এসব কিছুই মানুষের ক্রোধোন্মত্ত ও তার পেছনে সবচেয়ে বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। এসব বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় বড়দের থেকে বর্ণিত ঘটনায় ক্রোধকে সাহসিকতার স্থানে রেখে তার প্রশংসা করার মধ্যে। আর মানুষের মন স্বভাবগতভাবেই সফল ব্যক্তিদের অনুসরণ-অনুকরণ করতে ভালোবাসে। আর বড়দের অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের মনে রাগের জন্ম হয়। আর একে বীরত্ব বা মর্যাদা বলা পুরোপুরি অজ্ঞতা। বরং এটা এক প্রকারের আত্মার ব্যাধি ও বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা। এর আবির্ভাব হয় দুটি কারণে, নফসের দুর্বলতা ও অপরিপূর্ণতা। কারণ মানুষ যখন অসুস্থ থাকে এবং শারীরিকভাবে দুর্বল থাকে তখন সে সুস্থ ব্যক্তির চেয়ে দ্রুত রেগে যায়। পুরুষের চেয়ে মহিলাদের রাগ ওঠে তাড়াতাড়ি। পূর্ণ বয়স্ক লোকের চেয়ে বালকেরা অল্পতেই রেগে যায়।

কোনো প্রৌঢ় ব্যক্তির চেয়ে বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি রেগে যায় তাড়াতাড়ি। যারা স্বভাবে মন্দ, নীচু চরিত্রের, গুণধর ব্যক্তিবর্গের চেয়ে তাদের রাগ বেশি হয়।

ইতর শ্রেণির কোনো লোক যখন মুখের গ্রাস হারিয়ে ফেলে তখন প্রবৃত্তির কারণে, যখন অল্প কিছু সম্পদ অর্জনে ব্যর্থ হয় তখন কৃপণতার জন্য তার রাগ বেড়ে যায়। এমনকি সে নিজের মা-বাবা, বিবি-বাচ্চাদের ওপর রাগ দেখাতে কার্পন্য করে না। কাজেই শক্তিশালী সে-ই, রাগের সময় যে

আত্মদমন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, শক্তিমান সে নয়, যে যুদ্ধে জয়লাভ করে; বরং শক্তিশালী সে-ই যে ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে। (সহিহ বুখারি : ৬১১৪; সহিহ মুসলিম : ২৬০৯)

কাজেই এসব অজ্ঞলোকের সামনে তুলে ধরতে হবে ক্ষমা-মার্জনা ও সহনশীলতার গল্প। যার অনুঘটক ছিলেন নবী-রাসূল, অলী-আউলিয়া ও আলেম-ওলামা, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ রাজা-বাদশারা।

অন্যদিকে ক্রোধকে যারা বীরত্ব বলে ঘটনার বিবরণী দিয়েছে, তারা হলো নিকৃষ্ট, অযোগ্য, মূর্খ, মাথামোটা। তাদের না ছিলো জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিলো মান-মর্যাদা।

জোশের সময় ক্রোধের উপশম

আমরা এতক্ষণ রাগের কারণগুলো বর্ণনা করেছি যেগুলো সমূলে দমন করা উচিত, যাতে রাগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে না পারে। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, কোনো কারণে যদি রাগ কঠোর হয়ে যায়, তবে এমন দৃঢ়তা অবলম্বন করা প্রয়োজন যেন ক্রোধের বশে অস্থির হয়ে সে অনুযায়ী অশালীন কোনো কাজ না করে বসে। ইলম ও আমলের প্রতিষেধক দ্বারা এই দৃঢ়তা হাসিল হয়।

ইলম সম্পর্কিত বিষয় ছয়টি : ১. রাগ হজম ও ধৈর্যশীল হওয়ার ফযিলত সম্পর্কিত হাদিসসমূহ পড়ে নেকী অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। আশ্চর্য নয় যে, নেকী অর্জনের ফলে রাগের অতিমাত্রা হ্রাস পাবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকবে। হযরত মালেক ইবনে আউস বলেন, হযরত ওমর (রা) একদিন এক ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন এবং তাকে প্রহার করার আদেশ দেন। তখন আমি এ আয়াত পাঠ করলাম—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

অর্থাৎ, ক্ষমা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাকুন। (সূরা আরাফ : ১৯৯)

এরপর ওমর (রা) এই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোনো আয়াত তাঁর সামনে তেলাওয়াত করা হলে তিনি তার মর্ম বোঝার জন্য অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করতেন।

অতঃপর মর্ম অনুযায়ী চিন্তা করে তিনি লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। (সহিহ বুখারী : ৪৬৪২; অনুরূপ অর্থে)

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) একব্যক্তিকে প্রহার করার আদেশ দেওয়ার পর নিজেই এই আয়াত পাঠ করতে লাগলেন,

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

ক্রোধ হজমকারী ও মানুষকে মার্জনাকারী। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

তারপর তিনি লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন। (আনসাবুল আশরাফ, বালাজিরি : ৮ : ১৪৮)

২. আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে সতর্ক করবে এবং এভাবে চিন্তা করবে- তার ওপর আমার যে ক্ষমতা, এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আমার ওপর আল্লাহ তাআলার রয়েছে। আজ তার ওপর যদি আমি রাগ কার্যকর করি, তাহলে কাল কিয়ামতে আল্লাহর ক্রোধ থেকে আমাকে বাঁচাবে কে? তখন তো আমারও ক্ষমার প্রয়োজন হবে। সুতরাং অপরকে মাফ করলে সম্ভবত আমিও মাফ পেয়ে যাব। এক সহীফায় আল্লাহ তাআলার এই উক্তি বর্ণিত আছে, হে আদম সন্তান, তোমার রাগের সময় আমাকে স্মরণ করো, আমার গোসসার সময় আমি তোমাকে স্মরণ রাখবো। (কিতাবুয যুহদ, আহমাদ : ৪৫; রওযাতুল উকালা, ইবনে হিব্বান : ৫০)

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) এক খাদেমকে কাজের জন্যে পাঠালেন। সে অনেক দেরিতে ফিরে আসে। তিনি বললেন,

لَوْلَا الْقِصَاصُ لَأَوْجَعْتُكَ অর্থাৎ, কিয়ামতের প্রতিশোধ না থাকলে আমি তোমাকে কষ্ট দিতাম। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৬৯০১; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২৩ : ৩৭৬)

ইতিহাস বলছে, বনী ইসরাঈলের প্রত্যেক বাদশার সাথে একজন করে উপদেষ্টা থাকতো। বাদশাহ যখন রাগান্বিত হতো, তখন উপদেষ্টার দায়িত্ব ছিল বিচারকার্য করার সময় বা রাগের মুহূর্তে বাদশার হাতে চিরকুট ধরিয়ে দেওয়া। তাতে লেখা থাকত, মিসকিনের প্রতি সদয় হোন, মৃত্যুকে ভয় করুন এবং কিয়ামতের কথা স্মরণ করুন। চিরকুট দেখেই বাদশার ক্রোধ দমে যেত। (ইবনু আবিদ দুনিয়া, যাম্মুল গাদাব)

৩. ক্রোধের পরিণতিতে সৃষ্ট শত্রুতা ও প্রতিশোধ, স্পৃহা সম্পর্কে নিজেকে সতর্ক করবে। আরও সতর্ক করবে শত্রুর রুখে দাঁড়ানো আপনার অধিকার নষ্ট করতে তার প্রচেষ্টা ও আপনার বিপদে-আপদে তার হাসিমুখ থেকে। আর এগুলোও অনেক বড় বিপদ। তাই আখেরাতের ভয় যদি মনে নাই আসে, তাহলে দুনিয়ার এসব বিপদাপদের কথা স্মরণ করে ক্রোধকে দমন করে রাখবে।

এটাকে বলা হয় প্রবৃত্তিকে ক্রোধের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। আর তা আখেরাতের জন্য উপকারী কোনো কর্ম নয়। এতে কোনো সাওয়াবও নেই। কেননা সে তার প্রাপ্যাংশ একের পর এক পেয়েই যাচ্ছে। তবে তার কাজকর্ম ও জ্ঞানচর্চার সাথে পার্থিবতা ওতপ্রোতভাবে জাড়িয়ে থাকে, যা তার পারলৌকিক জগতের জন্য সহায়ক হয় না। কাজেই সে সাওয়াব পাবে না।

৪. তোমার অপর ভাইয়ের চেহারা ক্রোধের সময় যেমন বিবর্ণ হয়ে যায়, নিজের চেহারাকে ক্রোধান্নিত মানুষের মতো মনে করবে এবং ধ্যান করবে। ক্রোধের কারণে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির চেহারা ও আকার-আকৃতি ক্রুদ্ধ কুকুর অথবা হিংস্র প্রাণীর মতো হয়ে যায়। এর বিপরীতে ধৈর্যশীল, গম্ভীর ও ক্রোধ বর্জনকারী ব্যক্তির চেহারা নবী, অলী, আলিম ও দার্শনিকের চেহারার মতো থাকে। এখন কোন চেহারা সে গ্রহণ করবে, তা নিজেই বেছে নেবে। বুদ্ধিমান হলে মহাপুরুষদের চেহারাই বেছে নিতে বাধ্য হবে।

৫. প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠা এবং রাগ দমনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর পেছনে কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। ভেবে বের করা যে, সেটা কি?

যেমন মনে শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রদান। এটা তোমাকে তুচ্ছ, অপদস্থ, অপমানিত, নীচ হিসেবে সাব্যস্ত করছে। মানুষের চোখে ছোটো করে দিচ্ছে। শয়তান এসব ভাবনা মানুষের মনে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিশোধের দিকে ঠেলে দিতে চায়। তখন মানুষের উচিত মনে মনে এমন কথা চিন্তা করা। অবাক কাণ্ড, হে নফস, আজকে প্রতিশোধ নিতে তুমি যাচ্ছো? ভুলে যাচ্ছো আখেরাতের কথা, যখন সামান্য অবিচারের হিসাব তোমাকে দিতে হবে? আজকে লোকদের চোখে তোমার ছোটো হয়ে যাওয়া তোমার কাছে বড় বিষয় হয়ে গেলো? অথচ এমনটা করলে একদিন আল্লাহ, ফেরেশতা ও নবীদের সামনে তোমাকে নত মুখে দাঁড়াতে হবে!

রাগ দমন করতে হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে মানুষকে সে পরোয়া করবে না। আজ প্রতিশোধ নিয়ে কিয়ামতের দিন অপদস্থ হওয়ার চেয়ে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। তাহলে সে এমন লোকদের কাতারে দাঁড়াবে কিয়ামতের দিন যখন ঘোষণা করা হবে, আল্লাহর কাছে যাদের প্রতিদান পাওনা রয়েছে তারা যেন দাঁড়ায়, তখন তারা অর্থাৎ, ক্ষমাশীলরাই দাঁড়াবে।

৬. এ কথা চিন্তা করবে যে, আমার রাগের কারণ, আমার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ না হয়ে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া। আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া নেহাত বোকামী। সম্ভবত এ কারণে আমার ওপর আল্লাহর ক্রোধ আমার ক্রোধের চেয়েও বেশি হবে।

রাগের মুহূর্তে আমল সম্পর্কিত প্রতিষেধক হচ্ছে, মুখে বলবে-

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

রাগের সময় দুআ করার জন্য আদেশ হাদিসে বর্ণিত আছে। এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা) যখন ক্রোধান্বিত হতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নাক ধরে বলতেন, প্রিয় আয়েশা বলো,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَأَجُرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ.

হে আল্লাহ! নবী মুহাম্মদের রব, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার মনের ক্রোধ দূর করুন এবং আমাকে বিভ্রান্তকারী ফিতনা থেকে আশ্রয় দিন। (সহিহ বুখারী : ৩২৮২; সহিহ মুসলিম : ২৬১০)

রাগের সময় এ দুআটি পড়া মুস্তাহাব। যদি এই দুআয় ক্রোধ দমন না হয়, তবে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। উদ্দেশ্য, নিজেকে মাটির নিকটবর্তী করে দেবে, যাতে জানতে পারো যে, তুমি এই মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছ এবং পরিশেষে এই মাটিতেই যেতে হবে। এই আমলের ফলে নফসের হীনতা বুঝে আসবে। উত্তাপের কারণেই ক্রোধ জন্ম নেয় এবং উত্তাপ গতিশীলতার কারণে ঘূর্ণায়মান। বসা অথবা শোয়ার

দ্বারা যখন গতিশীলতা কমে যাবে, তখন আশা করা যায়, ক্রোধও দূর হয়ে যাবে। এ আমলটিও হাদিসে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে,

اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوْقَدُ فِى الْقَلْبِ اَلَمْ تَرَوْا اِلَى اِنْتِفَاخِ اَوْدَاجِهٖ وَجَمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَقُمْ.

রাগ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তোমরা দেখ না, রাগান্বিত ব্যক্তির ঘাড়ের রগগুলো ফুলে যায়, চক্ষু লালবর্ণ হয়ে যায়? তোমাদের কেউ যদি নিজের মধ্যে এ অবস্থা হতে দেখে, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়বে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। (জামে তিরমিযী : ২১৯১; অনুরূপ অর্থে)

যদি এরপরও রাগ নিয়ন্ত্রণে না আসে তাহলে ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু অথবা গোসল করে নেবে। কারণ, পানি ছাড়া আগুন নেভে না।

হাদিসে বর্ণিত আছে,

اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ بِالْمَاءِ فَاِنَّمَا الْغَضَبُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়, সে যেন পানি দিয়ে অযু করে। কারণ আগুন থেকে ক্রোধের জন্ম।

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে,

اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

অর্থাৎ, অবশ্যই গোসসা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, শয়তান আগুন থেকে সৃজিত আর পানি দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ রাগ করলে সে যেন ওযু করে নেয়। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৮৪; মুসনাদে আহমদ : ৪ : ২২৬)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন তুমি ক্রুদ্ধ হও তখন চুপ করে থাকো। (মুসনাদে আহমাদ : ১ : ২৮৩; সহিহ বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ : ১৩২০; আল মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১১ : ৩৩)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়ানো অবস্থায় রেগে গেলে বসে পড়তেন। বসা অবস্থায় রেগে গেলে পাশ দিয়ে শুয়ে পড়তেন। তখন রাগ পড়ে যেত । (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৩)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন,

اَلَا اِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ اَوْدَاجِهٖ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَلْيَلْصَقْ خَدَّهٗ بِالْاَرْضِ.

অর্থাৎ, সাবধান গোসসা হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা আদম সন্তানের অন্তরে থাকে। তার চক্ষুদ্বয়ের লাল বর্ণ এবং ঘাড়ের শিরাগুলোর স্ফীতি দেখ না? যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ অবস্থা দেখে, সে যেন আপন গণ্ডদেশ মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়। (জামে তিরমিযী : ২১৯১)

এ হাদিসে সিজদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহের সেরা অঙ্গটি সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ মাটিতে রাখা উচিত, যাতে নফস তার হীনতা বুঝতে পেরে ক্রোধের কারণ অহংকার থেকে বিরত থাকে।

একদিন ওমর (রা) রাগান্বিত হয়ে নাকে পানি দিতে থাকেন এবং বলেন, রাগ শয়তানের প্ররোচনা থেকে হয় এবং নাকে পানি দেওয়ার এই আমল দ্বারা শয়তান দূর হয়। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৩)

ওরওয়া ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আমি যখন মাদইয়ানের শাসক নিযুক্ত হই, আমার পিতা আমাকে বললেন, তুমি শাসক হয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যখন তোমার রাগ হয় তখন আসমান-জমিন দেখে এদের স্রষ্টার মাহাত্ম্য স্বীকার করবে, অর্থাৎ সিজদা করবে। (রওযাতুল উকালা, ইবনে হিব্বান : ২১২; তারিখে দামেশক, ইবনে আসাকির : ৪৫: ২২১)

আবু যর (রা) কোনো এক লোকের সাথে বিবাদের সময় তাকে হাবশির বাচ্চা বলে গালি দেন। একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (স) আবু যর (রা)-কে বলেন, আবু যর, শুনলাম তুমি নাকি আজ এক লোকের মা পাল্টে ফেলার মতো মন্তব্য করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবং তিনি লোকটিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার কাছে গেলেন, সালাম বিনিময় করলেন, একথাও রাসূলুল্লাহ (স) জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, আবু যর,

মাথা উঁচু করো। তাকাও আমার দিকে। শোনো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন কর্ম দিয়ে মর্যাদার প্রকাশ ঘটাতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার আর একজন হাবশি লোকের মধ্যে কোনোই ব্যাবধান নেই। যখন তুমি রেগে যাবে, দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ো। বসা থাকলে হেলান দিয়ে শরীর ছেড়ে দাও। হেলান দেওয়া থাকলে পাশ দিয়ে শুয়ে পড়ো। (সহিহ বুখারী : ৩০; সহিহ মুসলিম : ১৬৬১; অনুরূপ অর্থে)

মুতামার ইবনে সুলাইমান (র) বলেন, পূর্ব যুগের কোনো এক ব্যক্তি তিনটি কাগজে তিনটি কথা লিখলেন। তারপর কাগজ তিনটি তিনজন লোককে দিলেন। প্রথমজনকে বললেন, যখন আমি রেগে যাবো তখন তুমি আমাকে এই কাগজটা দেবে। দ্বিতীয়জনকে বললেন, যখন আমার রাগ কিছুটা কমে আসবে তখন এই কাগজটা দেবে। তৃতীয়জনকে বললেন, যখন আমার রাগ পড়ে যাবে তখন তুমি আমাকে এই কাগজটা দেবে।

কিছু দিন পর কোনো কারণে লোকটা প্রচন্ড রেগে গেলো। তখন তাকে প্রথম কাগজটা দেওয়া হলো। তাতে লেখা ছিলো 'কি হলো, তুমি এত রেগে যাচ্ছো কেন? তুমি তো খোদা নও। সাধারণ একজন মানুষ। অচিরেই তোমার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গকে গ্রাস করে ফেলবে।

তার রাগ কিছুটা কমে এলো। তখন তাকে দেওয়া হলো দ্বিতীয় কাগজটা। তাতে লেখা আছে, জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি তুমি দয়ার্দ্র হও। আকাশের অধিপতি তোমার প্রতি দয়া করবেন।

তারপর দেওয়া হলো তৃতীয় কাগজ। তাতে লেখা ছিল, আল্লাহর অধিকারের কথা মাথায় রেখে মানুষের সাথে মুআমালা করো। কারণ এটাই তাদের প্রাপ্য মর্যাদা।'

রাগ হজম করার ফযিলত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ এবং যারা রাগ হজম করে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ وَمَنْ خَذَلَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ.

অর্থাৎ, যে তার রাগকে নিবারণ করে আল্লাহ তার আযাবকে নিবারণ করবেন। যে তার রবের কাছে ওযর পেশ করে, আল্লাহ তার ওযর কবুল করেন। যে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৪)

তিনি আরও বলেন,

اَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَه نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَاَحْلَمُكُمْ مَنْ عَفَا بَعْدَ الْقُدْرَةِ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়চেতা সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় আপন নফসের উপর বিজয়ী হয় এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সহনশীল সে ব্যক্তি, যে সক্ষমতা সত্ত্বেও ক্ষমা করে। (আসকারি : তাসহিফাতুল মুহাদ্দিসিন : ১ : ৩৪৯; দায়লামি : মুসনাদে ফেরদাউস : ৮৫০)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ اَنْ يُّمْضِيَهُ اِمْضَاءً مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًا.

যে লোক এমন মুহূর্তে রাগ হজম করে, ইচ্ছা করলে তা অব্যাহত রাখতে পারে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা তার অন্তর পূর্ণ করে দেবেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ২৫)

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে,

مَا جَرَعَ عَبْدٌ جَرْعَةً اَعْظَمَ اَجْرًا مِّنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ.

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ হজম করে ফেলার সমান নেকী কোনো কিছুর মধ্যে নেই। (ইবনে মাজাহ : ৪১৮৯)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যারা আপন ক্রোধ দমনের জন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে তারা জাহান্নামের নির্দিষ্ট একটা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে। (আলবাযযার : মুসনাদ : ৫১৮০; আলকামিল, ইবনে আদি : ৬ : ৫১; শুআবুল ইমান, বায়হাকি : ৭৯৭৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানুষের রাগ দমন করা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়। বান্দ রাগ দমন করলে আল্লাহ তার অন্তর ঈমান দিয়ে ভরে দেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, রাগ চরিতার্থ করার সক্ষমতা সত্ত্বেও যে তা দমন করবে আল্লাহ তাকে সব মানুষের সামনে কিয়ামতের দিন ডেকে নেবেন। এবং হুরদের থেকে নিজের পছন্দমতো হুরকে নির্বাচন করার ইচ্ছাধিকার দিবেন। (সুনানে আবি দাউদ : ৪৭৭৭; জামে তিরমিযী : ২৪৯৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৮৬)

সাহাবীদের উক্তি

ওমর (রা) বলেন, মুত্তাকি ব্যক্তি নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করে না। যে আল্লাহকে ভয় করে সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে না। কিয়ামতের ভয় মানুষের অন্তরে না থাকলে তোমাদের দেখা পৃথিবী সত্যিই অন্যরকম হতো। (দাইনুরি আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৪০৫)

লুকমান (আ) তার পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র, তুমি চোখের জল কারও কাছে কিছু চাইতে ব্যয় করো না। অন্যায়ভাবে রাগ প্রকাশ করো না। নিজের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত থাকো। তোমার জীবনাচার তোমাকে উপকৃত করবে।

আইউব সাখতিয়ানি (র) বলেন, এক মুহূর্ত কষ্ট সহ্য করে থাকা অনেক অনিষ্ট দূর করে দেয়। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৮০৬৮)

একবার সুফিয়ান সাওরী, আবু খুযায়মা ও ফুযাইল ইবনে ইয়ায (র) এক জায়গায় একত্র হন এবং সংসার নির্লিপ্ততা সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ক্রোধের আত্মনিয়ন্ত্রণ করা এবং লোভ আত্মসংবরণ।

এক ব্যক্তি ওমর (রা)-কে বলল, আপনি বিচার-বণ্টনে ইনসাফ করেন না এবং দানে আপনার হাত প্রশস্ত নয়। এতে তিনি খুব রাগান্বিত হলেন, মুখমণ্ডলে তার ভাঁজ ফুটে উঠল। তখন এক ব্যক্তি আরজ করল, আমীরুল মুমিনীন!

আপনি কি শোনেননি, আল্লাহ তাআলা অজ্ঞদের সম্পর্কে বলেছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

অর্থাৎ, ক্ষমা অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন এবং মূর্খদের থেকে বিরত থাকুন। (সূরা আরাফ : ১৯৯)

ওমর (রা) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর যেন একটি আগুন দপ করে নিভে গেল। (সহিহ বুখারী : ৪৬৪২)

মুহাম্মদ ইবনে কাব (র) বলেন, তিনটি বিষয় কারও মধ্যে একত্র হলে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এক, খুশির সময় বাতিল বিষয়াদিতে প্রবেশ করবে না। দুই, রাগের মূহূর্তে সত্যের সীমা অতিক্রম করবে না। তিন, মুহাম্মাদ ইবনে কাব (রা) বলেন, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকবে সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হবে। আপন সন্তুষ্টিকে সে অন্যায় ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে না। ক্রোধোন্মত্ত হলো সে হকের সীমা থেকে বের হয়ে যাবে না। সক্ষম হলেও সে অন্যের জিনিসের দিকে হাত বাড়াবে না। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ৩১২)

কোনো এক ব্যক্তি সালমান ফারসি (রা)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। সালমান ফারসি (রা) বললেন, কখনো ক্রুদ্ধ হয়ো না। লোকটা বললো, আমার পক্ষে ক্রোধ দমন করা সম্ভব নয়।

সালমান ফারসি (রা) বললেন, তাহলে ক্রোধের সময় তুমি তোমার মুখ ও দুহাত নিয়ন্ত্রণে রেখো।

সবরের ফযিলত

রাগের একটি বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সহনশীলতা। তা হচ্ছে রাগের মধ্যে স্ফুটন না হওয়া। যদি হয়ও তবে প্রশমিত করতে বেগ না পাওয়া। এ অবস্থা রাগ হজম করার চেয়ে উত্তম। কেননা, রাগ হজম করার অর্থ— হচ্ছে জোরপূর্বক সহনশীল হওয়া। সুতরাং তা হতে পারে না। কেননা, সহনশীলতা একটি মজ্জাগত স্বভাব। যা দ্বারা বুদ্ধির পূর্ণতা প্রমাণিত হয় এবং ক্রোধশক্তি অনুগত ও পরাজিত থাকে। কিন্তু শুরুতে জোরপূর্বক সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে এ স্বভাবটি হাসিল হয়।

হাদিসে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ وَمَنْ يَّتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَّتَوَقَّ الشَّرَّ يُوْقَهُ.

ইলম অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে এবং সহনশীলতা অর্জিত হয় জোরপূর্বক সহনশীল হওয়ার মাধ্যমে। যে ব্যক্তি কল্যাণ চায়, তা পায় এবং যে অনিষ্ট

থেকে বাঁচার ইচ্ছা করে সে নিরাপদ থাকে। (তাবারানি আল আওসাত : ২৬৮৪; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ১৮৪)

এ থেকে জানা গেল, সহনশীলতা অর্জনের উপায় হচ্ছে প্রথমে জোরপূর্বক সহনশীল হওয়া। যেমন ইলম হাসিলের জন্য শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوْا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِيْنَةَ وَالْحِلْمَ وَلَيِّنُوْا لِمَنْ تُعَلِّمُوْنَ وَلِمَنْ تَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبَ جَهْلُكُمْ حِلْمَكُمْ.

ইলম তালাশ করো এবং ইলমের সাথে গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা তালাশ করো। তোমরা নম্র হও তার জন্য যাকে শেখাও এবং যার নিকট থেকে শেখো। স্বেচ্ছাচারী আলেম হয়ো না। তাহলে তোমাদের অজ্ঞতা ইলমের ওপর প্রবল হয়ে যাবে। (ইবনে আদী, আলকামিল : ৪ : ৩৩৫; মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ২৩৮)

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, ক্রোধে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হচ্ছে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা এবং এটাই নম্রতা ও সহনশীলতার পথে প্রতিবন্ধক।

রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِيْ بِالْعَافِيَةِ.

হে আল্লাহ, আমাকে ইলম দ্বারা ধনী করুন, সহনশীলতার মাধ্যমে সজ্জিত করুন, তাকওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত করুন এবং সুস্থতার মাধ্যমে সুন্দর করুন। (ইবনে আবিদ দুনয়া : হিলম : ৩)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদা চাও। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল, উচ্চমর্যাদা কি? তিনি বললেন, যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক রাখো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দান করো। তোমার প্রতি অজ্ঞদের মন্তব্যকে তুমি সহনশীলতার সাথে গ্রহণ করো। (আল হিলম, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ৪)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পাঁচটি কাজ নবীদের সুন্নত। লজ্জাশীলতা সহনশীলতা, শিঙ্গা লাগানো, মেসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। (প্রাগুক্ত : ৬)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার এক লোক এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার এক আত্মীয় আছে। আমি তাদের সথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি। তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি ভালো ব্যবহার করলে তারা খারাপ ব্যবহার করে। তারা আমার বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করে। আমি সহ্য করে যাই।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি যেন তাদের মাটির কাছে নামিয়ে আনছ। এই আচরণ তুমি যতক্ষণ করতে থাকবে তোমার সাথে ততক্ষণ সাহায্যকারী ফেরেশতা অবস্থান করবে। (সহিহ মুসলিম : ২৫৫৮)

এক সাহাবি আল্লাহর কাছে দুআ করেন, আয় আল্লাহ! আমার কাছে সদকা করার মতো সম্পদ নেই। তাই যে ব্যক্তি আমার সম্মানহানি করার চেষ্টা করবে তা হবে আমার পক্ষ থেকে সদকা।

তখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (ইবনু আবিদ দুনইয়া : মুদারাতুন নাস : ৯)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আবু দমদমের মতো হতে পারে না? সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, কে এই আবু দমদম?

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে ছিল পূর্বযুগের একজন মানুষ। প্রতিদিন সকালে উঠে সে দুআ করতো, হে আল্লাহ! আজ যারা আমার প্রতি অবিচার করে আমাকে তুচ্ছ করতে চাইবে, এর সবকিছু আপনি সদকা হিসেবে গ্রহণ করুন। (মাকারিমুল আখলাক, তাবারানি : ৫৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ কিন্তু তোমরা খোদাভক্ত হয়ে যাও) এই আয়াতের তাফসিরে অনেকে বলেন, তোমরা আলেম ও সহনশীল হয়ে যাও।

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا এই আয়াতের তাফসিরে হাসান বসরি (র) বলেন, তারা হলেন, সহনশীল। তাদের সাথে যখন মূর্খতার আচরণ করা হয় তখন তারা এরকম আচরণ করেন। (আল হিলম, ইবনু আবিদ দুনয়া : ১০)

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا এই আয়াতের তাফসিরে আতা ইবনে আবি রাবাহ (র) বলেন, এখানে هَوْنًا অর্থ হলো حِلْمًا অর্থাৎ তারা জমিনের ওপর সহনশীলতার সাথে চলাচল করে। (প্রাগুক্ত : ১১)

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا এই আয়াতের তাফসিরে মুজাহিদ (র) বলেন, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হলে তারা ক্ষমা করে দেন। (মুদারাতুন নাস, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ২৫)

বর্ণিত আছে যে, একবার ইবনে মাসউদ (রা) কোনো বেহুদা কাজের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, ইবনে মাসউদ আজ সারাদিনের জন্য মহান হয়ে গেলে। (ইবনে আবি হাতিম : ১৫৪৬; তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৩৩ : ১২৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন সময় দেখাবেন না যখন জ্ঞানীর অনুসরণ করা হবে না। সহনশীলকে লজ্জা করা হবে না। যখন মানুষের ভাষা তো থাকবে আরবি, কিন্তু তাদের অন্তর হয়ে যাবে অনারবি। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৩৪০)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল তারা যেন (জ্ঞানের পর্যায় হিসেবে নামাযে) আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তোমরা মতভেদে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে তোমাদের চিত্তও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।। আর তোমরা বাজারঘাটের গোলযোগ থেকে বেঁচে থেকো। (সহিহ মুসলিম : ৪৩২; সুনানে আবু দাউদ : ২২৮)

বর্ণিত আছে, কোনো এক প্রতিনিধি দলের সাথে আশাজ নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন। প্রতিনিধি দল মদিনায় পৌঁছলে তিনি উটের পিঠ থেকে নেমে। উটকে বাঁধলেন। পরনের কাপড় খুলে নতুন পোশাক পরলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তার এসব আচরণ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে দুটি চরিত্র আছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন। তিনি বললেন, আপনার জন্য আমার বাবা-মা উৎসর্গ হোন, সেই দুটি চরিত্র কী? তিনি বললেন, ধৈর্য ও স্থিরতা।

আশাজ (রা) বললেন, এই দুটি চরিত্র কি আমাকে সৃষ্টিগতভাবেই দেওয়া হয়েছে না আমি তা অর্জন করেছি?

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, বরং এ দুটি গুণ আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন। তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাকে এমন দুটি গুণ দান করেছেন যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন। (সুনানে আবু দাউদ : ৫২২৫; সহিহ মুসলিম : ১৮)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার মধ্যে এই তিনটি গুণের একটিও থাকবে না, তার আমল-নামায় কোনো কিছুই উঠবে না।

১. তাকওয়া : যা তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে মুক্ত রাখবে।

২. ধৈর্য : যা তাকে অজ্ঞদের থেকে বাঁচাবে।

৩. উত্তম চরিত্র : যা দিয়ে সে সমাজে বসবাস করবে। (আল হিলম, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ৫৫; খারাইতি মাকারিমুল আখলাক : ২৯; আল মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২৩ : ৩০৭)

এক হাদিসে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الْحَيِيَّ الْغَنِيَّ الْمُتَعَفِّفَ التَّقِيَّ وَيَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ الْغَيِيَّ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সহনশীল, লজ্জাশীল, ধনী, পবিত্র মুত্তাকীকে পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন নির্লজ্জ, বাচাল, নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়ালকারীকে। (আল হিলম, ইবনে আবিদ দুনয়া : ৫০)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষকে সমবেত করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, আজ গুণী ব্যক্তিরা কোথায়? এরপর কিছু লোক দাঁড়াবে এবং জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাবে। ফেরেশতারা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমরা জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাচ্ছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমরা গুণীজন। ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের মধ্যে কী গুণ ছিল? তারা জবাব দেবে, আমরা জুলুম নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করতাম। কেউ আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে আমরা ক্ষমা করে দিতাম। কেউ মূর্খতা প্রকাশ করলে আমরা সহনশীলতা প্রদর্শন করতাম। ফেরেশতারা বলবে, তোমরা

জান্নাতে প্রবেশ করো। এমন আমলকারীদের প্রতিদান কতো মহান। (আল হিলম, ইবনে আবিদ দুনয়া : ৫৬; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭৭৩১)

ওমর (রা) বলেন, তোমরা ইলম অর্জন করো। আর ইলমকে সহ্য করার জন্য হিলম ও সাকিনা অর্জন করো।

(দাইনুরি : আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ২০৭; আলকামিল, ইবনে আদি : ৪ : ৩৩৫; মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ২৩৮)

হাসান বসরি (র) বলেন, ইলম অর্জন করে তাকে স্থিরতা ও সহ্যক্ষমতা দিয়ে সাজিয়ে তোলো। (আলকামিল, ইবনে আদি : ৪ : ৩৩৫; মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ২৩৮; অনুরূপ অর্থে)

আবুদ দারদা (রা) বলেন, একটা সময় মানুষ ছিল পল্লবিত বৃক্ষের মতো। যাতে কোনো কাঁটা ছিলো না।

এখন মানুষ হয়ে গেছে কাঁটাদার গাছের মতো। যাতে কোনো পাতা নেই।

তুমি তাদের সমালোচনা করলে সে-ও সমালোচনা করবে। তাদের তুমি ছেড়ে দিলে তারা তোমাকে ছাড়বে না।

লোকেরা জানতে চাইলো, এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

আবুদ দারদা (রা) বলেন, প্রয়োজনের দিন অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনের জন্য তুমি সম্মান (দুনিয়ার সম্মান) ত্যাগ করবে। (মুদারাতুন নাস, ইবনু আবিদ দুনয়া : ১৩)

রাবিয়া (রা) বলেন, যতক্ষণ না কোনো মানুষ বিচক্ষণতা অজ্ঞতার ওপর, ধৈর্যকে প্রবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারবে ততক্ষণ সে বিচারকার্য পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। আর তা ইলমের শক্তি দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। (আল হিলম, ইবনু আবিদ দুনয়া : ১৩)

আলী (রা) বলেন, অর্থসম্পদ বেড়ে যাবে এবং সন্তানসন্ততি অনেক হবে, বরকত এর নাম নয়। বরকত হচ্ছে ইলম ও সহনশীলতা অধিক হওয়া। লোকদের সাথে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে। যখন এসব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, তখন আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর যখন খারাপভাবে করবে ইস্তেগফার করবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৭৫; আল হিলম, ইবনু আবিদ দুনয়া : ৬০)

হাসান বসরি (র) বলেন, ইলম তলব করো এবং নিজেকে প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা দিয়ে সজ্জিত করে তোলো। আকসাম ইবনে সায়ফী (রা) বলেন, বুদ্ধির স্তম্ভ হচ্ছে, সহনশীলতা এবং সব কথার মূল সবর। আলী (রা) বলেন, সহনশীলতার প্রথম পুরস্কার এটাই যে, সকল মানুষ তার পক্ষে থেকে তার অনিষ্টকারীকে প্রতিহত করে। মুয়াবিয়া (রা) আমর ইবনে আসামকে জিজ্ঞেস করলেন, বীরপুরুষ কে? তিনি বললেন, যে আপন সহনশীলতা দ্বারা মূর্খতাকে হটিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন করলেন, দানবীর কে? তিনি জওয়াব দিলেন, যে দুনিয়াতে দীনের কল্যাণার্থে অর্থসম্পদ ব্যয় করে। (আল হিলম, ইবনু আবিদ দুনয়া : ২২)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ.

অতঃপর তুমি দেখবে, তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এটা তারাই পায়, যারা সবর করে এবং এটা তারই প্রাপ্য যে মহাভাগ্যবান। (সূরা হা-মিম সাজদাহ : ৩৪-৩৫)

এ আয়াতের তাফসীরে আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এখানে সে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যাকে তার কোনো ভাই গালি দিলে সে প্রত্যুত্তরে বলে— তুমি মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আর তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহ আমাকে মার্জনা করুন। (মুদারাতুন নাস, ইবনে আবিদ দুনয়া : ৪৯)

জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি বসরাবাসী এক ব্যক্তিকে গালি দিলাম। সে কিছু না বলে আমার গালি সহ্য করে নিলো এবং এই আচরণের কারণে সে আমাকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেলো। (আল হিলম : ৩৪)

মুয়াবিয়া (রা) একবার আরাবা ইবনে আউস আনসারীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সরদার হলে কীভাবে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যারা মূর্খ, আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি। আর যারা সাহায্য চায় তাদের দান করি এবং অভাব মোচনে চেষ্টা করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার মতো কাজ করবে, সে আমার মতো হবে, যে

আমার চেয়ে বেশি কাজ করবে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। আর যদি কম কাজ করে তবে আমি তার চেয়ে উত্তম হব। (ইবনে আবিদ দুনিয়া : আল হিলম : ৩৯)

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে গালি দিলো। তিনি বললেন, ইকরিমা, দেখো তো, তার কোনো চাহিদা আছে কি না, যা আমরা পূরণ করতে পারি।

একথা শুনে লজ্জায় লোকটার মাথানত হয়ে গেলো। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৩৩)

এক ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-কে বললো, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আপনি ফাসেক। ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) বললেন, আপনার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। (ইতহাফুল সাদাতিল মুত্তাকিন)

আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রা)-কে একবার কোনো এক ব্যক্তি গালি দিলো। তিনি তার চাদরটি তার দিকে ছুড়ে মারলেন এবং তাকে এক হাজার দিরহাম দানের নির্দেশ দিলেন। (তারিখে দিমাশক, ইবনুল আসাকির : ৪১ : ৩৯৪)

তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন, আলী ইবনুল হুসাইনের মধ্যে পাঁচটি প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ ঘটেছিলো, সেগুলো হলো, কষ্ট সহিষ্ণুতা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া। আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এমন বিষয় থেকে লোকটাকে মুক্ত করা। তাকে অনুতাপ ও তাওবার দিকে নিয়ে আসা এবং নিন্দা করার পর লোকটার মুখ থেকে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করা। আর তিনি দুনিয়ার সামান্য কিছু দিরহামের বিনিময়ে এসব গুণ অর্জন করেছেন।

খলিল ইবনে আহমাদ (র) বলেন, দুর্ব্যবহারকারী ব্যক্তির সাথে যদি সদাচার করা হয় তখন তার মনে একটা প্রাচীর তৈরি হয় যা তাকে দ্বিতীয়বার দুর্ব্যবহার করতে বাধা দেয়। (আল হিলম, ইবনে আবিদ দুনইয়া : ৪৬)

জাফর ইবনে মুহাম্মাদকে জনৈক ব্যক্তি বললো, আমার ও কিছু লোকের মধ্যে বিবাদ আছে। আমি তা মিটিয়ে ফেলতে চাই। কিন্তু লোকেরা আমাকে বলে, এতে নাকি অপদস্থতা আছে।

জাফর (র) বলেন, অপদস্থতা বা যিল্লতি জালেমেরই হয়। তোমার কোনো যিল্লতি নেই।

আহনাফ ইবনে কায়েস (র) বলেন, আমি কষ্টসহিষ্ণু নই। তবুও আমাকে সহ্য করতে হয়। (আল হিলম, ইবনে আবিদ দুনইয়া : ৪৮)

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, যে দয়া করে সে দয়া অজ্ঞতার কারণে পরাজিত হতে হয়। তাড়াহুড়া করলে ভুল হয়। মন্দ কাজে আগ্রহ বিপদ ডেকে আনে। তর্কবিতর্ক করলে নিন্দিত হতে হয়। গালমন্দকে ভালো মনে করলে গুনাহগার হতে হয়। মন্দকে অপছন্দ করলে পাপমুক্ত থাকা যায়। আল্লাহর নির্দেশ মেনে চললে নিরাপদ থাকা যায়। আল্লাহর হকের বিষয়ে সতর্ক থাকলে নিশ্চয়তা লাভ করা যায়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করলে অভাবে থাকতে হয়। আল্লাহর সঙ্গে না থাকলে অপদস্থ হতে হয়।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে সফল হওয়া যায়। (প্রাগুক্ত : ৪৯)

এক ব্যক্তি মালেক ইবনে দিনার (র)-এর কাছে এসে বললেন, শুনলাম, আপনি নাকি আমার সমালোচনা করেছেন?

মালেক (র) বলেন, তাহলে তো তুমি আমার কাছে নিজের চেয়েও বেশি সম্মানিত ব্যক্তি। কারণ আমি যখন এমন কোনো ভুল করে ফেলেছি তখন আমার সব ভালোকাজ তোমার নামে করে দিয়েছি। (প্রাগুক্ত : ৫১)

জনৈক আলেম বলেন, ইলমের চেয়ে হিলমের মর্যাদা বেশি। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার নাম রাখা হয়। (প্রাগুক্ত : ১৫)

এক ব্যক্তি জনৈক দার্শনিককে বলল, আমি আপনাকে এমন গালি দেবো যা সাথে করে আপনি কবরে নিয়ে যাবেন। দার্শনিক বললো, আমার কবরে নয় বরং তা আপনার সাথে কবরে যাবে। (আনসারুল আশরাফ, বালাযুরি : ১২ : ৩২৩)

একবার ঈসা (আ) একদল ইহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা তাকে মন্দ কথা বললেন। কিন্তু তিনি তাদের ভালো কথাই বললেন। তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, নিজের ভাণ্ডারে যা আছে মানুষ তো শুধু তাই বের করতে পারে।

লোকমান (আ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন, তিনটি বিষয় আছে এমন তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া যা চেনা যায় না। দুর্বলতার সময়ে কষ্ট সহিষ্ণুতা। যুদ্ধের সময় সাহসিকতা। প্রয়োজনের সময় আত্মীয়তা। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭ : ৩৮৯)

এক দার্শনিকের কাছে একদিন তার বন্ধু বেড়াতে এলো। বন্ধুকে খাবার পরিবেশন করা হলো। তখন ঘরের ভেতর থেকে দার্শনিকের দুরাচারি স্ত্রী বের হয়ে এলো এবং খাবার দাবার সব নিয়ে স্বামীর বদনাম ও গালিগালাজ করতে শুরু করল।

তখন বন্ধুটি রেগে গিয়ে ফেরার পথ ধরল। দার্শনিক ছুটে গিয়ে বন্ধুকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, মনে পড়ে একদিন আমরা তোমার বাড়িতে খেতে বসেছিলাম। তখন একটা মোরগ উড়ে এসে খাবারের ওপর পড়েছিলো। সেদিন আমরা কেউই খাবার মুখে তুলতে পারিনি। সেদিন তো আমরা কেউই রাগ করিনি। তাই না?

বন্ধু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। দার্শনিক বলল, আজকের ঘটনাকেও তুমি সেদিনের ঘটনার মতোই মনে করো। আমার স্ত্রীকে সেদিনের মুরগির মতোই ভেবে নাও।

দার্শনিকের কথা শুনে বন্ধুর রাগ পড়ে গেলো এবং সে মনে মনে বলল, আসলে সে সত্যি কথাই বলেছে। কষ্টসহিষ্ণুতাই সকল ব্যথার মলম।

কবি মাহমুদ ওয়াররাক বলেন, মানুষ আমার ওপর যতই অবিচার করুক, আমি ক্ষমার আচরণই করবো।

মানুষ তিন ধরনের হয়। সভ্য অসভ্য ও মধ্যপন্থি। তাই যারা আমার চেয়ে সম্মানী তাদের আমি সম্মান করি। তাদের কাজকর্ম থেকে হকের অনুসরণ করি। কারণ, হক অবশ্য অনুকরণীয়।

যারা আমার চেয়ে নিচু স্তরের তাদের মন্দ কথার জবাবে চুপ থেকে আমি আত্মসম্মান বজায় রাখি। নিন্দুকরা তাতে যতই নিন্দা করুক।

আর যারা আমার সমস্তরের, পা পিছলে পড়ে গেলেও আমি তাদের সম্মান করি। নিশ্চয় কল্যাণের ক্ষেত্রে সম্মানই বিচারকের ভূমিকায় থাকে।

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে পরিমাণ কথা বলা যাবে

জুলুমের পরিবর্তে জুলুম করা এবং অন্যায়ের মোকাবেলায় অন্যায় করা তো সম্পূর্ণ হারাম। যেমন— গীবতের বিনিময়ে গীবত করা এবং গালির জবাবে গালি দেওয়া হারাম। হ্যাঁ, প্রতিশোধ গ্রহণে শরিয়তে যতটুকু অনুমোদন করেছে, সে পরিমাণই গ্রহণ করা যাবে। গালির পরিবর্তে গালি দেওয়া অনুচিত। যেহেতু, হাদিসে আছে-

إِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِمَا فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا فِيْهِ اَلْمُتَسَابَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ.

কেউ যদি তোমাকে তোমার প্রকৃত দোষ ধরে লজ্জা দেয়, তবে তুমি তাকে তার দোষ ধরে লজ্জা দিয়ো না। যারা পরস্পর গালি দেয়, তারা উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরে মিথ্যা বলে। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৫২; : আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী : ৪২৮)

এক লোক আবু বকর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে গালি দিল। তিনি চুপচাপ শুনলেন। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা) প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কিছু বলতে উদ্যত হলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ (স) উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন লোকটি আমাকে গালি দিচ্ছিল, তখন আপনি চুপ থাকলেন। এখন আমি প্রতিশোধ নিতে চাইলে আপনি উঠে চলে এলেন। এর কারণ কী? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি যতক্ষণ চুপ ছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার পক্ষ থেকে জওয়াব দিচ্ছিল, যখনই তুমি মুখ খুললে ফেরেশতারা চলে গেল এবং সেখানে শয়তান আসল। যে মজলিসে শয়তান থাকে, আমি সেখানে থাকতে চাই না। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৯৬; অনুরূপ অর্থে)

কেউ কেউ বলেন, প্রতিপক্ষের জবাবে এমন কথা বলা জায়েয, যার মধ্যে মিথ্যা নেই। হাদিসে সাবধানতার কারণে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন কথা না বলাই উত্তম, কিন্তু বললে গুনাহগার হবে না। উদাহরণস্বরূপ একথা বলা তুমি কে? তুমি কি অমুকের সন্তান না? যেমন সাদ (রা) ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি কি বনী হুযাইলেরই একজন না? জওয়াবে ইবনে মাসউদ (রা) বলেছিলেন, তুমি কি বনী উমাইয়ারই একজন না? অথবা কাউকে বোকা বলাও জায়েয। কারণ, মুতাররিফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী সকল মানুষই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে বোকা। তবে পার্থক্য এতটুকুই যে, কেউ কম বোকা, কেউ বেশি বোকা। এক দীর্ঘ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, একসময় লোকদের দেখবে আল্লাহর সত্তার বিষয়ে তারা সবাই বোকা।

কাউকে মূর্খ বলাও জায়েয। কোনো না কোনো প্রকার মূর্খতা সবার মধ্যেই রয়েছে।

'লজ্জা থাকলে তুমি এমন কথা বলতে না।' 'আমার চোখে তুমি সবচেয়ে তুচ্ছ কাজটা করছ', 'আল্লাহর কাছে এর বিনিময় পাবে', 'তিনি তোমার থেকে বদলা নেবেন', এমন কথা বলাও জায়েয।

অন্যদিকে চোগলখোরি, কুটনামি, গীবত, মিথ্যা বলা, বাবা-মাকে গাল-মন্দ করা সর্বসম্মতিক্রমে এসব হারাম।

এসব হারাম হওয়ার দলিল পাই এই উক্তি থেকে— খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর মধ্যে মতবিরোধ ছিলো। তখন এক লোক সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর কাছে গিয়ে খালিদ (রা)-এর নামে বদনাম করতে শুরু করলো। তিনি লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থামো। আমাদের দুজনের মাঝে এমন বড় কোনো মনোমালিন্য হয়নি। যার কারণে আমরা দীনকে ভুলে যাবো। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ২৬০৪৮; আল মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৪ : ১০৬)

এই উক্তি থেকে আমরা জানতে পারলাম, সাদ (রা) খালিদ (রা)-এর নামে কটু বাক্য শোনাকেই বৈধ মনে করেননি। তাহলে কীভাবে তা মুখে উচ্চারণ করা বৈধ হতে পারে?

যে কথা মিথ্যা নয়, তা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বলা জায়েয

যেমন— আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিবিগণ সবাই মিলে ফাতেমা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এসে পিতার কাছে আরজ করলেন, আপনার বিবিগণ আমাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, আপনি আয়েশাকেও তাদের সমান মনে করুন।

রাসূলুল্লাহ (স) শায়িত ছিলেন। তিনি বললেন, ফাতেমা! আমি যাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসবে? তিনি আরজ করলেন, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাহলে তুমি আয়েশাকে ভালোবাসো। ফাতেমা (রা) ফিরে গিয়ে বিবিদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন, তুমি তো কিছুই করতে পারলে না। খালি হাতেই ফিরে এসেছ।

এরপর তাঁরা যয়নব বিনতে জাহাশকে পাঠালেন। আয়েশা (রা) বলেন, যয়নব আমার সমান ভালোবাসা দাবি করতেন। তিনি এসে বলতে লাগলেন, আবু বকরের কন্যা এমন, আবু বকরের কন্যা এমন। এভাবে

তিনি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে গেলেন। আমি চুপচাপ শুনলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, তিনি যখন আমাকে অনুমতি দিলেন, তখন আমি এত বললাম যে, বলতে বলতে মুখ শুকিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) যয়নবকে বললেন, আবু বকরের কন্যাকে দেখলে? (সহিহ বুখারী : ২৫৮১; সহিহ মুসলিম : ২৪৪২)

তার মোকাবেলা করার সাধ্য তোমার নেই। আয়েশা (রা) যয়নব (রা)-কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাতে অশ্লীলতা ছিল না। শুধু তাঁর কথার ঠিক ঠিক জবাব ছিল। এক হাদিসে আছে,

اَلْمُتَسَابَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُوْمُ

দুজন গালিগালাজকারী যা কিছু বলে তা যে শুরু করে, তার ওপর বর্তায়, যে পর্যন্ত মাজলুম সীমালঙ্ঘন না করে।

এ থেকে জানা গেল, মজলুম প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রাখে, যদি সীমালঙ্ঘন না করে।

সুতরাং পূর্ববর্তীগণ যে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন তা যে পরিমাণ কষ্ট হয়, সেই পরিমাণ শোধ নেওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এও না করাই উত্তম। কেননা, এতে বাড়াবাড়ি হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ওয়াজিব পরিমাণ শোধ নিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

কিছু মানুষ আছে যারা রাগের আতিশয্যে আত্মসংবরণে ব্যর্থ হয়। আবার কেউ কেউ শুরুতে রাগান্বিত হয়। কিন্তু চিরকালের জন্যে অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। এদিক দিয়ে মানুষ চার শ্রেণিতে বিভক্ত। এক, যারা খড়ি কাঠের মতো দ্রুত জ্বলে ওঠে এবং দ্রুত নেভে। দুই, যারা পাথরের কয়লার মতো দেরিতে প্রজ্বলিত হয় এবং দেরিতে নেভে। তিন, যারা ভেজা লাকড়ির মতো দেরিতে জ্বলে কিন্তু দ্রুত নিভে যায়। এ অবস্থা প্রশংসনীয়, যদি নম্রতা অসম্মান না হয়। চার, যারা দ্রুত জ্বলে উঠে এবং দেরিতে নিভে। সবগুলোর মধ্যে এটা মন্দ। হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিনের রাগ দ্রুত উঠে এবং খুব তাড়াতাড়ি শান্ত হয়ে যায়। এভাবে অভ্যাসের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যাকে ক্রোধের কথা বললেও ক্রুদ্ধ হয় না, সে আত্মমর্যাদাহীন। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ১৪৩)

আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানুষ বিভিন্ন প্রকার। কিছু মানুষ দেরিতে ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কতক দ্রুত ক্রুদ্ধ হয় এবং দ্রুত ক্রোধ ফানা হয়ে যায়। এক বিষয়ের ক্ষতি অন্য বিষয় দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। আবার কিছু মানুষ দ্রুত ক্রুব্ধ হয় এবং বিলম্বে ক্রোধ প্রশমিত হয়। সবার মধ্যে উত্তম সে, যার ক্রোধ হয় দেরিতে এবং দ্রুত নেমে যায়। পক্ষান্তরে সবচেয়ে মন্দ সে-ই, যার ক্রোধ হয় দ্রুত এবং নামে অনেক দেরিতে। (জামে তিরমিযী : ২১১৯১)

ক্রোধের তীব্রতা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিধায় যারা শাসক, তাদের জন্যে ক্রুদ্ধ অবস্থায় কাউকে সাজা না দেওয়া উচিত; নতুবা প্রাপ্য পরিমাণের চেয়ে সাজা বেশি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ কারণেই সাজা কেবল আল্লাহর কাছে অপরাধের কারণে দেবে— ব্যক্তি স্বার্থের জন্য দেবে না। ওমর (রা) একবার এক মাতালকে দেখে শাস্তি দিতে চাইলেন। ইত্যবসরে মাতাল তাকে গালি দিল। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকেরা আরজ করল, গালি দেওয়ার কারণে আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন, তার গালির কারণে আমার রাগ হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাকে প্রহার করলে তাতে আমার নিজের ক্রোধেরও সম্পর্ক থাকত। অথচ আমি চাই না যেন আমার নিজের জিদের কারণে কোনো মুসলমানকে প্রহার করি। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৩৭)

বিদ্বেষের অর্থ ও তার ফল

মানুষ যখন ক্রোধের প্রতিশোধ নিতে না পেরে রাগ হজম করে নেয় তখন তা অন্তরে পতিত হয়ে বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিদ্বেষের অর্থ হচ্ছে কাউকে অসহ্য মনে করা এবং তার প্রতি অন্তরে বৈরিতা ও ঘৃণা পোষণ করা। এটা হারাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, لَيْسَ بِحَقُوْدٍ اَلْمُؤْمِنُ -মুমিন বিদ্বেষপরায়ণ নয়। (সুনানে নাসায়ি : ৬ : ১১)

বিদ্বেষ হচ্ছে ক্রোধের ফসল, বিদ্বেষ থেকে আটটি বিষয় সৃষ্ট হয়।

১. হিংসা অর্থাৎ অপরের নিকট থেকে নিয়ামতের বিলুপ্তি কামনা করা, তার নিয়ামতপ্রাপ্তিতে দুঃখিত হওয়া এবং তার বিপদে পতিত হওয়ায় আনন্দ করা।

২. অন্তরে এমন হিংসা বেড়ে যাওয়া যে, অপরের বিপদে শত্রুর মতো খুশি হওয়া।

৩. অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যদিও সে সম্পর্ক বজায় রাখতে ও নিকটে আসতে চায়।

৪. অপরকে নিকৃষ্ট ও হেয় জ্ঞান করা।

৫. প্রতিপক্ষের ব্যাপারে অশালীন কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা। যেমন, গীবত করা, মিথ্যা বলা, গোপন তথ্য ফাঁস করা ইত্যাদি।

৬. তার সাথে কথাবার্তা, কৌতুক ও পরিহাস করে কথাবার্তা বলা।

৭. তাকে প্রহার ইত্যাদি করে শারীরিক কষ্ট দেওয়া।

৮. প্রতিপক্ষের কিছু পাওনা থাকলে তা শোধ না করা।

এ আটটি বিষয়ই হারাম। বিদ্বেষের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে বর্ণিত আটটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্তরে অপরকে খারাপ জানা। এমনকি পূর্বে তার সাথে যা যা করতো, তা না করা। যেমন তাকে দেখে খুশি না হওয়া, নম্রতা ও দানখয়রাত না করা, তার অভাব মোচনে সাহায্য না করা ইত্যাদি। এসব কারণে দীনদারিতে মানুষের মর্যাদা হ্রাস পায়। যদিও সে শাস্তির যোগ্য হয় না। আবু বকর (রা) মিসতাহকে কিছু দেবেন না বলে শপথ করেছিলেন। মিসতাহ ছিলেন তাঁর আত্মীয়। আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপে তাঁরও কিছু ভূমিকা ছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ.

"যারা তোমাদের মাঝে গুণী ও বিত্তশালী, তারা যেন আত্মীয়, মিসকিন ও মুহাজিরদের দান করার ব্যাপারে শপথ না করে। তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন।" (সূরা নূর : ২২)

এই আয়াত অবতীর্ণ হলে আবু বকর (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর মাগফিরাত পছন্দ করি। এরপর পূর্বে যা দিতেন, তা পুনর্বহাল করে দিলেন। (সহিহ বুখারী : ২৬৬১; সহিহ মুসলিম : ২৭৭০)

এ থেকে জানা গেল, পূর্ববৎ ব্যবহার অব্যাহত রাখাই উত্তম। যদি মনের ওপর জোর খাটিয়ে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণে কিছু বেশি দান করে, তবে তা সিদ্দিকগণের স্তর।

যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয় সক্ষমতার বিচারে তার হালাত তিনটি :

১. কম-বেশি করা ছাড়া নিজের হক সে পূর্ণভাবে আদায় করে নেবে— এটা হলো ন্যায়ের স্তর।
২. প্রতিশোধ না নিয়ে সে ক্ষমা করে দেবে, এটা হলো মর্যাদার স্তর।
৩. বিদ্বেষীর উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করা। এটা হলো অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের স্তর। নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ এমনই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পন্থা হলো, সিদ্দিকদের জন্য। আর প্রথম পন্থা হলো সর্বোচ্চ অন্তরের সৎ লোকদের জন্য।

আসুন! আমরা এখন ক্ষমা ও মার্জনার ফযিলত নিয়ে আলোচনা করবো।

ক্ষমার উপকারিতা

ক্ষমার অর্থ হচ্ছে অন্যের নিকট যা পাওনা থাকে, তা ছেড়ে দেওয়া। কিসাস ও ঋণ ইত্যাদি। কারও যিম্মায় থাকলে তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। এর অনেক প্রশংসা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

মাফ করুন, সৎকাজের আদেশ দিন এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলুন। (সূরা আরাফ : ১৯৯)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

আর মার্জনা করা আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। (সূরা বাকারা : ২৩৭)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, তিনটি বিষয় এমন আছে যা আমি কসম খেয়ে বলতে পারি,

১. দানখয়রাতে ধনসম্পদ কমে না। কাজেই তোমরা দান করো।
২. যদি কোনো ব্যক্তি নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের পাওনা ছেড়ে দেয়, তবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার সম্মান বাড়িয়ে দেবেন।

৩. যে ব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের দরজা খোলে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ১৯৩)

এক হাদিসে আছে,

اَلتَّوَاضُعُ لَا يَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوْا يَرْفَعُكُمُ اللهُ وَالْعَفْوُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدَ اِلَّا عِزًّا فَاعْفُوْا يُعِزَّكُمُ اللهُ وَالصَّدْقَةُ لَايَزِيْدُ الْعَبْدُ اِلَّا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوْا يَرْحَمْكُمُ اللهُ.

বিনয় বান্দার উচ্চ মর্যাদা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না। সুতরাং তোমরা বিনয় প্রদর্শন করো। আল্লাহ তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। ক্ষমা বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করে। অতএব তোমরা ক্ষমা করো। আল্লাহ তোমাদের ইজ্জত দেবেন। দানখয়রাত প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু বাড়ায় না। অতএব তোমরা দান খয়রাত করো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৩৯)

আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনো দেখিনি যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর জুলুম করা হয়েছে আর তিনি তার প্রতিরোধ করেছেন। তবে হ্যাঁ কোনো জালেম যদি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করতে চাইতো তাহলে অবশ্যই তিনি বাধা দিতেন। কাউকে আল্লাহর নিষেধের সীমা অতিক্রম করে যেতে দেখলেই তিনি প্রচণ্ড রেগে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (স) -কে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করতে বলা হলে, তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন। যদি তা গুনাহমুক্ত হয়। (আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যা, ইমাম তিরমিযী : ৩৪৯)

ওকবা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাযির হলাম। এরপর সঠিক বলতে পারব না, আমি প্রথমে তাঁর হাত ধরলাম না তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি বললেন, হে ওকবা! দুনিয়া ও আখেরাতের লোকদের চরিত্রের যে বিষয়টি উত্তম তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করো। যে তোমার ওপর জুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করো। (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৭ : ২৬৯; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪ : ১৬১)

রাসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেন, মূসা (আ) আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ, বান্দাদের মধ্যে আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন? ইরশাদ হলো, যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে। (মাকারিমুল আখলাক, খারাইতি : ৩৬৯; তারীখে দিমাশক, ইবনে আসাফির : ৬১ : ১৩৪)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রাপ্তির অভিযোগ দায়ের করল। তিনি তার পক্ষে রায় দেওয়ার ইচ্ছায় তাঁকে বসতে বললেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন,

اِنَّ الْمَظْلُوْمِيْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কিয়ামতের দিন মাজলুমরাই কৃতকার্য হবে। লোকটি এ কথা শুনে তাঁর পাওনা ছেড়ে দিল।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জালেমের বিরুদ্ধে বদদুআ করলে মাজলুম প্রতিশোধ নিয়েছে বলে ধরা হবে। (জামে তিরমিযী : ৩৫৫৩)

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেন, আল্লাহ যখন কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক আরশের নিচ থেকে ঘোষণা করবে। হে তাওহিদবাদী, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরাও একে অন্যকে ক্ষমা করে দাও। (তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম : ১৮ ২৪২; আল-মুজামুল আওসাত তাবারানি : ১৩৫৮)

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) কাবাঘর তওয়াফ করেন এবং দুরাকাত নামায পড়ে কাবায় তাশরীফ আনেন। এরপর কাবার চৌকাঠ ধরে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? লোকেরা আরজ করল, আপনি আমাদের ভাই এবং মেহেরবান পিতৃব্য পুত্র। এ কথা তারা তিনবার উচ্চারণ করল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি সেই কথাই বলছি যা আমার ভাই ইউসুফ (আ) বলেছিলেন—

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُاللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন। তিনি সবচেয়ে বেশি করুণাকারী। (সূরা ইউসুফ : ৯২)

বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ কথা শুনে নিজ নিজ ঘর থেকে এমনভাবে বের হয়ে এল, যেমন কবর থেকে বের হয়। অতঃপর সবাই মুসলমান হয়ে গেল। (সুনানে কুবরা, নাসায়ী : ১১২৩৪; দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকি : ৫ : ৫৭)

সাহল ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কায় আসলেন তখন তিনি কাবার দুই দরজায় হাত রেখে দাঁড়ালেন। সাহাবীগণ তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। তখন তিনি বলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন। যিনি একাই সৈন্য দলকে পরাজিত করেছেন।

তারপর তিনি বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমরা কী বলছো? আর কি ভাবছো?

রাবি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার সম্পর্কে ভালোই বলছি, কল্যাণের ধারণাই রাখি। আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই এবং শ্রদ্ধাভাজন এক ভাইয়ের সন্তান (ভাতিজা)। যার সক্ষমতা আপনি রাখেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আজ আমি সেই কথাই বলব যা বলেছিলেন আমার ভাই ইউসুফ :

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। (আল মাগাযি, ওয়াকিদি : ২ : ৮৩৫)

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মানুষ যখন কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবে তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, তারা যেন দাঁড়ায় যাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাওনা রয়েছে এবং তারা যেন জান্নাতে চলে যায়। জানতে চাওয়া হলো, কাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে বাকি থেকে যাবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, দুনিয়াতে যারা মানুষকে ক্ষমা করে দিত। ঘোষকের এই ঘোষণা শুনে এত এত হাজার লোক দাঁড়াবে

এবং কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ২০১৯; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ১৮৭)

জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঈমানের সাথে তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে নিজের ইচ্ছামতো জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। হুরদের যাকে ইচ্ছা তাকে সে বিবাহ করতে পরবে। গুণ তিনটি হলো, যে গুপ্তঋণ আদায় করে। যে প্রত্যেক নামাযের পর দশ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং যে হত্যাকারীর দিয়াত মাফ করে দেয়।

আবু বকর (রা) জানতে চাইলেন, এই গুণ তিনটির একটি থাকলেও কি সে এই মর্যাদা পাবে?

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ, যেকোনো একটি গুণ থাকলেই সে এই মর্যাদা পাবে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১৭৯৪; আলমুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৩৩৮৫; আবু নুআইম : মারিফাতুস সাহাবা : ২ : ৫৫২)

আসার থেকে

ইবরাহিম তাইমি (র) বলেন, লোকেরা আমার উপর জুলুম করলে আমি তাদের ক্ষমা করে দেই। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ২১৩)

এ হলো ক্ষমার আড়ালে প্রচ্ছন্ন ইহসান। কারণ জুলুম করে সে নিজেকে আল্লাহর নাফরমানির দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর এজন্য তাকে কিয়ামতের ময়দানে কারণ দর্শাতে বলা হবে। তখন সে মুখ ফুটে কোনো জবাবই দিতে পারবে না।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে উপহার প্রদান করতে চান তখন তিনি তার পেছনে কতক জালেমকে লাগিয়ে দেন। (আল ইশরাফ ফি মানাযিলিল আশরাফ, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ৭৯)

এক ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর কাছে আসল, এবং অভিযোগ করে বলল, অমুক লোক সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকে, আমার প্রতি জুলুম করে।

ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) বললেন, 'প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে আল্লাহর সামনে মাজলুম হয়ে দাঁড়ানো তোমার জন্য অনেক বেশি উত্তম। (আসসামতু ওয়া আদাবুল লিসান, ইবনে আবিদ দুনইয়া : ৫৮৬)

ইয়াজিদ ইবনে মাইসার (র) বলেন, তুমি যদি কোনো জালেমের বিরুদ্ধে বদদুআ করতে থাকো তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নামে বদদুআ করছে যে, তার প্রতি তুমি জুলুম করেছ।

এখন যদি তুমি চাও, আমি তোমার দুআ কবুল করতে পারি। তার দুআও কবুল করতে পারি। তুমি চাইলে এই দুআর ফলাফল আমি কেয়ামত পর্যন্ত দেরি করতে পারি। তখন তোমাদের ঘিরে ধরবে আমার ক্ষমা। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ২২৯)

এক লোককে জালেমের বিরুদ্ধে দুআ করতে দেখে মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, জালেমকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ তোমার বদদুআর চেয়ে সে তার জুলুমের পরিণাম জলদি ভোগ করবে। তবে সে যদি কোনো আমল লাগাতার করে তাহলে মাফ পাবে। হতে পারে এক সময় সে জুলুম করাই ছেড়ে দেবে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭০৭৭)

আবু বকর (রা) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোনো কিছু পাওনা রয়েছে তারা যেন দাঁড়ায়।

তখন দুনিয়াতে ক্ষমাপ্রদর্শনকারীরা দাঁড়াবে। আল্লাহ তাদের ক্ষমার পুরস্কার দান করবেন। (ফাযাইলুস সাহাবা, ইমাম আহমাদ : ৭০০)

মুবারাক ইবনে ফাযালা (র) বলেন, একবার সিওয়ারুবনু আবদিল্লাহর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বসরা থেকে খলিফা আবু জাফর মনসুরের দরবারে গেলো। তখন তার সামনে হত্যার উদ্দেশ্যে এক মুসলিম ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। এটা দেখে আমার মনে ভাবনা জাগলো, আমি কী করে চোখের সামনে এক মুসলিম ভাইয়ের রক্ত ঝরতে দেখতে পারি? তাই আমি বললাম, আমিরুল মুমিনিন, আমি কি হাসান বসরি (র)-এর থেকে শোনা একটা হাদিস আপনাকে শোনাতে পারি? খলিফা বললেন, শোনাও! আমি বললাম, আমি হাসান বসরিকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল মানুষকে সমতল এক প্রান্তরে একত্র করবেন। যাতে সবাই ঘোষণাকারীর ঘোষণা শুনতে পারে। চোখ যেন তাদের দেখতে পারে। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু পাবে তারা যেন উঠে দাঁড়ায়! তখন ক্ষমাশীলরা দাঁড়াবে।

এ হাদিস শুনে খলিফা আবু জাফর মনসুর বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি এ হাদিসটি হাসান বসরি থেকে শুনেছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

খলিফা বললেন, আমি তার জন্য এই লোককে ক্ষমা করে দিলাম। (তারিখে বাগদাদ : ১৩ : ২১৩)

মুআবিয়া (রা) বলেন, প্রতিশোধের সুযোগ পাওয়া পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ও সহ্য করে থাকো। আর যখন তোমরা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে তখন ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করো।

একবার খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের দরবারে এক পাদরি এলো। হিশাম পাদরি জিজ্ঞাসা করলো, কি মনে হয় আপনার, জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?

সে বলল, না তিনি নবী ছিলেন না। তবে তার মধ্যে অনন্য চরটি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সম্ভব হলে তিনি ক্ষমা করতেন। ওয়াদা করলে পূরণ করতেন। কথায় সত্য বলতেন। আজকের কাজ কখনো তিনি কালকের জন্য রেখে দিতেন না।

কোনো অপরাধীকে হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সামনে উপস্থাপন করা হলো। খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলতে শুরু করল। তখন তার দিকে তাকিয়ে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক বললেন, অপরাধ তো করেছোই, এখন কথাও বলছ?

লোকটি বললো, আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا.

সেদিন আমরা আল্লাহর সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারব। আর আজ আপনার সামনে কোনো কথাই বলতে পারব না!

তখন হিশাম বললেন, অবশ্যই বলতে পারবে। বলো, কী বলার আছে তোমার? (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৬৮ : ২১২)

সিফফিন যুদ্ধের সময় আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-এর তাঁবুতে চোর ঢুকল। লোকেরা তাকে বলল, সে আমাদের শত্রুপক্ষের লোক। তার হাত কেটে দাও।

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বললেন, না বরং আমি তার দোষ গোপন রাখব, হয়তো আল্লাহও আমার দোষ গোপন করবেন!

এক বুযুর্গ বলেন, সে ব্যক্তি সহনশীল নয়, যে জুলুমের সময় চুপ থাকে, এরপর সক্ষম হলে প্রতিশোধ নেয়; বরং সহনশীল তাকে বলা হয়, যে জুলুমের সময় সহ্য করে এবং সক্ষম হলে মাফ করে। (কিতাবুল আফও ইবনে আবীদ দুনিয়া : ৮ : ৪৩)

একবার ইবনে মাসউদ (রা) বাজারে বসে ছিলেন। তিনি কিছু সওদা করে মূল্য দেওয়ার জন্য পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, পকেটের দিরহামগুলো চুরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন, এখানে বসা পর্যন্ত দিরহামগুলো আমার পকেটেই ছিল। লোকেরা চোরকে বদদুআ দিতে লাগল, তার হাত কাটা যাক, তার অমঙ্গল হোক। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, হে আল্লাহ, যদি সে অভাবে পড়ে নিয়ে থাকে, তবে তাকে দিন, যাতে অভাব দূর হয়ে যায়। আর যদি গুনাহের প্রতি বেপরওয়া হয়ে নিয়ে থাকে, তবে এ গুনাহকেই তার শেষ গুনাহ করে দিন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৪৩)

ফুযাইল (র) বলেন, আমাদের দেখা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুনিয়াবিমুখ লোক ছিলো খোরাসানের একব্যক্তি। একদিন সে মসজিদে হারামে আমার সাথে বসা ছিলো। কিছু পরে সে উঠে তাওয়াফ করতে গেলো। তখন তার সঙ্গে থাকা দিনারগুলো চুরি হয়ে গেলো। তখন সে কাঁদতে শুরু করলো।

আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, তুমি কি দিনার হারানোর শোকে কাঁদছো?

তিনি বললেন, না আমি দিনারের জন্য কাঁদছি না। বরং আমি কল্পনা চোখে দেখলাম যে, আমি সেই চোরের সাথে আল্লাহর সমনে দাঁড়িয়ে আছি। এবং চোরের আত্মপক্ষ সমর্থন করে দেওয়া প্রমাণগুলো আমার যুক্তির সামনে একে একে টলে যাচ্ছে। তাই আমি চোবে চারার করুণ পরিণতির কথা ভেবে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কাঁদছি।

মালেক ইবনে দিনার (র) বলেন, এক রাতে আমি বসরার শাসক হাকাম ইবনে আইউবের বাড়ি গেলাম। এরপর সেখানে হাসান বসরি (র) এলেন। তিনি ছিলেন ভয়াতঙ্কে নীল। আমরা আমিরের সামনে মুরগির বাচ্চার মতো জবু থবু হয়ে বসলাম।

তখন হাসান বসরি (র) আমিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা। কীভাবে তার ভাইয়েরা তাকে বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিলো। কীভাবে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো কূপের গভীরে। তারা বলেছিলো, তোমরা বেঁচে দাও তোমাদের ভাইকে। কষ্ট দাও তোমাদের বাবার অন্তরে। তিনি আমিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আযিযে মিসরের প্রাসাদে মহিলাদের চক্রান্তের কথা। ইউসুফ (আ)-এর কারাবরণের কথা। এসব কিছু বলার পর হাসান বসরি (র) হাকাম ইবনে আইউবকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমির! আল্লাহ তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছেন! তাঁকে স্থান বদল করে কেনান থেকে মিশরে নিয়ে গেছেন। দিকে দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন। তাঁকে দিয়েছেন খাদ্য ভাণ্ডারের দায়িত্ব। ঘটনা সংঘটনের টানাপড়নে সব হারিয়ে আবার সবকিছু ফিরে পাওয়ার পর কী করেছিলেন ইউসুফ (আ)? তিনি অভিযোগহীন স্বরে বলেছিলেন, لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আজ তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্মের বিষয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহই তোমাদের ক্ষমা করবেন। (সূরা ইউসুফ : ৯২)

তিনি প্রতিশোধের সবচেয়ে সুন্দর সুযোগ পেয়েও ক্ষমা ও মার্জনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন।

হাসান বসরি (র)-এর কথা শুনে হাকাম ইবনে আইউব বলেন আজ আমিও বলবো, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আমার কাছে ক্ষমার চাদর থাকলেও তোমাদের আজ তার নিচে আশ্রয় দেবো।

এক বন্ধুর পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে ইবনুল মুকাফফা অপর এক বন্ধুর কাছে পত্র লিখল, অমুক ব্যক্তি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তোমার ক্ষমার অপেক্ষায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে রেখো, অপরাধ মানুষের মর্যাদা বাড়ায় না। বরং ক্ষমা মানুষকে মহৎ করে।

খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে ইবনে আশআসের বন্দিরা আসলে তিনি তাদের ব্যাপারে রজা ইবনে হাইওয়ার সাথে পরামর্শ করলেন। রজা বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার পছন্দসই বিষয় অর্থাৎ বিজয় দান করেছেন। এর বিনিময়ে আপনি তা-ই করুন যা আল্লাহ তাআলার পছন্দ। অর্থাৎ আল্লাহ মাফ করা পছন্দ করেন। আপনিও

মাফ করুন। এ কথা শুনে খলীফা সকল বন্দিকে মাফ করে দিলেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৪৫)

একবার যিয়াদ ইবনে উবাইদুল্লাহর হাতে খারেজি এক লোক বন্দি হলো। কিন্তু কোনোভাবে সে পালিয়ে চলে গেলো। তখন যিয়াদ পালিয়ে যাওয়া লোকটির ভাইকে গ্রেপ্তার করে বলল, তোর ভাইকে নিয়ে আয়। না হলে তোর গর্দান উড়িয়ে দেবো।

লোকটা বললো, আমি যদি আমিরুল মুমিনিনের কাছ থেকে পত্র নিয়ে আসি তাহলে কি তুমি আমাকে মুক্তি দেবে?

যিয়াদ বললো, হ্যাঁ, দেবো।

লোকটা বলল, আমি আমিরুল মুমিনীন নয়, মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতারিত পত্র আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। সেখানে ইবরাহিম ও মূসা (আ) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। তারপর সে তেলাওয়াত করলো,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسٰى. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفّٰى. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى.

তাকে কি সে সম্পর্কে অবগত করা হয়নি যা মূসার কিতাবে আছে, এবং ইবরাহিমের কিতাবে আছে, যিনি তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন? কিতাবসমূহে যা ছিল তা এই যে, কোনো পাপ বহনকারী অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরা নাজম : ৩৬-৩৮)

এ কথা শুনে যিয়াদ বললো, তাকে ছেড়ে দাও। সে নিজের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পেরেছে।

ইনজিল শরিফে বর্ণিত রয়েছে, 'যে ব্যক্তি জালেমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে শয়তানকে পরাজিত করে।'

নম্রতার উপকারিতা

নম্রতা একটি শ্রেষ্ঠ গুণ, যা সচ্চরিত্রের ফলস্বরূপ। এর বিপরীতে কঠোরতা হচ্ছে ক্রোধের ফল। কঠোরতা কখনো ক্রোধ থেকে এবং কখনো তীব্র লোভ থেকে সৃষ্টি হয়। কিন্তু নম্রতা সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্রেরই ফল। সচ্চরিত্র তখনই হাসিল হয়, যখন ক্রোধশক্তি ও খাহেশ শক্তিকে সমতার পর্যায়ে রাখা হয়। এ কারণেই 'রিফক' তথা নম্রতা হাদিস শরীফে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এক হাদিসে বলা হয়েছে,

يَا عَائِشَةُ اِنَّهُ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ, হে আয়েশা! যে ব্যক্তি নম্রতার অংশ পেয়েছে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অংশ পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। (সংক্ষেপিত, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ১৫৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ.

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পরিবারের লোকজনকে ভালোবাসেন, তাদের মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করে দেন। (মুসনাদে আহমদ : ৬ : ৭২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬১৪০)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোমল আচরণের মধ্যে এমন শক্তি দান করেছেন যা রূঢ় আচরণের মধ্যে নেই। আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন তাকে কোমলতা দান করেন। যে ঘরের মানুষেরা কোমলতা থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা যেন সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলো। (আল মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২ : ৩০৬)

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সবার প্রতি সদয় আচরণ পছন্দ করেন। তিনি সদয় আচরণের বিনিময়ে এত পরিমাণ সাওয়াব দান করেন যা রূঢ় আচরণ করে অর্জন করা যায় না। (সহিহ মুসলিম : ২৫৯৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আয়েশা, সদয় হও। কারণ আল্লাহ যখন কোনো জগদ্‌বাসীকে সম্মান দান করতে চান তখন তাদের সদয় হওয়ার পথ বাতলে দেন। (মুসনাদে আহমাদ : ৬ : ১০৪; অনুরূপ অর্থে সুনানে আবু দাউদ : ৪৮০৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা কি জানো কাদের জন্য কেয়ামতের দিন জাহান্নামকে হারাম করা হবে? তারা হলো সকল সহজ সরল নরম হৃদয়ের ব্যক্তিরা। (জামে তিরমিযী : ২৪৮৮; মুসনাদে আহমদ : ১ : ৪১৫; আল মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২০ : ৩৬২)

আয়েশা (রা) বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে অমলীন একটি উটের পিঠে চড়ে সফর করছিলেন। উটের দুলুনিতে তারা একবার ডানে একবার বামে হেলে পড়ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আয়েশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আয়েশা, তুমি কোমল আচরণ করো। কারণ কোমল আচরণ মানুষকে সুশোভিত করে। আর তা না থাকলে মানুষের চরিত্র হয়ে যায় দূষণীয়। (সহিহ মুসলিম : ২৫৯৪)

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ.

যে নম্রতা পেল না, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকল। (সহিহ মুসলিম : ২৫৯২)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, যে শাসক নম্রতা প্রদর্শন করে, তার সাথে কিয়ামতের দিন নম্রতার আচরণ করা হবে। (সহিহ মুসলিম : ১৮২৮; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৪ : ৪৭)

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! সকল মুসলমানই আল্লাহ তাআলার দয়ায় আপনার কাছ থেকে ফায়দা অর্জন করে। কোনো উত্তম কথা আমার জন্যও নির্দিষ্ট করে দিন। রাসূলুল্লাহ (স) দুই কিংবা তিন বার আলহামদুলিল্লাহ বললেন এবং লোকটির প্রতি মনোযোগী হয়ে দুই বা তিন বার জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই উপদেশ চাও? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যখন তুমি কোনো কাজ করার ইচ্ছা কর, তখন পরিণাম চিন্তা করে নাও। যদি ভালো দেখ, করো; নতুবা করো না। (আযযুহদ : ৪১; তারীখে আসবাহান : ১ : ৩৫৯)

সাহাবীদের উক্তি

একবার ওমর (রা)-এর কাছে কতক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রজাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসল। তখন ওমর (রা) প্রজা-শাসক সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তারা আসল, তিনি তাদের সামনে দাঁড়ালেন আল্লাহর প্রশংসা করে বলতে শুরু করলেন,

প্রজাগণ, তেমাদের ওপর আমার কিছু অধিকার রয়েছে। তা হলো আমি তোমাদের সামনের সময়ের জন্য সদুপদেশ দেবো। কল্যাণ কর্মে সহায়তা করবো। আর হে শাসকেরা, তোমাদের ওপর প্রজাদেরও কিছু অধিকার

রয়েছে। জেনে রেখো, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় গুণ হলো ধৈর্য। আর একজন শাসকের ধৈর্য আর সদয়তা হতে হবে সবার জন্য ব্যাপক। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হলো অজ্ঞতা। আর একজন শাসকের জন্য অজ্ঞতা ও কঠোরতা হলো সবচেয়ে মন্দ স্বভাব।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) বলেন, সদয়তা হলো সহনশীলতার ফল।

একটি মাওকুফ ও মারফু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ইলম হলো মুমিনের বন্ধু। সহনশীলতা তার উজির। বিবেক তার পথপ্রদর্শক। আমল হলো তার তত্ত্বাবধায়ক, সদয়তা তার আত্মা। কোমলতা তার ভাই। ধৈর্য তার সেনাপতি। (মুসনাদুশ শিহাব, কাদায়ি : ১৫২, ১৫৩; মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ৪১৯৬)

জনৈক ব্যক্তি বলেন, যে ঈমানকে ইলম দ্বারা সাজিয়ে তোলা হয়, তা কতোই না উত্তম। কর্ম দ্বারা শোভিত ইলম কতোই না সুন্দর! সদয়তা দিয়ে সুশোভিত কর্ম কতোই না ভালো। আর সবচেয়ে উত্তম সংযোজন হলো জ্ঞানের সাথে সহনশীলতার সংযোজন। (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক : ১৩৩৬)

আমর ইবনুল আস (রা) তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন, সদয়তা কী? তিনি বলেন, আপনি নম্র হবেন এবং নেতৃস্থানীয়দের সাথে কোমল আচরণ করবেন।

আমর ইবনুল আস (রা) জানতে চাইলেন, রূঢ়তা কী?

আবদুল্লাহ (রা) বললেন, শাসকের বিরোধিতা করা এবং নিজের জন্য যাকে হুমকি মনে করবে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

সুফিয়ান সাওরী (রা) তাঁর সহচরদের জিজ্ঞেস করলেন, 'রিফক' কাকে বলে তোমরা জানো? তারা বলল, আপনিই বলে দিন। তিনি বললেন, কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা এবং নম্রতার জায়গায় নম্রতা প্রদর্শন করা। তরবারির স্থানে তরবারি ব্যবহার করা। চাবুকের স্থানে চাবুক ব্যবহার করা। (জাম্মুল গাযাব, ইবনে আবিদ দুনইয়া)

এ থেকে জানা গেল, নম্রতার সাথে কঠোরতার মিশ্রণও দরকার। কিন্তু মানুষের স্বভাব অধিক কঠোরতাপ্রবণ বিধায় নম্রতার প্রতি অধিক মাত্রায় উৎসাহ প্রদান জরুরি। এ কারণেই শরিয়তে নম্রতার প্রশংসায় যা কিছু বলা

হয়েছে। কঠোরতার বিষয়ে এ পরিমাণ বলা হয়নি। কিন্তু আপন আপন স্থানে উপযোগিতা অনুসারে উভয়টি ভালো। তবে যে স্থানে কঠোরতা জরুরি, সেখানে সত্য মানসিক প্রবৃত্তির সাথে মিশে যায় এবং ঘিও চিনির চেয়েও অধিক সুস্বাদু মনে হয়।

একবার আমর ইবনুল আস (রা) ধীরতার কারণে মুয়াবিয়া (রা)-কে তিরস্কার করে পত্র লিখেন, তার পত্রের জবাবে মুয়াবিয়া (রা) লেখেন,

পর সমাচার,

কল্যাণকর্মের বুঝ হলো বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা। যথার্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সে-ই যে কাজ করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে না। যে স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছে সে-ই হতাশাবাদী। দৃঢ়পদ ব্যক্তি আক্রান্ত হয় কিংবা আক্রান্ত হওয়ার দ্বারা প্রান্তে উপনীত হয়।

তাড়াহুড়া যে করে সে ভুলের দুয়ারে পৌঁছে যায়। সদয় আচরণ যার উপকারে আসেনি রূঢ়তা তার ক্ষতি করে। অভিজ্ঞতা দ্বারা যে ফায়দা হাসিল করতে পারে না উচ্চ মর্যাদায় আসীন হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ১৬৫)

আবু আওন আনসারি (রা) বলেন, মানুষ যেসব কঠিন শব্দ কথায় ব্যবহার করে তার সমার্থক যদি সহজ কোনো শব্দ থাকে তাহলে তোমার উচিত হবে সহজ শব্দটাই গ্রহণ করা। (খতিব, আল ফাকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ : ৭১৬; মাকারিমুল আখলাক, খারাইতি : ১৫১)

আবু হামযা কুদি (র) বলেন, যতটুকু না হলেই নয়, খাদেমদের থেকে তুমি ততটুকু খেদমতই নাও। কারণ প্রতিটি মানুষের সাথে একজন করে শয়তান বাস করে। তাদের ওপর কঠোরতা করে যতটা কাজ হাসিল করা যায় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি কাজ হয় কোমল আচরণ করলে।

হাসান বসরি (র) বলেন, মুমিন ব্যক্তি হলো সুস্থির। সে চোখ বুঁজে কাজ করে যায় না। (আয যুহদুল কাবির, বায়হাকি : ৯৩০)

আহলে ইলম এভাবেই সদয় আচরণের প্রশংসা করেছেন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা উপকারী হয় ও প্রশংসা পায়। তবে বিরল হলেও কখনো কখনো কঠোরতার প্রয়োজন হয়। তাই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সে, যে বুঝতে পারে কোনটা কোমলতার ক্ষেত্র আর কোনটা

কঠোরতার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝে সে আচরণে ভিন্নতা আনে। আর যারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয় তাদের উচিত সবসময় দয়ার্দ্রতাকে গ্রহণ করা। কারণ তাতেই অধিকাংশ সময় লেখা থাকে সফলতার মন্ত্র।

হিংসার প্রতিবাদ

হিংসা হচ্ছে বিদ্বেষের একটি শাখা এবং বিদ্বেষ হচ্ছে ক্রোধের ফসল। সুতরাং, হিংসা ক্রোধের শাখা এবং ক্রোধ হলো মূল কাণ্ড। এরপর হিংসার এত বিরাট বিরাট শাখা বিস্তৃত হয়, যেগুলো গণনাও করা যায় না। হিংসার নিন্দায় বহু হাদিস বর্ণিত আছে। রাসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেন,

اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

আগুন যেমন লাকড়িকে ভস্ম করে ফেলে, তেমনি হিংসা নেককাজের সওয়াব শেষ করে দেয়। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯০৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২১০)

অন্য এক হাদিসে হিংসা, তার ফলাফল ও কারণসমূহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে,

لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

অর্থাৎ, পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পরে শত্রুতা করো না এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহিহ বুখারী : ৬০৬৫; সহিহ মুসলিম : ২৫৫৯)

আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, এখন এ পথে একজন জান্নাতি ব্যক্তি তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে। ইত্যবসরে এক আনসারী বাম হাতে জুতা নিয়ে উপস্থিত হলো। তার দাড়ি থেকে অযুর পানি টপকে পড়ছিল। সে এসেই "আসসালামু আলাইকুম" বলল। দ্বিতীয় দিন রাসূলুল্লাহ (স) আবার পূর্বের ন্যায় উক্তি করলেন। সেদিনও একই ব্যক্তি আগমন করল। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটল। রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে চলে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) আনসারী ব্যক্তির পেছনে পেছনে গেলেন এবং তাকে বললেন, আমার পিতার সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এতে আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন তাঁর কাছে যাব না। আপনি অনুমতি

দিলে তিন দিন আপনার এখানেই রাত কাটাব। লোকটি বলল, ঠিক আছে। আপনি থাকুন। আবদুল্লাহ তিন রাত্রি পর্যন্ত তার ঘরে শয়ন করে দেখলেন, সে রাতে সজাগ হয় না, তবে প্রত্যেক পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় আল্লাহর যিকির করে। তাহাজ্জুদের নামাযের সময় শুয়ে থাকে। অবশ্য এতটুকু জানা গেল, সে যখন কোনো কথা বলেছে, উত্তম কথাই বলেছে। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে আবদুল্লাহ তার উল্লেখযোগ্য কোনো আমলই দেখতে পেলেন না। অগত্যা তিনি লোকটিকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিতার সাথে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে আপনার ব্যাপারে এ কথা শুনেছিলাম। তাই আপনি কী আমল করেন, তা দেখার জন্যই আপনার এখানে থাকা। আপনাকে তো তেমন আমল করতে দেখলাম না। বলুন তো, কীভাবে আপনি জান্নাতি হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন? লোকটি বলল, আমার আমল তো তাই, যা আপনি দেখলেন। আমি তার নিকট থেকে চলে যেতে উদ্যত হলাম। কিছু দূর যেতেই সে আমাকে ডেকে নিল। তারপর বলল, ভাই! আমল তো তাই, যা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু ব্যাপার এতটুকু, যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা কোনো মুসলমানকে দান করেন, তাতে আমার মনে কোনো প্রকার হিংসা হয় না। আমি বললাম, ব্যস। এ কারণেই আপনি এ মর্যাদা লাভ করেছেন। আমরা এটা পারব না। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ১৬৬; যুহদ : ৬৯৪)

এক হাদিসে রয়েছে— নবী কারিম (স) বলেন, তিনটি বিষয় থেকে কেউ মুক্ত নয়। (১) ধারণা, (২) কুলক্ষণ, (৩) হিংসা। আমি তোমাদের এগুলো থেকে নাজাতের উপায় বলে দিচ্ছি। যখন মনে কোনো ধারণা আসে, তখন তা ঠিক মনে করবে না। যখন কুলক্ষণ দেখ, তখনো তোমার কাজ তুমি করে যাও। আর হিংসার উদ্রেক হলে খাহেশ করো না। (উয়ুনুল আখবার, ইবনে কুতায়বা : ২ : ৮; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৫১)

এ হাদিস দ্বারা হিংসা থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাব্যতা বোঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ববর্তীদের রোগ ঢুকে পড়ছে। তা হলো হিংসা ও ঘৃণা। আর ঘৃণার অপর নাম হলো মৃত্যু। আমি এখানে চুলের মৃত্যু অর্থাৎ ঝরে যাওয়ার কথা বলছি না। বরং দীনের মৃত্যুর কথা বলছি। সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! ঈমান না

আনলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পর সৌহার্দ্য সম্প্রীতি না থাকলে তোমাদের ভালোবাসা পরিপূর্ণ হবে না। আমি কি তোমাদের স্থায়ী সম্প্রীতির পথ বাতলে দেব? তাহলে তোমরা পরস্পরের মাঝে সালাম বিনিময় করো। (জামে তিরমিযী : ২৫১০)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দরিদ্রতা যেন মানুষকে অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর হিংসা যেন কুফরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। (আত তাওবিখ ওয়াত তাশবিহ আবুশ শায়খ : ৭৪; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৫৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬১৮৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, অচিরেই আমার উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতের ব্যাধি গ্রাস করে নেবে।

সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, সেসব ব্যাধি কী?

তিনি বললেন, সেগুলো হলো ঔদ্ধত্য, অহমিকা, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা, দুনিয়াদারির বড়াই, পরস্পর দূরত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, একসময় তাদের মধ্যে অন্যায়-অনাচার ছড়িয়ে পড়বে। তারপর সব হয়ে যাবে অস্থিরতায় আক্রান্ত। (আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৯২১২; মুসতাদরাকে হাকেম : ৪ : ১৬৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার ভাইয়ের বিপদে তুমি উল্লসিত হয়ো না। তাহলে আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোমাকে বিপদে ফেলবেন। (জামে তিরমিযী : ২৫০৬; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ১৮৬)

যাকারিয়া (আ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হিংসুক ব্যক্তি হলো আমার নিয়ামতের শত্রু। আমার বিচারে অসন্তুষ্ট। বান্দার মধ্যে আমার রিযিকের তাকসিম তাকে খুশি করতে পারে না। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬২১৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা গোপনে প্রয়োজন পূরণের জন্য সাহায্য চাও। কারণ যেই নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়, সেই হিংসার শিকার হয়। (ইতিদালুল কুলুব, খারাইতি : ৬৮১; আল মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২০ : ৯৪; আল কামিল, ইবনে আদী : ২ : ৩৬০; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬২২৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহর নিয়ামতেরও শত্রু রয়েছে। জানতে চাওয়া হলো, কারা তারা? তিনি উত্তর দিলেন, নিয়ামতের শত্রু হলো তারা, যারা

আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত বান্দার নিয়ামত নিয়ে হিংসা করে। (আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৭২৭৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছয় প্রকার ব্যক্তির জন্য হিসাব গ্রহণের ছয় বছর পূর্বেই জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে।

জানতে চাওয়া হলো, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো, অত্যাচারী শাসক। জাতি-দোষে-দুষ্ট আরব। অহংকারী নেতা। অবিশ্বাসযোগ্য ব্যবসায়ী। জ্ঞানহীন জনপদের বাসিন্দা। হিংসুটে আলেম। (মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ৩৪৯১)

সালাফের এক ব্যক্তি বলেন, মহাবিশ্বে সংঘটিত প্রথম অপরাধ ছিল হিংসা। আদম (আ)-এর মর্যাদা দেখে ইবলিসের মনে হিংসা জেগে ওঠে। তখন সে সেজদা করতে অস্বীকার করে। তার হিংসা তাকে অপরাধের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। (আবুশ শায়খ, আত তাওবিখ ওয়াত তামবিহ)

ইতিহাসে পাওয়া যায়, মূসা (আ) যখন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেলেন, তখন এক ব্যক্তিকে আরশের ছায়ায় দেখে ঈর্ষা করতে থাকেন যে, এমন উচ্চ মর্যাদা যদি আমার ভাগ্যেও জুটত! তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে লোকটির নাম জানতে চেয়ে আবেদন পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, তার নাম দিয়ে তোমার কী লাভ, কাজ শুনে নাও। সে তিনটি কাজ করতো, (১) মানুষের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত দেখে হিংসা করতো না। (২) মা-বাবার নাফরমানি করতো না। (৩) চোগলখোরি করতো না। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ১৪৯; আসসাম ওয়া আদাবুল লিসান : ২৬৭)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে এ ভয় বেশি করি যে, তাদের মধ্যে অঢেল সম্পদ হবে এবং তারা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ করে খুনখারাবি করবে। (মুসনাদুশ শামিয়ীন, তাবারানি : ১১১৫; সহিহ বুখারী : ১৪৬৫; সহিহ মুসলিম : ১০৫২)

বর্ণিত আছে, মুফাযযল ইবনে মুহাল্লাব যখন ওয়াসেতের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন আওন ইবনে আবদুল্লাহ তার কাছে যান এবং বলেন, আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিতে চাই। মুফাযযল বললেন, বলুন। তিনি বললেন,

প্রথম— অহংকার থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার প্রথম নাফরমানি এর কারণেই হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এর সত্যায়ন দেখুন,

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই তাকে সিজদা করল। সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেরদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল। (সূরা বাকারা : ৩৪)

দ্বিতীয়— লোভ লালসা থেকে বেঁচে থাকবে। এটা বড় বিপদ, যার কারণে আদম (আ) জান্নাত থেকে বের হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বেহেশতে স্থান দেন, যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের সমান। সেখানে তাঁকে একটি গাছের ফল ছাড়া বাকি সকল জিনিসই খাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি সেই গাছটির ফল খেয়ে বসেন এবং জান্নাত থেকে বের হয়ে যান। তাঁকে আদেশ করা হয়, وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ অর্থাৎ, তোমরা সকলেই জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের দুশমন। (সূরা বাকারা : ৩৮)

তৃতীয়— হিংসা থেকে বেঁচে থাকবে। হিংসার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ

তাদেরকে আদমের দুইপুত্রের বৃত্তান্ত পাঠ করে শুনান, যখন তারা উভয়েই কোরবানি করল, এরপর একজনের কোরবানি কবুল করা হলো এবং অপরজনের হলো না, তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। (সূরা মায়েদাহ : ২৭)

আরেকটি বিষয়, যখন সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা আলোচনা করা হয় তখন তুমি চুপ থাকবে। (আনসাবুল আশরাফ, বালাযুরি : ১১ : ২৩০)

আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ মাযিনি (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তির সাথে দেশের বাদশার সখ্যতা ছিলো। তিনি প্রায়ই রাজদরবারে যেতেন এবং বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়ে বলতেন, আপনি সদাচরণ দ্বারা সদাচারীর বদলা দিন। কারণ দুষ্কৃতিকারী দুষ্কর্মের ফল নিজেই ভোগ করবে।

অন্য এক ব্যক্তির মনে এই ব্যক্তির প্রতি হিংসা জমা হলো। সে মনে মনে কথা সাজিয়ে বাদশার কাছে গেলো এবং বললো, এই যে লোকটি প্রায়ই আপনার সামনে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিয়ে যায়, সে মনে করে আপনার মুখ থেকে নাকি দুর্গন্ধ আসে।

তার অভিযোগ শুনে বাদশাহ কপাল কুঁচকে বললো, কিন্তু এই অভিযোগের প্রমাণ হবে কী করে?

লোকটি বললো, আপনি তাকে কাছে ডাকলে দেখবেন সে মুখে হাত চেপে ধরছে। যাতে আপনার মুখের দুর্গন্ধ তার নাকে না যায়।

বাদশাহ বললেন, বিষয়টি আমি পরীক্ষা করে দেখবো, তুমি এখন আসতে পারো। হিংসুটে লোকটি নিজের ঘরে ফিরে এলো। তারপর উপদেশদাতা লোকটিকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে পেঁয়াজ দেওয়া তরকারি খাওয়ালো। খাওয়া দাওয়া শেষে দুজনে গেলো রাজ প্রাসাদে। উপদেশদাতা লোকটি আজও দাঁড়ালো বাদশার সামনে এবং বললো আপনি সদাচরণ দ্বারা সদাচারীর বদলা দিন। কোনো দুষ্কৃতিকারী দুষ্কর্মের ফল নিজে থেকেই ভোগ করবে। বাদশা বললেন, তুমি আমার কাছে এসো। লোকটি মুখে হাত দিয়ে বাদশার কাছে গেলো। কারণ তার ভয় হচ্ছিলো, হয়তো তার মুখে লেগে থাকা পিঁয়াজের গন্ধ বাদশাহকে কষ্ট দেবে।

কিন্তু বাদশাহ তাকে ভুল বুঝলো। তিনি মনে করলেন, তার মুখে দুর্গন্ধ আছে বলে সে মুখে হাত চাপা দিয়েছে। তার বিষয়ে পাওয়া অভিযোগ তাহলে মিথ্যা নয়।

তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। মনে মনে প্রতিশোধ নেবেন বলে ঠিক করলেন।

বাদশার একটা অভ্যাস ছিলো তিনি নিকটজনদের কাছে চিঠিপত্র নিজ হাতে লিখতেন। অন্যসময় পত্র লেখকই বাকি চিঠি পত্র লিখতো।

আজও বাদশাহ দোয়াত কলম তুলে নিলেন, কাছের এক রাজকর্মচারীর কাছে তিনি লিখলেন,

'চিঠি পাওয়া মাত্র এর বাহককে হত্যা করবে। মৃত দেহ থেকে চামড়া ছিলে নিবে। তারপর তার ভেতরে ঘাস তৃণ ঢুকিয়ে পুত্তলিকা তৈরি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। বাদশাহ উপদেশদাতা লোকটির হাতে চিঠির খামটি দিয়ে ঠিকানা মতো পৌঁছে দিতে বললেন, সে চিঠি হাতে পথে বের হলো। পথিমধ্যে হিংসুটে লোকটার সাথে তার দেখা।

চললে কোথায়? হিংসুটে লোকটা জানতে চায়।

বাদশাহ খামটা দিয়ে বললেন অমুকের কাছে পৌঁছে দিতে। তাই আমি সেদিকে যাচ্ছি। হিংসুটে লোকটার মনে এবার লোভ ছোবল মারলো। সে মনে করলো, চিঠিটা পৌঁছে দিলে বাদশার কাছে সে বিশেষ সম্মান পাবে। তাই সে আগ বাড়িয়ে উপদেশদাতা লোকটাকে বললো, তুমি এত দূর কষ্ট করে যাবে কেন? আমাকে দাও। আমিই পৌঁছে দিচ্ছি।

আচ্ছা নাও।

উপদেশদাতা লোকটি চিঠিটা হিংসুটে লোকটার হাতে তুলে দিলো এবং সে বাড়ির দিকে ফিরতি পথ ধরলো। এদিকে প্রাপকের ঠিকানায় চিঠি নিয়ে গেলো হিংসুটে লোকটা। রাজ কর্মচারী লোকটা চিঠি খুলে পড়ল, তারপর হিংসুটে লোকটার দিকে তাকিয়ে রাজ কর্মচারী লোকটা বললো, এই চিঠিতে বাদশা তোমাকে হত্যা করে, চামড়া ছিলে তাতে ঘাস ভরে পুত্তলিকা বানিয়ে তার কাছে পাঠাতে বলেছেন। এবার হিংসুটে লোকটা ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়ল। সে কাকুতি মিনতি করে বলতে শুরু করলো, বিশ্বাস করুন জনাব এই চিঠিটা আমার নয়। দোহাই লাগে। আপনি আমাকে বাদশার কাছে ফিরে যেতে দিন।

রাজ কর্মচারী তার কোনো কথাতেই কান না দিয়ে তাকে হত্যা করলো। চামড়া ছিল, পুত্তলিকা বানিয়ে বাদশার কাছে পাঠিয়ে দিল। কিছুদিন পরে উপদেশদাতা লোকটা আবার বাদশার দরবারে গেলো। আগের কথাগুলো এবারও বাদশাকে শোনাল। তাকে দেখে বাদশা খুব অবাক হলো। বাদশা জানতে চাইলো, আমার চিঠিটা তুমি কি প্রাপকের কাছে নিয়ে যাওনি?

তখন লোকটা হিংসুটে লোকটাকে চিঠি দেওয়ার কথা বাদশাহকে জানায়। বাদশাহ বলে, লোকটা তোমার নামে অভিযোগ করে আমাকে বলেছিল, তুমি নাকি বলো, আমার মুখ ভরা দুর্গন্ধ?

এমন কথা আমি কোনোদিন বলিনি। লোকটা বললো।

বাদশা এবার জানতে চাইল, সেদিন তাহলে আমার কাছে আসতে গিয়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছিলে কেন?

উপদেশদাতা লোকটি উত্তর দিলো, সেই লোকটা আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে খুব করে পেঁয়াজ দেওয়া তরকারি খাইয়ে ছিলো। তাই আপনার নাকে গন্ধ লাগতে পারে ভেবে মুখে হাত চাপা দিয়েছিলাম।

বাদশাহ এবার পুরো ঘটনাটা বুঝে ফেললেন এবং বললেন, তুমি আসলে সত্যই বলেছ। অসদাচারী নিজের মন্দের পরিণাম নিজেই ভোগ করে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ২২৮)

মুহাম্মদ ইবনে শিরিন (র) বলেন, পার্থিব কোনো বস্তুর কারণে আমি কোনো দিন কাউকে হিংসা করিনি। কারণ সে যদি জান্নাতের অধিবাসী হয়, তাহলে কেন আমি এমন দুনিয়ার বিষয়ে হিংসা করব যার মূল্য তার কাছে খুবই তুচ্ছ। আর সে জাহান্নামি হলে কী করে আমি তার সাথে দুনিয়ার বিষয়ে হিংসা করতে পারি অথচ সে জাহান্নামের বাসিন্দা হতে যাচ্ছে। (রওজাতুল উকালা, ইবনে হিব্বান : ১৩৪)

এক ব্যক্তি হাসান (রা)-কে প্রশ্ন করল, মুমিন হিংসা করে? তিনি বললেন, তুমি কি ইয়াকুব (আ)-এর পুত্রদের কথা ভুলে গেছ? তারা মুমিন ছিল। সুতরাং মুমিন হিংসা করে। কিন্তু তার উচিত বুকের মধ্যেই তা গোপন রাখা। কেননা, হাতে ও মুখে বাড়াবাড়ি না করা পর্যন্ত হিংসা দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না। (রওযাতুল উকালা : ১৩৬)

আবুদ দারদা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করবে, তার হাসি ও হিংসা দুটোই কমে যাবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ২২০)

মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু নিয়ামতের কারণে যে হিংসা করে, তাকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। সে নিয়ামতের বিলুপ্তি ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না। (মুজালাসা ওয়া যাওয়াহিরুল ইলম : ১১৩)

তাইতো ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন,

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَدْ تُرْجٰى اِمَا تَتُها * اِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدِ

সব শত্রুতারই একটা পরিসমাপ্তি রয়েছে। কিন্তু যারা হিংসা নিয়ে শত্রুতা লালন করে তারা হয় অমর।

জনৈক দার্শনিক বলেন, হিংসা হলো একটি অমোচনীয় ক্ষত।

জনৈক বেদুঈন বলেন, আমি হিংসুকের চেয়ে মাজলুম জালেম আর কাউকে দেখিনি। তোমাকে দেওয়া নিয়ামতকে সে নিজের ওপর আঘাত মনে করে।

হাসান বসরি (র) বলেন, হে আদম সন্তান, কেন তুমি অপর ভাইয়ের বিষয়ে হিংসা করো। আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করে নিয়ামত দিয়েছেন। তুমি কি আল্লাহর অনুগ্রহের বিষয়ে হিংসা করছ?

আর এর বাইরে অন্য কিছু হলে যার গন্তব্যই হলো জাহান্নাম সে বিষয়ে হিংসা করে লাভ কী? (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৫৭)

জনৈক আলেম বলেন, হিংসুক লোক সমাবেশে নিন্দিত হয়। ফেরেশতাদের থেকে লানত পায়। সৃষ্টিজীবের থেকে তারা শুধু কষ্টই পায়। মৃত্যুর সময় তাদের আতঙ্কই বেড়ে যায়। শেষ বেলায় তারা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৫৭)

হিংসার ধরন, প্রকার ও হুকুম

হিংসার ভিত্তি হচ্ছে প্রাপ্ত নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত দান করেন, তখন অপর ব্যক্তির দুইরকম অবস্থা হতে পারে।

প্রথমত, সেই নিয়ামতটি তার নিকট খারাপ মনে হবে এবং সে তার বিলুপ্তি কামনা করবে। এই অবস্থার নাম হিংসা। এ থেকে জানা গেল, হিংসার সংজ্ঞা হচ্ছে, অপরের নিয়ামত দেখে দুঃখিত হওয়া এবং তার নিকট থেকে তার বিলুপ্তি চাওয়া।

দ্বিতীয়ত, অপরের সেই নিয়ামত তার কাছে খারাপ মনে হবে না এবং সে তার বিলুপ্তিও আশা করবে না; বরং সে চাইবে, এই নিয়ামত আমিও পাই। এই অবস্থাকে বলা হয় 'গিবতা' বা ঈর্ষা। কখনো হিংসাকে ঈর্ষার স্থানে এবং ঈর্ষাকে হিংসার স্থানে ব্যবহার করা হয়। অর্থ জানা থাকলে এতে কোনো অসুবিধা হয় না।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

اَلْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ.

মুমিন ঈর্ষা করে এবং মুনাফিক হিংসা করে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৫৮; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৯৫)

মনে রাখবে হিংসা সর্বাবস্থায়ই হারাম। কিন্তু যে নিয়ামত কোনো গুনাহগার অথবা কাফেরের হাতে পড়ে এবং এর দ্বারা সে ফিতনা ফাসাদ ও জুলুমের সুযোগ নেয়, সেই নিয়ামতকে ওই ব্যক্তির হাতে মন্দ মনে করা এবং তার বিলুপ্তি কামনা করা পাপ নয়। কারণ, এখানে স্বয়ং নিয়ামতের ওপর হিংসা হয় না; বরং সেটা ফিতনা-ফাসাদের কারণ হওয়ায় হিংসা করা হয়। হিংসা যে হারাম, এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলাও অনেক স্থানে হিংসার নিন্দা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ নিচে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো,

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا.

যদি তোমরা কোনো কল্যাণ লাভ করো, তবে তাদের খারাপ লাগে। আর যদি তোমাদের কোনো অকল্যাণ ঘটে তবে সেজন্য তারা খুশি হয়ে যায়। (সূরা আলে ইমারান : ১২০)

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ.

আহলে কিতাবের অনেকেই চায় যে, মুমিন হওয়ার পর তোমাদের যদি কাফের বানিয়ে দেওয়া হতো নিজেদের পক্ষ থেকে হিংসার কারণে। (সূরা বাকারা : ১০৯)

এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যে ঈমানরূপী নিয়ামতের অবসান চায়, তা হিংসার জন্য।

لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً.

যদি তোমরাও কাফের হয়ে যাও যেমন তারা কাফের হয়েছে। এরপর সবাই সমান হয়ে যাবে। (সূরা নিসা : ৪৯)

ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের হিংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের মনের কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে,

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ.

তারা যখন বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি বড় দল। আমাদের পিতা নিশ্চিতই কোনো ভুলের মধ্যে আছেন। তোমরা ইউসুফকে মেরে ফেলো অথবা কোনো দেশে পাঠিয়ে দাও। এতে তোমরা তোমাদের পিতার মনোযোগ একান্তভাবে পাবে। (সূরা ইউসুফ : ৮-৯)

অর্থাৎ, ইউসুফের প্রতি পিতার স্নেহ যখন ভাইদের কাছে দুর্বিষহ মনে হলো, তখন তার অবস্থানের কথা চিন্তা করে তাকে পিতার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দিল।

وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا.

অন্যরা যা প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে তারা নিজেদের অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে না। (সূরা হাশর : ৯)

এতে যারা হিংসা করে না, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

اَيَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

মুমিনদের আল্লাহ যে অনুগ্রহ দান করেছেন, সেজন্য তারা কি হিংসা করে? (সূরা নিসা : ৫৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ

সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত (অর্থাৎ, একই দীনের অনুসারী)। অতঃপর আল্লাহ নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করলেন। যে বিষয়ে মানুষেরা মতভেদ করতো তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য, তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং যাদের তা দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর হিংসাবশতই দীনি বিষয়ে বিরোধিতা করতো। যারা ঈমান আনে, তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো, আল্লাহ তাদের সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সত্যপথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারা : ২১৩)

এই আয়াতে بَغْيًا بَيْنَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন তারা পরস্পর হিংসাবশত দীনের বিরোধিতা করতো।

وَ مَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ.

এবং তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক প্রতিহিংসাবশত তারা (দীনের ভেতর) মতবিরোধ করে। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া সম্পর্কে যদি আপনার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো, তবে তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়েই যেত আর নিশ্চয় তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিপতিত। (সূরা শুরা : ১৪)

আল্লাহ তাআলা ইলম অবতরণ করেছেন তাদের একীভূত করে আপন আনুগত্যের ওপর বহাল রাখতে, তাই তিনি আদেশ করেছেন, জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা একত্র হয়ে থাকো। কিন্তু তারা হিংসাত্মক হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এক সময় অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে, সবাই নিজেকে নেতা ভাবতে শুরু করলো। তার কথাই শেষ কথা ভাবতে লাগল এবং একে অন্যের মতকে খণ্ডন করতে লেগে গেলো।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে ইহুদিরা যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, তখন এই বলে দুআ করতো— হে আল্লাহ! সেই পয়গম্বরের ওসিলায়, যাঁকে প্রেরণ করার অঙ্গীকার আপনি আমাদের দিয়েছেন এবং সেই কিতাবের ওসিলায়, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করবেন, আমাদের বিজয় দান করুন! এই দুআর বরকতে তারা যুদ্ধে জয়ী হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হয়ে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তারা পরিচয় পেয়েও তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বেঁকে বসল। সেজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ.

ইতঃপূর্বে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতো। এরপর যখন পরিচিতজন আগমন করল, তারা তাঁর বিরোধিতা করল। (সূরা বাকারা : ৮৯)

উম্মুল মুমিনীন সফিয়্যা বিনতে হুয়াই একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরজ করলেন, একদিন আমার বাবা ও চাচা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে ঘরে গেলেন। আমার বাবা চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মদের ব্যাপারে তোমার কী মন্তব্য? চাচা জবাব দিলেন, আমার জানা মতে তিনি সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ মূসা কালীমুল্লাহ (আ) দিয়েছিলেন। এরপর চাচা পিতাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কী ধারণা? পিতা বললেন, আমি তো সারাজীবন তার দুশমনই থাকব।

এমন সব ক্ষেত্রে হিংসা করা হারাম। এখন ঈর্ষার বিধান জানা প্রয়োজন। ঈর্ষা হারাম নয়।

আর মুনাফাসা অর্থাৎ, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার হুকুম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কখনো তা হয় ওয়াজিব ও আবশ্যক। কখনো তা মানদুব ও উত্তম। কখনো তা মুবাহ ও বৈধ। এটা কখনো রহমতের আওতায় পড়ে না।

তবে মুনাফাসা শব্দটাকে কখনো কখনো হাসাদ বা হিংসা অর্থেও ব্যবহার করা হয়।

কাসেম ইবনে আব্বাস ও ফযল ইবনে আব্বাস যখন যাকাত উসুলের দায়িত্বে নেওয়ার ইচ্ছে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যান, তার আগে তাদের সাথে আলী (রা)-এর কথা হয়। সেখানে আমরা মুনাফাসা শব্দটিকে হাসাদ অর্থে ব্যবহার দেখতে পাই। আলী (রা) তাদের বলেছিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যেয়ো না। তিনি তোমাদের এই দায়িত্ব দেবেন না।

তখন তাদের উত্তর ছিল এমন, আপনার পক্ষ থেকে এটা নাফাস (হিংসা) ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি আমাদের হিংসা করছেন। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (স) আপনার সাথে ফাতেমা (রা)-এর বিবাহ করিয়েছেন। তখন তো আমরা হিংসা করিনি। (অনুরূপ অর্থে, সহিহ মুসলিম : ১০৭২)

আর নাফাস শব্দ থেকে মুনাফাসার উৎপত্তি। মুনাফাসা অর্থাৎ, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটি বৈধ হওয়ার কথা আমরা জানতে পারি কুরআনের আয়াত থেকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। (সূরা মুতাফফিফিন : ২৬)

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ.

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর মতো। (সূরা হাদিদ : ২১)

মুসাবাকা শব্দটি ব্যবহার হয় কোনো বস্তু হারানোর ভয় থাকলে। যেমন ছুটে যাওয়া। যে আগে মনিবের কাছে যেতে পারবে সেও খেদমত করার সুযোগ পাবে। অন্যজন বঞ্চিত হবে। এটাকে বলা হয় মুসাবাকা, অর্থাৎ প্রতিযোগিতা।

হাদিস শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা হয়েছে,

لَاحَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَيْنِ : رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهٖ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ.

দুব্যক্তির ব্যাপারেই কেবল ঈর্ষা করা বৈধ- প্রথম, যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দিয়েছেন। এরপর তাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দ্বিতীয়, যাকে আল্লাহ ইলম দিয়েছেন। সে তদনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। (সহিহ বুখারী : ৭৩; সহিহ মুসলিম : ৮১৬)

এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারি আবু কাবশা আনসারি (রা) এর হাদিস থেকে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার এই উম্মত হলো চার প্রকার ব্যক্তির মতো।

প্রথম ব্যক্তি : যাকে আল্লাহ অর্থ— সম্পদ ও জ্ঞান-সম্পদ দান করেছেন। সে তার জ্ঞান অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আল্লাহ যাকে জ্ঞান-সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা দেননি।

সে বলে, আমার যদি অমুকের মতো এত এত সম্পদ থাকত তাহলে সম্পদগুলো আমি তার মতো করেই ব্যয় করতাম।

এক্ষেত্রে প্রথম দুই প্রকার ব্যক্তি সমান সাওয়াব পাবে।

এটা তার চাওয়া যে, অমুকের মতো তারও সম্পদ হোক। সে তা কল্যাণের পথে ব্যয় করুক এবং তার সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে না যাক।

তৃতীয় ব্যক্তি : আল্লহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞান দেননি। সে নিজের সম্পদ আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

চতুর্থ ব্যক্তি : আল্লাহ তাকে না দিয়েছেন জ্ঞান, না দিয়েছেন সম্পদ। মনে মনে সে কামনা করে তারও সম্পদ থাকলে সে আল্লাহর নাফরমানিতে তা ব্যয় করতো। শেষোক্ত দুই ব্যক্তি সমপরিমাণ গুনাহগার হবে। (জামে তিরমিযী : ২৩২৫; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২২৮)

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পদের নিয়ামত লাভের কামনাকে মন্দ বলেননি।

বরং মন্দ পথে ব্যয় করার নিমিত্তে সম্পদের কামনাকে মন্দ বলেছেন।

কাজেই এখান থেকে বোঝা যায় যে, অন্যের সম্পদ দেখে ঈর্ষা করে তার মতো সম্পদ লাভের অভিলাষী হওয়াতে কোনো দোষ নেই। যখন সে অপরের সম্পদের বিনাশ চাইবে না এবং অপরের কাছে সম্পদ থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না।

কাজেই অপরের কাছে যদি দীনি নিয়ামত থাকে তাহলে তা নিজের জন্য কামনা করা ওয়াজিব। যেমন ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদি। এ হলো আবশ্যিক মুনাফাসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর এমন সম্পদ লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। কারণ এমন কামনা না থাকলে বুঝতে হবে সে আল্লাহর নাফরমানি নিয়েই সন্তষ্ট হয়ে আছে, যা হারাম।

অপরের কাছে থাকা নিয়ামত যদি ফযিলতপূর্ণ হয়, যেমন, কল্যাণ কর্মে সম্পদ ব্যয় করা, সদকা করা, এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মুস্তাহাব।

নিয়ামত যদি হয় মুবাহ বা বৈধতার পর্যায়ভুক্ত, যা করলে সাওয়াব নেই। ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না। তার কামনা করা মুবাহ ও বৈধ।

ঈর্ষার পুরো বিষয়টা নির্ভর করবে ঈর্ষাকারীর ইচ্ছার ওপর। অর্থাৎ, সে অন্যের নিয়ামতকে অপছন্দ করবে না এবং নিজের জন্য তার সমপরিমাণ নিয়ামত কামনা করবে। এখানে দুটি বিষয় রয়েছে, ১. নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রশান্তি, ২. অন্যের নিয়ামত বিলুপ্ত হয়ে তার কাছে বলে আমার অভিব্যক্তির প্রকাশ।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রটা এখানে অপছন্দনীয়। তা হলো অন্যের সম্পদ বিলুপ্ত হওয়া ও তার কাছে সেটা চলে আসা। তবে যা সুন্নত ওয়াজিব নয় বরং মুবাহ বা বৈধ বিষয় তা নিজের কাছে চলে আসার কামনা করায় কোনো গুনাহ নেই।

তবে হ্যাঁ, এ কারণে তার মর্যাদা কমে যাবে। এটা আল্লাহর ওপর ভরসা, তার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়াবিমুখতার খেলাফ হবে। এমন করলে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা থেকে মাহরুম হবে। তবে এর কারণে তাকে গুনাহগার হতে হবে না।

একটি সূক্ষ্ম আলোচনা

মানুষ যখন অন্যের ক্ষতি কামনা করা ছাড়া নিজের কাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জন করতে অপারগ হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই ঈর্ষার কারণে সে অপরের সম্পদের বিলুপ্তি করবে। তার মনের অগ্নি নির্বাপিত হবে শুধু দুইভাবে।

১. তার মতো সম্পদ সে অর্জন করতে পারলে।

২. হিংসাকৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেলে।

এই দুই পন্থার যেকোনো একটির পথ বন্ধ হয়ে গেলে প্রবৃত্তিকাতর অন্তর অন্য একটা পন্থা খুঁজে নেয়। যখন হিংসিত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হয় তার কাছে সবচেয়ে কামনীয়। কারণ, প্রতিপক্ষের কাছে যখন সম্পদই রইল না তখন তাকে পেছনে ফেলে বেশি সম্পদ অর্জন করে ফেলার কোনো পথই তো আর নেই। তখন অন্তরের প্রবৃত্তি নতুন কোনো পথও খুঁজে পাবে না।

বিষয়টি এমনই স্পর্শকাতর যে, সে অবস্থায় যদি তাকে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয় যে, তার কাছে সম্পদ বাকি থাকবে এবং তোমাকেও তার মতো সম্পদ দেওয়া হবে কিংবা তার সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়া হবে এবং তুমিও কিছু পাবে না। এক্ষেত্রে হিংসুটে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ বিলুপ্তিকেই প্রাধান্য দিত। এটা হিংসার অন্যতম নিকৃষ্ট পন্থা।

আর যদি মনে আল্লাহভীতি থাকার কারণে সে অন্যের সম্পদ বিলুপ্ত হওয়া কামনা থেকে ফিরে আসে, তখন তার মনে যে হিংসিত ব্যক্তির সম্পদ বিলুপ্তির কামনা এসেছিল তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কারণ প্রবৃত্তি চাইলেও বিবেক ও দীনের বিবেচনায় এটাকে সে অপছন্দ করেছে। এটাই হয়ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বাণীর মর্মার্থ।

তিনটি বিষয় থেকে মুমিনের অন্তর কখনো মুক্ত হতে পারে না। হিংসা, ধারণা ও অশুভ লক্ষণ বিচার।

এরপর বলেন, তবে তার জন্য এগুলো থেকে বেঁচে থাকার পথ খোলা রয়েছে। তাই মনে হিংসা আসলে হিংসিত বস্তু কামনা করবে না। (উয়ূনুল আখবার, ইবনে কুতাইবা : ২ : ৮)

অর্থাৎ, তোমার মনে কোনো কিছু নিয়ে হিংসা আসলে সে অনুযায়ী তুমি কাজ করবে না। কারণ এটা অসম্ভব যে, মানুষ তার অপর ভাইয়ের সাথে মিলে মিশে নিয়ামত ভোগ করতে চাইবে। বরং কেউ এমন চেষ্টা করলে সে ব্যর্থ হবে। তারপর মন থেকে অন্যের সম্পদ বিলুপ্তির প্রতি ঝোঁককে দূর করে দেবে। যাতে করে আবশ্যকীয়ভাবে নিয়ামতপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

প্রতিযোগিতার এই স্তরটা অবৈধ হিংসার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। কাজেই এমন ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হওয়া চাই। কারণ এই স্থানটা খুবই স্পর্শকাতর। মানুষের মনে যখন ঈমানি শক্তি কমজোর থাকে তখন নিজের পরিচিতজনদের মধ্যে কাউকে উচ্চস্থানে দেখলে সে তার সমান হওয়ার বাসনা করতে থাকে। আর এই অভিপ্রায় তাকে হিংসার দিকে নিতে থাকে।

যখনই কারও মনে সম্পদ হারানোর ভয় এবং অন্য কেউ তার ক্ষতি কামনা করছে বলে মনে হয় তখন তাকে ধ্বংসাত্মক হিংসা ও অন্যের নিয়ামত বিলুপ্তির স্বভাবজাত টান সেদিকে নিয়ে যায়। এমনকি সে যদি হিংসিত ব্যক্তির পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে না পারে, তাহলে সে তাকে নিজের স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে তা পুরোপুরি হারাম। হোক তা দীনের বিষয়ে কিংবা দুনিয়ার বিষয়ে।

তবে অন্তরের বাসনা অনুযায়ী যদি সে আমল না করে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তার মনস্তাপকে গুনাহের ভাবনার পরিপূরক করে দেবেন।

এই হলো হিংসার হাকিকত ও তার বিধানের বিস্তারিত বিবরণ।

হিংসার স্তর

হিংসার স্তর চারটি —

প্রথম স্তর : অন্যের নিয়ামত বিলুপ্তির কামনা করা। কিন্তু তা নিজে পাওয়ার আশা না রাখা। এটা হলো মন্দের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়।

দ্বিতীয় স্তর : হিংসিত ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বাসনা করা সেই নিয়ামতের প্রতি তার আগ্রহের কারণে। যেমন মনোরম বাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী অথবা অন্যের কবজায় থাকা সাম্রাজ্য। সে চায় এগুলো তার হোক। তার চাওয়া হলো, এসব নিয়ামত। নিয়ামতের বিলুপ্তি নয়। আর মনোবেদনার কারণ হলো নিজের কাছে এসব সম্পদ না থাকা। অন্যের কাছে থাকা তাকে কষ্ট দেয় না।

তৃতীয় স্তর : সে হিংসিত নিয়ামতের মূলটা চায় না। তার কামনা হলো, তার নিজেরও এমন নিয়ামত হোক। তবে নিয়ামতের অনুরূপ কিছু না পেলে সে হিংসিত নিয়ামতের বিলুপ্তি কামনা করে। যাতে উভয়ের মধ্যে কোনো বিভাজন না থাকে।

চতুর্থ স্তর : অনুরূপ নিয়ামত সে নিজের জন্য চায়, কিন্তু না পেলে তা বিলুপ্ত হওয়ার কামনা করে না।

পার্থিব বিষয়ে হলে শেষোক্ত ক্ষেত্রে ক্ষমা পাওয়া যায়। আর ধর্মীয় বিষয়ে হলে তাকে মুস্তাহাব বলে ধরা হয়।

তৃতীয় স্তরের হুকুম ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কখনো তা হয় দূষণীয়, কখনো নয়। দ্বিতীয় স্তরের হুকুম তৃতীয় স্তরের চেয়ে কিছুটা হালকা।

প্রথম স্তর পুরোটাই দূষণীয়। দ্বিতীয় স্তরের বিষয়টাকে হিংসা বলা হলে তাতে সম্প্রসারণ জরুরি। তবে তা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

আর তোমরা এমন মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা নিসা : ৩২)

হিংসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন হয়

মানুষ একে অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তাদের মুহাব্বত। দীনি বিষয়ে হলে তার কারণ হবে আল্লাহ ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি ভালোবাসা। আর দুনিয়াবি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে তা হবে পার্থিবজগতের বৈধ কোনো বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

তবে এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো হিংসার কারণ খুঁজে বের করা। ভেবে বের করা, মানুষ কেন একে অন্যের প্রতি হিংসা করে।

হিংসার কারণ যদিও অনেক। তবুও এখানে সার্বিক বিবেচনায় সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হবে, যাকে হিংসার মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়। সেগুলো হলো। ১. শত্রুতা, ২. সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া। ৩. অপরকে হেয় জ্ঞান করা, ৪. আশ্চর্যবোধ করা, ৫. কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাতছাড়া হওয়ার ভয়। ৬. কতৃর্ত্বের মোহ। ৭. অন্তরের ভ্রষ্টতা ও হীম্মন্যতা।

মানুষ অন্যের প্রতি হিংসা করে শত্রুতার কারণে। মানুষ শত্রুর কল্যাণ চায় না। এই হিংসার নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্র নেই; বরং নিচু স্তরের কোনো লোক কিংবা তার ভালোবাসার কোনো মানুষের সাথে বাদশার মন্দ ব্যবহারের কারণে সে বাদশাহকে হিংসা করে এবং তার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া কামনা করে।

কিংবা তার মনে হয় যে, তার সমকক্ষ কেউ এই নিয়ামত পেলে তার প্রতি সে অহংকার করবে। অথচ সে তার এই বড়াই ও অহংকার সহ্য করতে পারবে না। এটাকে সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া বলে।

কিংবা বিষয়টা এমন হবে যে, স্বাভাবিকভাবে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হিংসার কারণে অহংকার করে। কিন্তু হিংসিত ব্যক্তির কাছে এমন নিয়ামত আছে যার কারণে হিংসাকারী ব্যক্তির সাথে অহংকারের আচরণ করতে পারছে না। তাকাব্বুর বা অহংকার বলে এখানে স্রষ্টাই উদ্দেশ্য।

কেউ বড় কোনো নিয়ামত কিংবা উঁচু কোনো পদ পেয়েছে। তখন অপর এক ব্যক্তি তাকে দেখে বিস্মিত হবে, এর মতো ব্যক্তি এত বড় পদ বা এত বড় নিয়ামত পেয়ে গেছে! বিস্ময় বলে এটাই উদ্দেশ্য।

নিয়ামতের কারণে সে উদ্দেশ্যের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হারানোর ভয় করবে।

কিংবা সে অনন্য সব উপকরণ দ্বারা সজ্জিত নেতৃত্ব লাভ করবে।

কিংবা এসবগুলোর কোনো কারণ তার মধ্যে নেই। কিন্তু অন্তরের ভ্রষ্টতা ও দিকভ্রান্ততার কারণে সে অন্যকে হিংসা করে। এসব কারণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে উপস্থাপন করা হলো।

হিংসা কেন করা হয়? সাধারণত সাতটি কারণে হিংসা করা হয়।

১. বৈরিতা। এটি হিংসার সর্ববৃহৎ কারণ। কারণ, যাকে কেউ কোনো কারণে জ্বালাতন করে, সে যন্ত্রণাকারীর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা

পোষণ করে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করে। যদি প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থ হয়, তবে কমপক্ষে এটা করে যে, প্রতিপক্ষ কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে সে খুশি হয়ে মনে মনে ভাবে যে, এটা শুধু আমার ওপর জুলুম করার কারণে হয়েছে। সে তখন বলতে থাকে, আল্লাহ আমার ডাক শুনেছেন। পক্ষান্তরে যদি প্রতিপক্ষ কোনো নিয়ামতের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে সে খারাপ মনে করে এবং বলতে থাকে, আল্লাহ আমাকে দেখলেন না। আমার দুশমনের নিকট থেকে প্রতিশোধও নিলেন না; বরং আরও নিয়ামত দান করেছেন। মোটকথা, যেখানে বিদ্বেষ ও শত্রুতা, সেখানে হিংসা অনিবার্য। এ হিংসা শুধু সমকক্ষের সাথেই হয় না, বরং হীনতম ব্যক্তিও রাজা-বাদশাদের সাথে করতে থাকে। অর্থাৎ বৈরিতার কারণে সে চায়, প্রতিপক্ষের ধনসম্পদ বিলীন হয়ে যাক। সতর্ক জীবনযাপনকারী ব্যক্তির কর্তব্য এ ধরনের হিংসা মন থেকে ঘৃণা করা। এ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে হিংসার কারণেই কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ.

তারা তোমাদের সাথে যখন সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা মুসলমান। আর যখন একান্তে যায়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে রাগে-ক্ষোভে আঙুল কামড়াতে থাকে। আপনি বলে দিন- তোমরা তোমাদের শত্রুতা নিয়ে মরো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা অন্তরের খবর খুব ভালো জানেন। তোমরা কোনো কল্যাণ লাভ করলে তাদের মন খারাপ হয়। (সূলা আলে ইমরান : ১১৯)

এই শত্রুতাজনিত বিদ্বেষের ফলে কখনো পরিস্থিতি মারামারি ও খুন-খারাবি পর্যন্ত চলে যায়, কখনো নিয়ামত দূর করার উপায় চিন্তা করতে করতে সারাজীবন শেষ হয়ে যায় অথবা সর্বদা চোগলখোরি ও মানহানিকর কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে।

২. সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া। কোনো সমকক্ষ ব্যক্তি যদি শাসনক্ষমতা, ধনসম্পদ কিংবা বিদ্যার অধিকারী হয়ে যায়, তবে হিংসাকারী ব্যক্তি আশঙ্কা করে, সে যেন তার সাথে অহংকার ও গর্ব করতে পারে। সে নিজে তো অহংকার করতে চায় না; কিন্তু অন্যের

অহংকার ও আস্ফালন সহ্য করতে পারে না। তাই হিংসা করতে থাকে, অপর ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি জ্ঞানীগুণী হবে কেন?

৩. অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। যেমন— এক ব্যক্তি অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার কাছ থেকে সেবা এবং আনুগত্য আশা করে। এখন সে যদি নিয়ামতের অধিকারী ও সম্পদশালী হয়, তবে হিংসাকারী আশঙ্কা করে, এখন হতে পারে সে তার আনুগত্য করবে না; বরং সমকক্ষ হওয়ার দাবি করবে। ফলে তার কর্তৃত্ব বিফলে যাবে।

এ ধারণার বশবর্তী হয়েই কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বিদ্বেষ করতো। যেমন কুরআন মাজীদ সাক্ষ্য দেয়-

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.

কাফেররা বলত, এই কুরআন দুজনপদের (মক্কা ও তায়েফের) এক মহান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হলো না কেন? অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) মহান ব্যক্তি হলে তার আনুগত্য আমাদের জন্যে অসম্মানজনক হতো না। (তাফসিরে তাবারী : ১৩ : ২৫ : ৭৯)

কীভাবে সম্ভব একজন এতিম বালকের সামনে মাথানত করা? এমনিভাবে কুরায়শ কাফেররা আরো বলত-

اَهٰؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا.

আল্লাহ তাআলা কি আমাদের মধ্য থেকে এদের প্রতিই অনুগ্রহ করলেন? (সূরা আনআম : ৫৩)

মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করা এবং নিজেদের সম্মানিত মনে করার কারণে তারা এ উক্তি করতো।

৪. হিংসার চতুর্থ কারণ আশ্চর্যবোধ করা। অর্থাৎ, হিংসাকারী যখন কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো বড় নিয়ামত কিংবা বড় পদমর্যাদা দেখে, এই ভেবে বিস্ময়বোধ করে যে, আমিও তো তার মতোই একজন। অথচ আমি পাইনি, সে এই মর্যাদা পেয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন,

مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا.

তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। (সূরা ইয়াসীন : ১৫)

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا.

তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতোই একজন মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব? (সূরা মুমিনুন : ৪৭)

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ.

যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের কথা মেনে চল, তবে তো তোমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুমিনুন : ৩৪)

উপর্যুক্ত আয়াতে কাফিরদের অবাক হওয়ার কথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, যে লোক তাদের মতো মানুষ, সে রিসালাত, ওহি ও নৈকট্যের মর্যাদায় কীভাবে পৌঁছে গেল। এর ভিত্তিতেই তারা রাসূলগণের সঙ্গে হিংসা করেছে। এখানে অন্য কোনো কারণ, যেমন শত্রুতা, অহংকার, ক্ষমতা অন্বেষণ ইত্যাদি ছিল না।

৫. কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাতছাড়া হওয়ার ভয়। অর্থাৎ, অপরের নিয়ামতের কারণে আপন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, এ ভয় থেকে হিংসা করা। এ প্রকার হিংসা এমন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যার দাবিদার দুজন। তাদের একজন যখন এমন জিনিস পেয়ে যায়, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধন সহজতর হয় তখন অন্যজন অহেতুক তার ওপর হিংসা করতে থাকে। দুভাইয়ের মধ্যেও এমন হিংসা হয় যখন প্রত্যেকেই বাবা-মায়ের অন্তরে আসন করে নিতে আগ্রহী হয়, যাতে তাদের কাছে যোগ্য প্রমাণিত হয়ে ধনসম্পদের মালিক বনে যায়।

তেমনিভাবে দুজন ছাত্র উস্তাদের মনে স্থান পাওয়ার জন্য পরস্পরের প্রতি হিংসা করে। বাদশার কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করে মনে সম্মান কামানোর উদ্দেশ্যে কাছের মানুষেরা একে অন্যকে হিংসা করে। এমনিভাবে সম্পদলিপ্সু ও মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে অভিলাষী বক্তারা একে অন্যকে হিংসা করে।

৬. কর্তৃত্বের মোহ। অর্থাৎ, এ কামনা করা যে, আমি যেমন কবি, সাহিত্যিক, কারিগর কিংবা বীর, তেমনটি আর কেউ না হোক। আমার শাস্ত্রে আর কোনো সমকক্ষ ব্যক্তি না থাকলে মানুষ আমার প্রশংসা করবে এবং আমাকে অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলবে। এ ব্যক্তি যদি তার আশেপাশে প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা শুনে, তবে অবশ্যই খারাপ মনে করবে এবং হয় তার মৃত্যু

কামনা করবে, না হয় সেই শাস্ত্রের ধ্বংস প্রত্যাশা করবে, যার কারণে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও অংশীদার হয়েছে। এই হিংসা বীরত্ব, বিদ্যা, ইবাদত, পেশা, দৈহিক সৌন্দর্য, অর্থসম্পদ ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ে হতে পারে। একেই বলে কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তির মোহ। ইহুদী আলেমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে চিনতে পেরেও তাঁর অনুসরণ করতে অস্বীকার করতো। তার কারণ ছিল এটাই। তারা আশঙ্কা করতো, যখন তাদের ইলম রহিত সাব্যস্ত হবে, তখন তাদের কর্তৃত্বের বড়াই চূর্ণ হয়ে যাবে। কেউ তাদের মেনে চলবে না।

৭. অন্তরের ভ্রষ্টতা ও হীন্মন্যতার কারণে হিংসা করা হবে। অর্থাৎ, হিংসার কারণ উপরে বর্ণিত ছয়টি বিষয়ের কোনো একটিও হবে না; বরং নিছক হীন্মন্যতা ও নিচতাই হবে হিংসার কারণ। বলাবাহুল্য এমন অনেক লোক পাওয়া যায় যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ নেই, অহংকার নেই এবং সম্পদের লোভও নেই। কিন্তু যখন তাদের সামনে আলোচনা করা হয়, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামত দান করেছেন, তখন এটা তাদের কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে তাদের সামনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলা হলে তারা আনন্দিত হয়। এ ধরনের মানুষ সবসময়ই অপরের ক্ষতি কামনা করে। মানুষের প্রতি আল্লাহর দান তারা দেখতে পারে না। মানুষকে যা দেওয়া হয় তা যেন তাদেরই অর্থভাণ্ডার থেকে দেওয়া হয়। এমন লোককে বলা হয় "শাহীহ" অর্থাৎ কৃপণ থেকেও নিকৃষ্ট। কৃপণ তো সে, যে নিজের সম্পদ কাউকে দেয় না। আর শাহীহ ওই ব্যক্তি যে অন্যের মালে কৃপণতা করে। এই হিংসাকারীরাও অহেতুক আল্লাহ তাআলার দানে বেজার হয়; অথচ দান যারা পায় তাদের সাথে এই হিংসাকারীদের কোনো শত্রুতা থাকে না। হীন্মন্যতা ছাড়া তাদের হিংসার কোনো প্রকাশ্য কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

এ পর্যায়ের হিংসার প্রতিকার খুব কঠিন। কেননা, অন্য কারণসমূহের বেলায় ধরে নেওয়া যায় যে, কারণ দূর হলেও হিংসাও দূরীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু এ হচ্ছে জন্মগত ভ্রষ্টতা বা মুদ্রাদোষ। এটা সহজে দূর হবে না।

উল্লিখিত সাতটি কারণের মধ্যে-কিছু কিংবা অধিকাংশ কারণ এক ব্যক্তির মধ্যে একত্র হয়ে যায়। তখন তার হিংসার মাত্রাও বেড়ে যায়, যা অন্যের সামনে গোপন থাকে না। আমাদের যুগে প্রচলিত অধিকাংশ হিংসার মধ্যে একাধিক কারণই একত্র থাকে একটা কারণই যে থাকে তা নয়।

আপনজনের সাথে হিংসা বেশি হয় কেন?

এটা স্পষ্ট যে, হিংসার কারণসমূহ তাদের মধ্যেই বেশি পাওয়া যায়, যারা পরস্পর বেশি নিকটবর্তী, ফলে তারা পরস্পরে কথাবার্তা বলে এবং মতলব রচনা করে। তখন কেউ যদি কারও মতলবের বিপরীত কথা বলে তবে মতলববাজ লোকটি তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে এবং কোনো না কোনোভাবে এর শোধ নিতে চায়। মোটকথা, কাছে বসা এবং মতলবের কথা বলা থেকে হিংসার উৎপত্তি হয়। সে জন্যই দুজন দু'শহরে বাস করলে তাদের মধ্যে হিংসা হয় না। এমনকি, দূরবর্তী দুই মহল্লায় বাস করলেও হিংসা হয় না। তবে এক মজলিস, এক মাদরাসা, এক মসজিদ কিংবা এক বাজারে একত্র থাকলে এবং একই মতলবের দাবিদার হলে হিংসা হয়। এজন্যেই আলেম ব্যক্তি আলেমের সাথে হিংসা করে, আবেদের সাথে নয়। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর সাথে হিংসা করে, আলেমের সাথে নয়। কেননা, তারা সম পেশাজীবী নয়। একই কারণে মানুষ তার ভাই ও চাচাত ভাইয়ের সাথে অন্যের তুলনায় বেশি হিংসা করে। দুই সতীন পরস্পরে শাশুড়ি ও ননদের তুলনায় অধিক হিংসা করে। মোটকথা, যেখানেই দুজনের মতলব এক হবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তা ও ওঠাবসা হবে, সেখানেই হিংসার সৃষ্টি হবে।

এভাবেই একজন বীর অপর বীরকে হিংসা করে। কোনো আলেমকে নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য হলো, সাহসী হিসেবে খ্যাতি লাভ করার। তার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে আলেম তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না। এভাবেই একজন আলেম অপর আলেমকে হিংসা করে। এক বক্তা অপর বক্তার সাথে হিংসাত্মক আচরণ করে। কারণ নির্দিষ্ট এক লক্ষ্য পথে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

আর পরস্পর এই হিংসাত্মক আচরণের মূল হলো শত্রুতা। আর শত্রুতা হয় একই লক্ষ্যে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হলে। আর এক উদ্দেশ্য দুই মেরুর দুই লোককে কাছাকাছি আনে না; বরং সমমনা দুজনকে কাছাকাছি আনে। তাই এদের মধ্যে হিংসা বেশি হয়।

একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, হিংসার যত কারণ রয়েছে, সবগুলোর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে দুনিয়ার মোহ। কেননা, দুনিয়ার সামগ্রী প্রার্থীদের জন্য যথেষ্ট নয়। একজনের কাছে গেলে অন্যজনের হাত খালি থেকে যায়,

কিন্তু আখেরাতের বস্তুসমূহের মধ্যে কোনো অভাব অনটন নেই। সেগুলোর ধারণ ক্ষমতা অপরিসীম। অংশীদার যতই হোক, বস্তুর কমতি নেই। বরং বিদ্যার মতো দানে ধন বাড়ে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর মারিফাত অর্জন করে, সে তাতে অপরের সাথে হিংসা করে না। কারণ, মারেফাতে কোনো কমতি নেই যে, একজন সাধক যে অন্তরের অবস্থা জেনে নেয়, অন্যজন তা জানতে পারবে না। বরং লাখো সাধক একটি অবস্থা জেনেই আনন্দিত হয় এবং স্বাদ গ্রহণ করে। একজনের আনন্দে অন্যজন অন্তরায় হয় না। বরং তাদের সংখ্যা যত বেশি হয়, স্বাদও তত বেশি হয়। এ কারণেই হক্কানী আলেমের মধ্যে হিংসা নেই। কারণ, তাঁদের মতলব হচ্ছে, আল্লাহর মারেফাত ও নৈকট্য লাভ করা। এগুলো হচ্ছে তলাবিহীন সমুদ্র। হ্যাঁ, ইলম দ্বারা আলেমদের উদ্দেশ্য যদি অর্থসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন বোঝায়, তবে নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে হিংসা দেখা দেবে। কেননা, অর্থসম্পদ এমন শরীরী বস্তু, যা একজনের থাকলে অন্যজনের থাকে না। আর প্রভাব প্রতিপত্তির অর্থ হচ্ছে মনে স্থান করে নেওয়া। যখন কারও মনে একজন আলেমের স্থান হয়ে যাবে, তখন অন্যের জন্যে স্থান থাকবে না অথবা হ্রাস পাবে। এটাই মূলত শত্রুতা ও হিংসার হেতু।

জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য

সম্পদ হাত বদল হলে দাতার কাছে তার অস্তিত্ব বাকি থাকে না। জ্ঞান এমন নয়। যতই দেয়া হোক, যাকেই দেওয়া হোক জ্ঞানীর বুকে তা সংরক্ষিত থাকে। অন্যরা তার কাছ থেকে যত জ্ঞানই আহরণ করুক তার পরিমাণে কোনো স্বল্পতা ঘটে না। আর সম্পদ হলো দৃশ্যমান বস্তু তার শুরু এবং শেষ রয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর সব সম্পদের মালিক হয়ে গেলে তার অধিকার করার মতো আর কিছু থাকবে না।

আর ইলমের কোনো পরিসীমা নেই। আর কোনো পক্ষে তার সবটা আয়ত্ত করে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর মহানুভবতা, যা মহাবিশ্বময় ছড়িয়ে থাকে, তা নিয়ে এবং তার রাজত্ব নিয়ে ভাবে তা হয়ে যাবে তার কাছে সবচেয়ে সুস্বাদু নিয়ামত। যার স্বাদ কখনো ফুরিয়ে যাবে না। অন্যের সাথে তা ভাগাভাগিও করে নিতে হবে না। ফলে দুনিয়ার কোনো সৃষ্টি নিয়ে সে হিংসা করবে না। কারণ, অনান্য মানুষও যদি

আল্লাহর জালালত ও মহাবিশ্বের ভেদ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারে, তাহলে কারও স্বাদের মধ্যেই সংকোচন হবে না, বরং সমমনা কয়েকজন একত্র হওয়ার কারণে তাদের স্বাদ যেন আরো বেড়ে যায়।

তাই তাদের সার্বক্ষণিক ঊর্ধ্বজাগতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার স্বাদ সরাসরি চোখে জান্নাত দেখার স্বাদের চেয়েও বেশি হবে। কারণ, আরেফের জান্নাত হলো আল্লাহর সত্তাগত গুণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যে জ্ঞান বিস্মৃত হবে না। সর্বদা ফলদায়ক হবে। আরেফ ব্যক্তি অন্তরে সেই ফলের স্বাদ পেতে থাকবে। যে ফল হবে তাজা ও প্রতুল। তার থোকাগুলো হবে হাতের নাগালে। চর্মচক্ষু বন্ধ করলেও অন্তরের পথে সে জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে।

তারা সংখ্যায় যত বেশিই হোক তারা কেউ একে অন্যকে হিংসা করবে না। তারা হবে কুরআনের এই আয়াতের বর্ণনা মতে,

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ.

আমি তাদের মন থেকে বিদ্বেষ দূর করব; তারা ভাই ভাই হয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। (সূরা হিজর : ৪৭)

এমন হবে দুনিয়াতে তাদের অবস্থা যেদিন মানুষের সম্মুখ থেকে সকল আড়াল সরিয়ে দেওয়া হবে। ভাবো দেখি, কেমন হবে সেদিন তাদের অবস্থা।

জান্নাতে যেহেতু হিংসা থাকবে না সেহেতু জান্নাতি ব্যক্তিরা পৃথিবীতে হিংসাত্মক আচারণ করবে না। এটাই অনুমেয় কারণ। জান্নাতে স্থানের সংকট হবে না। থাকবে না প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আচরণ।

জান্নাত লাভ করতে হবে আল্লাহর মারিফাত লাভের মাধ্যমে। জান্নাতের বাসিন্দারা আবশ্যিকভাবে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে হিংসামুক্ত থাকবে, বরং হিংসা হলো উচ্চমর্যাদা থেকে অর্ধপতিত জাহান্নামি লোকদের স্বভাব। তাই অভিশপ্ত শয়তানকে হিংসা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তাই সে আদমের মর্যাদা দেখে হিংসার শিকার হয় এবং আদমকে সেজদা করার আদেশ পেয়ে সে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করে।

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আরও জানা গেছে যে, যে সব গুণ পূর্ণভাবে অর্জন করা যায় না মানুষ তা নিয়েই হিংসা করে।

যে উদ্দেশ্য পূরণ করতে মানুষ পূর্ণভাবে অক্ষম কিংবা অনেকাংশেই অক্ষম এসব ক্ষেত্রেই মানুষ হিংসায় আক্রান্ত হয়। তাই মানুষ আকাশের সৌন্দর্য

দেখে হিংসাত্মক হয় না। কারণ, চোখ মেললেই তার সামনে সুবিশাল আসমান দেখতে পায়। কিন্তু সে বাগান উদ্যানের কারণে হিংসা করে। যা বিশ্বের খুবই ছোট একটা অংশ। অথচ আকাশের তুলনায় জমিন খুব তুচ্ছ একটা জিনিস। তবু মানুষের হিংসা জমিন নিয়ে।

তুমি যদি দৃষ্টিমান হও, নিজের প্রতি যত্নশীল হও তাহলে তোমার উচিত হবে এমন নিয়ামতের কামনা করা যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তা পাওয়ার জন্য অনেকগুলো মুখ লালায়িত নয়। যাকে দুনিয়াতে বলা হয় আল্লাহর মারেফাত ও আল্লাহর গুণাবলি, তার কর্ম, ঊর্ধ্বজগতের আশ্চর্য রহস্যের জ্ঞান অর্জন করা। এই জ্ঞান দ্বারাই পরকালে এসব জ্ঞান লাভ করা যাবে।

আর যদি তুমি আল্লাহর বিষয়ে জানতে আগ্রহী না হও, তার বিষয়ে যদি স্বাদ না পাও, তোমার চিন্তাশক্তি কমে যায়, তোমার আগ্রহ হ্রাস পায় তাহলে বুঝতে হবে এ বিষয়ে তুমি রোগাক্রান্ত। পুরুষত্বহীন ব্যক্তি সঙ্গমের স্বাদ পায় না। অপ্রাপ্তবয়সী বালক পায় না কর্তৃত্ব করার স্বাদ। কারণ এসব স্বাদ শুধু যারা পুরুষ, তারাই পায়। তেমনি আল্লাহর জ্ঞান শুধু এমন ব্যক্তিরাই লাভ করতে পারে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ.

সেসব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। (সূরা নূর : ৩৭)

অন্যরা এসব স্বাদ পায় না। কারণ চাখার পর আগ্রহ আসে। যে স্বাদ নেয় না সে বস্তুর স্বরূপ জানতে পারে না। যে জানে না সে আগ্রহী হয় না। যার মনে আগ্রহ নেই। সে প্রত্যাশী হয় না। যে প্রত্যাশী হয় না সে অর্জন করতে পারে না। আর যে অর্জন করতে পারে না সে মাহরুমই থেকে যায়।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ.

যে ব্যক্তি চির দয়ালু আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান এবং সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ : ৩৬)

হিংসার চিকিৎসা

মনের বড় রোগসমূহের অন্যতম রোগ হচ্ছে হিংসা। আর মনের সব রোগের চিকিৎসা ইলম ও আমল দ্বারা হয়ে থাকে। হিংসা রোগের জন্য যে ইলম উপকারী, তা হচ্ছে এ কথা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে মেনে নিতে হবে যে, হিংসাকারীর জন্য হিংসা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ এবং যার সাথে হিংসা করা হয়, তার দুনিয়া ও আখিরাতের কিছুই খর্ব হয় না; বরং তার প্রতিহিংসার দরুন সে শুধু উপকৃতই হয়। এ কথা জানার পর যদি কেউ নিজের শত্রু না হয়, তবে অবশ্যই হিংসা বর্জন করবে। হিংসার কারণে হিংসাকারীর যে ধর্মীয় ক্ষতি হয়, তা হলো, সে আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকে না এবং যে নিয়ামত তিনি বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হয় না। বলাবাহুল্য, আল্লাহর তাকদীরে রাজি না থাকার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে? এমনিভাবে হিংসার কারণে হিংসাকারী একজন মুসলমানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করে না। ফলে সে নবী-ওলীগণের কাতার থেকে বের হয়ে যায়। কারণ, তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। শয়তান, ইবলিস ও কাফিররা মুমিনদের অমঙ্গল কামনা করে। হিংসাকারীও অনুরূপ কাজ করার কারণে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। এ সকল বিষয় হচ্ছে অন্তরের বিপথগামিতা যা সৎ কাজকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে এবং সৎ কাজের চিহ্নকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন রাত আসলে দিনের চিহ্ন মিটে যায়।

দুনিয়াতে হিংসাকারীর ক্ষতি হচ্ছে, সে সবসময় দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও হতাশার মধ্যে থাকে। তার শত্রুদের প্রতি যতই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে, ততই তার অন্তর জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। সে বিমর্ষ ও বঞ্চিত সেজে চলাফেরা করে। সে তার শত্রুর জন্য যা কামনা করে, তা নিজের ঘাড়েই পতিত হয়। তার বাসনা ছিল শত্রু দুঃখ-কষ্টে পড়ুক। কিন্তু নিজেই দুঃখযন্ত্রণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। অথচ যার সাথে হিংসা, তার নিয়ামতও বিনষ্ট হয় না। যদি কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশের প্রতিও মানুষের ঈমান না থাকে, তবুও বুদ্ধিমান লোকের জন্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে যে, সে হিংসা থেকে বেঁচে থাকুক। আখেরাতের শাস্তির প্রতি বিশ্বাস থাকলে তো হিংসা থেকে বেঁচে থাকা আরো সহজ হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য, যার সাথে হিংসা করা হয়, তার দীন ও দুনিয়াতে হিংসার ফলে কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা, হিংসার কারণে তার নিয়ামত বিলুপ্ত হয় না, হতেও পারে না। আল্লাহ তাআলা কারও জন্য যে নিয়ামত নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু হবে না। একে প্রতিহত করার কোনো উপায় নেই। এক নারীকে শাসক হয়ে প্রজাদের ওপর জুলুম করতে দেখে যখন একজন নবী আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করলেন, তখন ইরশাদ হয়, আমি সৃষ্টির সূচনাতে যা কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, তাতে পরিবর্তন হতে পারে না। যে পরিমাণ সৌভাগ্য ও পদমর্যাদা এই নারীর জন্য লেখা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার যদি খারাপ লাগে, তাহলে তার সামনে থেকে চলে যাও। মোটকথা, হিংসার কারণে যখন নিয়ামত দূর হয় না, তখন যার প্রতি হিংসা করা হয়, তার দুনিয়াতে আর কী অকল্যাণ হবে এবং পরকালেই তার কী গুনাহ হবে! যদি হিংসা করলেই নিয়ামত দূর হয়ে যেত, তাহলে দুনিয়াতে কারও ওপর আল্লাহ তাআলার নিয়ামত থাকত না। ঈমানের নিয়ামতও কেউ অর্জন করতে পারত না। কারণ, কাফেররা তো ঈমানের ওপরই মুসলমানদের সঙ্গে হিংসা করে। যেমন কুরআন বলে,

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ.

আহলে কিতাবদের মাঝে অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদের ঈমানের পরে কাফের বানিয়ে দিতে পারে! এটা তাদের পক্ষ থেকে হিংসার কারণে। (সূরা বাকারা : ১০৯)

কেউ যদি আশা করে, তার হিংসার কারণে অন্যের নিয়ামত বিলুপ্ত হোক, তবে সে যেন এটাই চায় যে, কাফেরদের হিংসার কারণে তার ঈমানের নিয়ামত বিলুপ্ত হোক।

হিংসিত ব্যক্তি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে উপকৃত হয়, এ কথার ব্যাখ্যা।

আখিরাতে উপকার লাভ

হিংসাত্মক ব্যক্তির দৃষ্টিতে সে হলো জুলুমের শিকার। বিশেষ করে হিংসার কারণে যদি তার গীবত করা হয়, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়, তার

গোপন বিষয় উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তার দোষ চর্চা করা হলে সে যেন অফুরন্ত হাদিয়া পেয়ে গেলো। কারণ, গিবত ও দোষচর্চাকারী নিজের সাওয়াব যার দোষ চর্চা করা হয়েছে তাকে দিয়ে দিচ্ছে।

এমনকি দুনিয়াতে যেমন সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে আখিরাতেও সে নেকিশূন্য হয়ে খালি হাতে প্রভুর সামনে দাঁড়াবে।

অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমার নিয়ামত প্রাপ্য রয়েছে। তিনি তোমাকে ভালো কাজের তাওফিক দিয়েছেন। কিন্তু অন্যের দোষ চর্চা করে তুমি তোমার নেকি খুইয়ে ফেলেছো। অন্য কাউকে দ্বিগুণ নেকি লাভের সুযোগ দিয়েছো। আর নিজের জন্য ডেকে এনেছো দুর্ভাগ্য আর দুর্দশা।

দুনিয়াতে উপকার লাভ

মানুষের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো শত্রুর মন্দ কামনা করা। তাদের চিন্তা ও দুর্ভোগে ফেলা, দুশ্চিন্তায় ফেলে তাদের কষ্ট দেওয়া। আর দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কষ্ট হলো হিংসার কষ্ট। আর তোমার শত্রুর সবচেয়ে বড় আশা হলো সে নিয়ামত নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। আর তুমি তাদের সুখ দেখে কষ্ট-যাতনায় ভুগবে। তুমি হিংসার শিকার হয়ে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ করে দিয়েছো। তাই শত্রু তোমার মৃত্যু চায় না। বরং চায় তুমি দীর্ঘজীবি হও এবং অন্যের নিয়ামত দেখো আর হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে থাকো।

তোমার শত্রু যদি জানতে পারে তোমার মনে আর হিংসা নেই, তুমি মুক্তি পেয়ে গেছো হিংসার অভিশাপ থেকে, তা হবে তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন বিপদের সময়।

কাজেই শত্রুকে খুশি করতে তুমি নিজের জন্য হিংসাকে আঁকড়ে ধরো না।

তুমি যদি পুরো বিষয়টাকে এভাবে ভাবো, তাহলে তুমি বুঝে যাবে, তুমি নিজের শত্রু। আর তোমার শত্রুর বন্ধু। কারণ তুমি হিংসার মতো এমন ধ্বংসাত্মক কাজ করছো যা তোমার দুনিয়া আখিরাত উভয়টা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আর তোমার শত্রুর ঘরে উপকার পৌঁছে দিচ্ছে। হিংসার কারণে তুমি সৃষ্টি ও স্রষ্টা সবার কাছে মন্দ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আর চাও বা না চাও যার প্রতি তুমি হিংসা করছো আজীবন তার কাছে নিয়ামত থেকেই যাবে।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। তোমার এই হিংসামূলক আচরণে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ইবলিস আনন্দিত হয়। কারণ সে যখন দেখে তুমি মানুষের বিশেষায়িত গুণাবলি যেমন জ্ঞান-প্রতাপ-সম্মান-সম্পদ থেকে মাহরুম হচ্ছ যা শয়তানের নেই, তখন সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। নিয়ামত না পেলেও তুমি এসব নিয়ামত ও তার স্রষ্টাকে ভালোবেসে হয়তো সাওয়াবের অংশ পেয়ে যাবে। কারণ কেউ যদি মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করে তাহলে সে কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীদের মতোই সাওয়াব পাবে। যেমন কেউ বুযুর্গ না হলেও তার অন্তরে যদি বুযুর্গদের প্রতি মুহাব্বত থাকে তাহলে বুযুর্গদের মতোই সাওয়াব পাবে।

তাই শয়তান আতঙ্কিত হয়ে ওঠে না। জানি অন্তরে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের প্রতি মুহাব্বত থাকার কারণে তুমি না আবার সফল হয়ে যাও। তখন শয়তান তোমাকে নিয়ামতের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে। যখন তোমার মনে নিয়ামতের প্রতি শ্রদ্ধাটুকুও থাকে না। তাই হিংসার পরিণামে তুমি সবদিক থেকে ক্ষতির শিকার হও।

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি অন্তরে মুসলিমদের প্রতি মুহাব্বাত রাখে। কিন্তু সে এখনো তাদের দলভুক্ত হয়নি। তাদের বিষয়ে আপনি কী কী বলেন?

রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, মানুষ যাকে ভালোবাসে তার সাথেই থাকবে। (সহিহ বুখারী : ৬১৬৯; সহিহ মুসলিম : ২৬৪১)

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবার মাঝখানেই এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

তিনি বেদুঈনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার কাছেই জানতে চাইলেন। কী প্রস্তুতি নিয়েছো তুমি কেয়ামত দিবসের জন্য?

বেদুঈন বলল, বেশি কিছু করা হয়নি আমার। আমি অনেক বেশি নামায পড়তে পারিনি। অনেক বেশি রোযা রাখতে পারিনি। তবে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি যাকে ভালোবাসো তাঁর সঙ্গে কিয়ামতের দিন থাকবে।

আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমগণ সেদিন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। কারণ আমরা রাসূলুল্লাহ, আবু বকর ওমরের মতো আমল

করতে না পারলেও তাদের ভালোবাসি। তবে আশা রাখি আমরা তাদের সাথেই থাকবো। (সহিহ বুখারী : ৩৬৮৮; সহিহ মুসলিম : ২৬৩৯)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরাম বাস্তবেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন।

আবু মূসা আশআরি (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, এক লোক নামাযিদের ভালোবাসে; তবে সে নিজে নামায আদায় করবে না, সে রোযাদারকে ভালো বাসে কিন্তু নিজে রোযা রাখে না। তিনি এভাবে আরও কয়েকটি বিষয়ের কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথেই সে থাকবে। (হাননাদ : আয যুহদ : ৪৮১; অনুরূপ অর্থে সহিহ বুখারী : ৬১৭০; সহিহ মুসলিম : ২৬৪১)

এক ব্যক্তি ওমর ইবনে আবুদল আযিয (র)-কে বললেন, কথায় আছে, আলেম হতে পারলে তুমি আলেম হও। আলেম হতে না পারলে শিক্ষার্থী হও। শিক্ষার্থীও হতে না পারলে তাদের প্রতি মনে ভালোবাসা রাখো। তাদের একান্তই যদি ভালোবাসতে না পারো তাহলে অন্তত তাদের প্রতি মনে বিদ্বেষ রেখো না। একথা শুনে ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) বলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের কত রকম সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি : ১৪৩)

লক্ষ্য করো, শয়তান কীভাবে তোমাকে হিংসার ফাঁদে ফেলছে। মুহাব্বতের প্রতিদান প্রাপ্তি থেকেও তোমাকে বঞ্চিত করছে। তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মনকে বিষিয়ে তুলছে এবং তার মন্দ কামনা তোমার মনে ঢেলে দিচ্ছে আর তুমি গুনাহগার হচ্ছো।

এমন হবেই না বা কেন?

ধরো, তুমি কোনো আলেম ব্যক্তিকে হিংসা করছ। তুমি চাইছ সে ভুল করুক আর তার ভুলগুলো সবাই যেনে যাক।

তুমি চাইছ তার জবান বন্ধ হয়ে যাক। সে আর কথা বলতে না পারুক।

সে অসুস্থ হয়ে পঠনপাঠনে অক্ষম হয়ে যাক। তোমার মনের এই মন্দ কামনার চেয়ে নিকৃষ্ট গুনাহ আর কী হতে পারে? তার মতো হতে না পেরে যদি তোমার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো!! অথচ তুমি তার উল্টোটা করছো! তাহলে তুমি দুনিয়া আখেরাতের

অনেক শাস্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারতে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, তিন প্রকারের লোক জান্নাতের অধিবাসী হবে। ১. যে মানুষের প্রতি ইহসান করে। ২. যে তাদের ভালোবাসে, ৩. যে তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, শয়তান কীভাবে সূক্ষ্ম চক্রান্ত করে এই তিনটি প্রবেশদ্বারই তোমার জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনকি সে তোমার অবস্থা এমন করে দিচ্ছে যে, তুমি তার আশপাশেই ঘেষতে পারছো না। ইবলিস তোমার মধ্যে তার হিংসার অংশ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। আর হিংসা করে তুমি নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু করতে পারোনি।

বাস্তবতার চোখে হিংসাত্মক অবস্থায় যদি তুমি নিজেকে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে তুমি বারবার তোমার শত্রুর ক্ষতি করার জন্য তার দিকে পাথর ছুড়ে মারছ।

কিন্তু পাথর তোমার শত্রুর শরীরের না লেগে উল্টো ফিরে এসে তোমার শরীরে আঘাত করছে। কখনো চোখে লাগছে। অন্ধ হয়ে যাচ্ছ। কখনো হাতে লাগছে। হাত বিকল হয়ে যাচ্ছে। কখনো মাথায় লাগছে। মাথা ফেটে যাচ্ছে। অথচ তোমার শত্রুর কোনো ক্ষতিই তুমি করতে পরছো না। আর মানুষের শত্রু শয়তান তোমাকে চারদিকে থেকে ঘিরে আছে। হাসছে আর আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। তোমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে।

আমার মনে হিংসুকের অবস্থা হয় এর চেয়েও খারাপ। কারণ নিজের ছুড়ে মারা পাথড় শুধু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই আঘাত করছে। মৃত্যুর পরে যা মাটির সাথে মিশে যাবে। অথচ হিংসা করে মানুষ গুনাহ কামাই করে। আর মৃত্যু গুনাহকে মুছে ফেলতে পারে না। সম্ভবত হিংসার গুনাহ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। অনন্ত জীবন আগুনে জ্বলার তুলনায় দুনিয়াতে চোখ হারানো তো খুবই সামান্য শাস্তি।

ভেবে দেখো, আল্লাহ কীভাবে হিংসুকের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন। হিংসুক যখন হিংসিত ব্যক্তির নিয়ামত বিনাশের কামনা করল তখন আল্লাহ তার নিয়ামত ঠিক রাখলেন। কিন্তু হিংসুক থেকে মনের প্রশান্তির মতো নিয়ামত উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.

কখনো কখনো এমনও হয়, শত্রুর জন্য যে মন্দত্ব কামনা করা হয়, তার শিকার নিজেকেই হতে হয়।

আয়েশা (রা) বলেন, আমি ওসমানের জন্য যা কিছু কামনা করেছি তার সবকিছুই আমার ওপর এসে পতিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমি যদি তার নিহত হওয়া কামনা করতাম তাহলে আমি নিজেই নিহত হয়ে যেতাম। (তারিখুল মাদিনাতিল মুনাওয়ারা : ৪ : ১২৩৫)[১]

এ হলো নিজের ওপর হিংসার গুনাহ। তবে হিংসাত্মক হয়ে মানুষ যে বিবাদ করে, সত্যকে উপেক্ষা করে, গালিগালাজ ও হাতাহাতি করে, এসবের শাস্তি কেমন হবে ভেবে দেখুন।

এগুলো এমন জঘন্য কিছু অসুখ যেগুলোর কারণে অতীতে অনেক জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এ হলো জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াই। মানুষ যখন ঠান্ডা মাথায় স্বচ্ছ বিবেকে হিংসা নিয়ে চিন্তা করবে, তখন তার মনে আর হিংসা থাকবে না। এটাকে সে নিজের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিনতে পারবে। বুঝতে পারবে এটা করলে তার শত্রুরা খুশি হয়। প্রভু অসন্তুষ্ট হন। তার জীবনাচার তুচ্ছ হয়ে যায়।

আমল দিয়ে হিংসার চিকিৎসা

এ পর্যন্ত ইলম দ্বারা হিংসা রোগের চিকিৎসার কথা বলা হলো। এখন আমলের দ্বারা চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে। হিংসা যা দাবি করে কথায় কাজে তার খেলাপ করতে হবে। যেমন হিংসা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বর্ণনা করার দাবি করে, তবে মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মুখে তার প্রশংসা করবে। আর যদি হিংসার ফলে অহংকার করতে ইচ্ছে জাগে, তবে জোরপূর্বক বিনীত ও নম্র ব্যবহার করবে। যদি হিংসা দান না করতে প্ররোচিত করে, তবে পূর্বে যেমন দান করা হতো তার চেয়ে বেশি পরিমাণে দানের অভ্যাস করবে। যখন মনের ওপর জোর প্রয়োগ করা এ সকল কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানবে, তখন সে খুশি হয়ে যাবে এবং মহব্বত করতে শুরু করবে। তার পক্ষ থেকে ভালোবাসা পেলে

---

১. আয়েশা (রা)-এর এমন মন্তব্যের কারণ হলো, ক্ষমতায় ব্যাপক রদবদল এবং পুরোনো গভর্নরদের অনেককে অপসারণ ও নতুন অনেককে নিয়োগ দানের কারণে আয়েশা (রা)-এর কাছে তাঁর বিষয়ে অনেক অভিযোগ আসত। এ কারণে অনেক সাহাবি ওসমান (রা)-এর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

হিংসাকারীও ভালোবাসতে বাধ্য হবে। পারস্পরিক এই ঐক্য ও ভালোবাসার কারণে হিংসার বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শয়তান হিংসাকারীকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তুমি বিনয় ও প্রশংসা করলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে ছোটো হয়ে বিপজ্জনক কিংবা কপট প্রতিপন্ন হবে। মানুষের উচিত শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে না পড়া। বরং জানা দরকার, সদ্ব্যবহার জোরপূর্বক হোক অথবা স্বভাবগতভাবে হোক- উভয়পক্ষের শত্রুতা নির্মূল করে দেয়, হিংসার দাঁত ভেঙে যায় এবং অন্তর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দিকে ফিরে আসে। হিংসার এই চিকিৎসাটি খুবই লাভজনক। কারণ, এটা খুব তিক্ত। যে লোক ওষুধের তিক্ততায় ধৈর্যধারণ করে না, সে আরোগ্য লাভের মিষ্টতা আস্বাদন করে না।

এ হলো হিংসার দাওয়াই। এর উপকারিতা অনেক। তবে হৃদয়ে এর তিক্ততা খুব বেশি অনুভূত হয়। তবে সুস্থতা পেতে হলে তিক্ততা সহ্য করতে হবে। জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারলে শত্রুর সামনে বিনয়ী হওয়া তার নিকটে যাওয়ার মতো বিষয়েগুলো সহজেই আয়ত্ব করে নেওয়া যায়। সাথে থাকতে হবে, আল্লাহর ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার উদ্দীপনা, আল্লাহর পছন্দকে ভালোবাসা, তার ইচ্ছার বিপরীত বিশ্বের সব বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। এসব ক্ষেত্রে তার চাহিদা পূরণ হবে। মানুষের ইচ্ছা পূরণ না হওয়া লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার মতো। দুই ভাবে শুধু এই লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। ১. তুমি যা চাও বাস্তবতা তার অনুকূলে হবে। ২. কিংবা তোমার চাওয়া হবে বাস্তবতার অনুকূল।

এর মধ্যে প্রথমটির অধিকার তোমার হাতে নেই। তবে দ্বিতীয় বিষয়টি তোমার আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে। সাধনার মাধ্যমে সেটা অর্জন করা অসম্ভব। কাজেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত তার চর্চা করা।

আর এ হলো হিংসার হাত থেকে মুক্তি লাভের সর্বোত্তম দাওয়াই।

যে পরিমাণ হিংসা দূর করা ওয়াজিব

স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কষ্টদাতার প্রতি রাগ করে। যেমন— যদি তোমাকে কেউ কষ্ট দেয়, আর তুমি তার প্রতি বৈরিতা না রাখো, কিংবা সে কোনো নিয়ামত পেলে তোমার মনে তা খারাপ লাগবেই। তার ভালো-মন্দ উভয় অবস্থাই তোমার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য আনবে। এদিকে শয়তানও

তোমাকে সবর্দা হিংসার দিকে টানতে থাকবে। যদি হিংসার প্রেরণা প্রবল হয়ে যায় এবং তোমার ইচ্ছাকৃত কথা ও কাজে তা প্রকাশ পেতে থাকে, তাহলে তুমি হিংসাকারী ও পাপী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর যদি তুমি তোমার বাহ্যিক অবস্থাকে এসব বিষয় থেকে দূরে রাখ, কিন্তু মনে মনে তার নিয়ামতের বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা কর এবং একে খারাপও মনে না কর, তবুও তুমি হিংসুক ও গুনাহগার হবে। কেননা, মনের এ অবস্থাকে বলা হয় হিংসা।

যে সকল কাজ হিংসার কারণে প্রকাশ পায়, যেমন গীবত, মিথ্যাচার ইত্যাদি, সেগুলো বাস্তব হিংসা নয়। মনই হিংসার স্থান— বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। তবে পার্থক্য হচ্ছে, যে হিংসা শুধু মনেই থাকে এবং বাহ্যিক কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মে প্রকাশ পায় না, তাতে বান্দার কোনো হক থাকে না যে, মাফ করিয়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে; বরং এই প্রকার হিংসার জন্যে হিংসাকারী কেবল আল্লাহর নিকট গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হয়। যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিংসার আলামত ফুটে ওঠে, সেখানেই শুধু ওয়াজিব হয় ক্ষমা করিয়ে নেওয়া।

হ্যাঁ যদি কেউ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখার পর অন্তর দিয়ে নিয়ামতের সমাপ্তি কামনা ও খারাপ মনে করে, তাহলে তা বিবেকের পক্ষ থেকে হবে। অর্থাৎ স্বভাবের দিক থেকে নিয়ামত বিলুপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা পাওয়া যাবে, বিবেক তা পরিবর্তন করে দেবে।

মানুষ দুনিয়ার চিত্ত-বিনোদনের জালে আটকে থাকলে স্বভাবকে পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, যদি কেউ আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় ডুবে থাকে এবং তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে যায়, তাহলে তা সম্ভব। এমতাবস্থায় সে মানুষের পৃথক পৃথক অবস্থার প্রতি লক্ষ করবে না। সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। সবাইকে আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের ক্রিয়াকর্মকে আল্লাহর ক্রিয়াকর্ম মনে করবে। এ অবস্থা কারও হাসিল হলেও সবসময়ের জন্য হয় না। বিদ্যুতের মতো এসে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ায় মিলে যায়। এরপর অন্তর পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। অভিশপ্ত শয়তান আবার তার মনে কুমন্ত্রণা ঢালতে থাকে। যদি কেউ এই বিতাড়িত শয়তানের মোকাবেলায় বিবেকের জোরে তার কথা পছন্দ করে, তাহলে সে নিজের ওপর ওয়াজিব চাপিয়ে নেয়।

কেউ কেউ বলেন, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিংসা জাহির না হলে গুনাহ হয় না। হাসান (র)-কে হিংসা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, হিংসা গোপন রাখা কর্তব্য। মনে গোপন রাখলে এতে কোনো ক্ষতি হবে না। (রওযাতুল উকালা, ইবনে হিব্বান : ১৩৬)

নিচের বর্ণনাটি হাসান থেকে 'মাওকুফ' (তাঁর উক্তি) এবং 'মারফু' (রাসূলুল্লাহর উক্তি) উভয় প্রকারে বর্ণিত আছে-

ثَلَاثَةٌ لَا يَخْلُوْ مِنْهُنَّ مُؤْمِنٌ وَلَهُ مِنْهُنَّ مَخْرَجٌ وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَسَدِ اَنْ لَا يَبْغِىَ.

তিনটি বিষয় থেকে কোনো মুমিন নিরাপদ নয়। কিন্তু তার জন্য মুক্তির পথ আছে। হিংসা থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে সীমালঙ্ঘন না করা। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ৭৬)

এর অর্থও তাই যা উপরে আমরা আলোচনা করে এসেছি। অন্তরে হিংসা থাকা অবস্থায় তা খারাপ মনে করতে হবে এবং এজন্যেই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। মোটকথা, মানুষ যদি শুধু অন্তর দিয়ে হিংসা করে এবং বাইরে তার কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলে এ ধরনের হিংসা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আয়াত ও হাদিস দ্বারা তাই জানা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল- শত্রুর সাথে মানুষের অবস্থা তিন প্রকার হয়ে থাকে—

১. স্বভাবের দাবি মোতাবেক শত্রুর অমঙ্গল কামনা করা, কিন্তু বিবেক দ্বারা এই অমঙ্গল কামনাকে খারাপ মনে করা এবং নিজের প্রতি রাগ করা। এই প্রকার হিংসা অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য। কেননা, মানুষের ক্ষমতায় এর বেশি কিছু নেই।

২. অন্তরে শত্রুর নিয়ামত বিলুপ্ত হওয়ার আশা রাখা এবং তার অমঙ্গলে মুখে অথবা অন্য কোনো অঙ্গের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা। এই প্রকার হিংসাও নিষিদ্ধ।

৩. শুধু অন্তর দ্বারা হিংসা করা, বাহ্যিক অঙ্গে তা প্রকাশ না পাওয়া; এমতাবস্থায় এ নিয়ে সে অনুতপ্তও নয়। এই প্রকার হিংসা জায়েয-নাজায়েয হওয়া নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

[দশম খণ্ড সমাপ্ত]

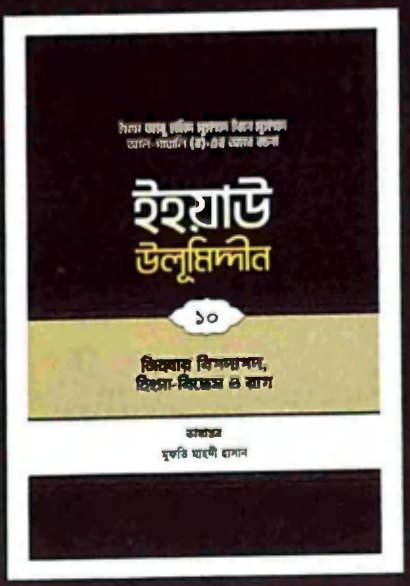

ISBN : 978-984-558-025-0

দারুত তাকবীর
কর্পোরেট অফিস : ৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা) ভি আই পি রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০৯৬১০৬৬৬০০৬, ০১৯৯১-১৮১২০৪
বিক্রয় : বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৯৩৮-৮৫৫৯৯২, ০১৯৩৮-৮৫৫৯৭৯, ০১৯৩৯-৯১১৩২১
ই- মেইল : info@daruttakbeer.com

1011401296014O209-7734

পরিবেশক : বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট (নিচ তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অনলাইনে পরিবেশক : BOIBAZAR.com
BOOKS
রকমারি